গোলাম মোস্তফা

আমার চিন্তাধারা

আহমদ পাবলিশিং হাউস ॥ ঢাকা

আরয

এতদিনে 'আমার চিন্তাধারা' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলো। ১৯১৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত (হিসাব করলে ৪৬ বছর হবে) যতো প্রবন্ধ লিখেছি, তার অধিকাংশই এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

প্রবন্ধগুলি কালক্রমিক এবং বিচ্ছিন্ন। কাজেই কোনো বিশেষ বিষয়বস্তুর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এ গ্রন্থে পাওয়া যাবে না। এক একটা দৃষ্টিকোণ থেকে এক এক বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। তবে চিন্তাগুলি যতো বিক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্তই হোক, দীর্ঘ অর্দ্ধশতাব্দীর পরিধিতে সেগুলি ব্যাপ্ত হয়ে আছে। আজ মনে পড়ে সেই ১৯১৭ সালের কথা। তখন আমি বি-এ ক্লাসের ছাত্র। সেই সময়ে এই পুস্তকের প্রথম প্রবন্ধ 'কবি ও বৈজ্ঞানিক' লিখেছিলাম। প্রবন্ধটি কলিকাতা মুসলিম ইন্‌ষ্টিটিউট হলে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির' এক অধিবেশনে পাঠ করি। সভাপতি ছিলেন জনাব মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব। (তিনি তখনও ডক্টর হন নি।) সেই থেকে আজ পর্যন্ত— কতো ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়েই না আমার 'চিন্তাধারার' মোড় ঘুরেছে! কতো রাতের অন্ধকারে কতো নতুন প্রভাতে, কতো বাদল-বরিষণে কূলে কূলে আছাড় খেয়ে, বালুচরের উপর দিয়ে গঙ্গা-ভাগীরথী মেঘনা-যমুনা পেরিয়ে এসে পৌঁছেচে সে এই পদ্মানদীর তীরে।

'আমার চিন্তাধারায়' তাই ঐতিহাসিক চেতনার ছাপ আছে। বৃটিশ আমল থেকে শুরু করে সংগ্রামী-যুগ পেরিয়ে পাকিস্তানে এসেছি। যুগ-প্রবাহের সঙ্গে সংযোগ রেখে তাই প্রবন্ধগুলি পড়তে হবে। প্রবন্ধগুলি মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছেঃ 'পাকিস্তানের আগে' এবং 'পাকিস্তানের পরে'। আশা করি আমার চিন্তাধারার মূল্যায়ণে এ বিভাগ কিছুটা সহায়তা করবে।

পুস্তকখানি আর একটা কারণে পাঠক-পাঠিকার কাছে আকর্ষণীয় হবে বলে আশা করা যায়। এই পুস্তক লেখকের অন্তর্লোকের একটি প্রবেশ-দুয়ার। এই দুয়ার দিয়ে পাঠক তার মনোলোকে প্রবেশ করবেন এবং সেই সুযোগে লেখকের অন্তর-মানুষটাকেও দেখে ফেলবেন।

আমার নিজের কাছেও পুস্তকখানি নতুন মূল্য পেল। আমার ৪৬ বছরের ছড়িয়ে-পড়া মন আজ যেন আমার মুঠির ভিতরে এসে ধরা দিল। আমি তাকে এখন স্পর্শ করি, অনুভব করি,—আদর করি, ভালোবাসি।

জীবন-বীণার সবগুলি হারানো সুর আজ যেন খুঁজে পেয়েছি—সব স্মৃতি সব গান আজ যেন মনে পড়ছে। বই নয়—এ যেন আমারই আপন জীবনের প্রতিচ্ছবি, এ যেন আমারই আপন মনের প্রতিধ্বনি। কাজেই এ পুস্তকের পাঠক শুধু পাঠকই নন—লেখকও।

প্রবন্ধগুলির কালক্রম রক্ষা করায় লেখকের মন-মানস ও দৃষ্টিভঙ্গি কি ভাবে বিবর্তিত হয়েছে, তা জানা পাঠকের পক্ষে সহজ হবে। পূর্বের কোনো লেখার কোনো পরিবর্তন করিনি। হয়তো এখন লিখলে অনেক কথা অন্য ভাবে লিখতাম। কিন্তু রদ-বদল করতে গেলে আমার চিন্তাধারার মৌলিকতা ও ধারাবাহিকতা নষ্ট হতো। কোন্ কালে কি ভেবেছিলাম এবং কেমন করে ভেবেছিলাম, সেই তত্ত্ব জানায় আনন্দ আছে। ঠিক এই কারণে যেখানে একই বিষয়বস্তুর উপর একাধিক বার লিখতে হয়েছে, সেখানে পূর্বাপর ভাবের সংগতি সর্বত্র রাখতে পারি নি। ইকবাল ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আগে যা বলেছি, পরে তার থেকে কিছু নতুন কথাও বলেছি। অবশ্য এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। রাজনীতির ন্যায় কাব্য-সাহিত্য ও দর্শন-বিজ্ঞানেও এমন মত-পরিবর্তন স্বাভাবিক। এলিয়ট, রবীন্দ্রনাথ, ইকবাল—প্রত্যেকের চিন্তা-ধারাতেই পূর্বাপর কিছু-না-কিছু স্ববিরোধিতা আছে।

সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতির সমস্যা বহু। এমন অনেক সমস্যা আছে যাকে এখনও স্পর্শ করিনি। পরবর্তী কালে হয় তো করবো।

এই পুস্তক-সংকলনে অনেকের কাছেই আমি ঋণী। তন্মধ্যে 'মাহে-নও' সম্পাদক কবি আবদুল কাদিরের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। নানা পত্রিকা থেকে অনেকগুলি হারানো প্রবন্ধ তিনি সংগ্রহ করে দিয়েছেন। কবি জসীম উদ্দীন ও সৈয়দ আলী আহসানের কাছ থেকেও যথেষ্ট উৎসাহ পেয়েছি। প্রুফ-দেখা ও অন্যান্য ব্যাপারে স্নেহাস্পদ শাহাবুদ্দীনের আন্তরিক সহযোগিতা এই পুস্তকের প্রকাশকে ত্বরান্বিত করেছে।

পুস্তকের প্রকাশক শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র দত্ত আমার সাহিত্য-জীবনের সঙ্গে বহুকাল থেকে জড়িয়ে আছেন। আমার 'বিশ্বনবী' ও অন্যান্য বহু গ্রন্থের প্রকাশনায় ও মুদ্রণে তাঁর নীরব সেবা অনস্বীকার্য। এই প্রসঙ্গে তাঁকেও জানাই আমার মনের প্রীতি ও আন্তরিক শুভেচ্ছা।

মোস্তফা-মঞ্জিল। ঢাকা
এপ্রিল, ১৯৬২

গোলাম মোস্তফা

সূচীপত্র

আমার চিন্তাবীরা

কবি ও বৈজ্ঞানিক

সুদূর অতীতে মানব যেদিন বিচিত্র-সুন্দর এই বিরাট বিশ্বের বুকে দাঁড়াইয়া অসীম রহস্যভরা প্রকৃতির পানে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে প্রথম দৃষ্টিপাত করিয়াছিল, সেই দিনই কবিতার জন্ম।

প্রকৃতিই কবিত্বের উৎস। সে-ই মানুষকে কবি করিয়া তুলিয়াছে। যখন ভাষার সৃষ্টি হয় নাই, মানুষ যখন সবেমাত্র এই অদৃষ্টপূর্ব নবীন বিশ্বের নবীন অধিবাসী, তখনই প্রকৃতি-সুন্দরী আপনার সৌন্দর্য-লীলা তাহার নয়ন-সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া তাহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। প্রভাতের অরুণ-কিরণ, বিচিত্র বিহংগরাজির বিচিত্র কূজন, সদ্যপ্রস্ফুটিতা কুসুম-বালিকার সুরভিমাখা হাসির বিচ্ছুরণ, শ্যামসুন্দর তরুলতিকার মন্দমন্দ অংগ-শিহরণ, ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন গগন মণ্ডলে বিদ্যুৎ-স্ফূরণ ও বজ্র-আস্ফালন, সন্ধ্যাকাশে রক্ত-নদীর পরপারে অস্তোন্মুখ সূর্যের বিদায়-জ্ঞাপন—ইত্যাদি যাহা কিছু সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক, সকলই তাহার হৃদয়ক্ষেত্রে শত-প্রকারের অনুভূতি 'ও ভাবের প্রবাহ ছুটাইয়া দিয়াছে। বিস্ময়-বিহ্বল মানুষ সেই ভাবগুচ্ছকে হৃদয়ের মাঝে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই ; তাই সে ভাষা দিয়া তার অন্তরের অনুভূতিকে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। ভাষার সেই সৌন্দর্যমণ্ডিত ভাবের অভিব্যক্তিই কবিতা।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রকৃতির সহিত কবিতার—তথা কবিরও অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। প্রকৃতি যদি সৌন্দর্য দিয়া মানব-মনকে পাগল করিয়া না তুলিত, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী (phenomena of Nature) যদি মানব-প্রাণে বিস্ময় ও আনন্দের উদ্রেক না করিত, তবে মানুষের ভিতর কবিত্বের বিকাশ হইত কি না, সন্দেহ। সৌন্দর্য-বোধই কবিতার জননী।

এই সৌন্দর্য-চেতনা কাহার না আছে? অল্প-বিস্তর সকলেরই আছে। সুতরাং বলা যায় মানব-মাত্রই কবি, কেহ বা নীরব, কেহ বা সরব। প্রাচীন ভারতের সাহিত্যে অথবা হেলেনিক (Hellenic) সাহিত্যে দেখিতে পাই: চন্দ্র-সূর্য ঝটিকা-বিদ্যুৎ ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দৃশ্যসমূহের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া তৎকালীন কবি-দার্শনিকেরা অনেক রূপ-কাহিনী (mythology) সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রকৃতিকে অতি-প্রাকৃতিক (supernatural) দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দেবাত্বজ্ঞানে চন্দ্র-সূর্য আলো-বাতাসকে উদ্দেশ্য করিয়া বহু স্তোত্র (hymns) রচনা করিয়াছেন; ইন্দ্র-বরুণ, প্লুটো-নেপচুন, লক্ষ্মী-সরস্বতী, প্যাণ্ডোরা-ভেনাস্—ইত্যাদি ধরনের বহু দেবদেবীর কল্পনা করিয়াছেন। এই রূপেই মূর্তিপূজা প্রচলিত হইয়াছে। এ ছিল প্যাগান যুগের কথা। প্রাকৃতিক দৃশ্যে দেবত্ব আরোপই ছিল এ যুগের বৈশিষ্ট্য। এই সব কল্পকাহিনী ও অন্ধবিশ্বাস জ্ঞানের দিক দিয়া মানব-জাতিকে প্রগতির পথে চালনা করে নাই সত্য, কিন্তু কল্পনা-বিলাসে ও কাব্য-সৃষ্টিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। বহু রোমান্টিক কাব্য ও কাহিনী এই যুগেই রচিত হইয়াছে।

কবিতার উপর প্রকৃতির প্রভাব তাই স্মরণাতীত কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। চাঁদের অমল-ধবল দীপ্তির মধ্যে কবি রূপসী নারীর মুখচ্ছবি দেখিতে পাইয়াছেন, বনহরিণীর চঞ্চল আঁখিকোণে তিনি তাহার নয়ন-ভংগিমা লক্ষ্য করিয়াছেন; ফণিনীর অংগ-সৌষ্ঠবে তিনি তাহার কুঞ্চিত বেণীর শোভা দেখিয়াছেন; চাঁদে-চকোরে, বৃক্ষ-লতিকায়, সাগর-তটিনীতে তিনি প্রেম ও মিলনের মহিমা লক্ষ্য করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রকৃতির ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোনো বস্তুই কবির চোখ এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। আকাশে-ভুবনে আলোকে-আঁধারে সর্বত্র সে সৌন্দর্য খুঁজিয়া ফিরিতেছে।

কবির সঙ্গে প্রকৃতির যেন তাই আছে এক নিগূঢ় মিতালি। প্রকৃতি

যখন প্রফুল্ল, কবিও তখন উৎফুল্ল ; প্রকৃতি যখন বিষাদে মলিন, কবিও তখন আনন্দহীন। প্রকৃতির সঙ্গে কবির হৃদয়বীণা যেন একতারে এক সুরে বাঁধা। কবির চোখে প্রকৃতি তাই জড়মূর্তি নহে—জীবন্ত ; মানুষের মতোই তার সুখদুঃখ হাসিকান্না—সব কিছুই আছে। কালিদাস, ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ, শেলী, হাফিজ, ওমর খৈয়াম প্রত্যেকেই তাই প্রকৃতির পটভূমিতে দাঁড়াইয়া কাব্য-রচনা করিয়াছেন।

কিন্তু কবি ও প্রকৃতির এই চিরন্তন **সম্বন্ধ** পূর্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। তাহার কারণ বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব ও নানাবিধ বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কার। বৈজ্ঞানিক আসিয়া কবির কল্পনা-পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে ; তার সমস্ত স্বপ্নসৌধ সে ভাঙিয়া দিতেছে। কবি এতদিন অবাধে আকাশ-ভুবনের সর্বত্র বিহার করিয়া ফিরিত, কিন্তু বৈজ্ঞানিক আসিয়া তাহার সে সাধে বাদ সাধিয়াছে। প্রেয়সীর নয়ন-কোণে বিরহের অশ্রুবিন্দু দেখিয়া কবি মুক্তাবিন্দু জ্ঞানে সেগুলিকে প্রেম-সূত্রে গ্রথিত করিয়া প্রিয়ার কণ্ঠে পরাইয়া দিতে যাইতেছিল, অমনি বৈজ্ঞানিক আসিয়া সেই অশ্রুমালাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দিল, উহা মুক্তা নহে—উহা দুই-ভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেন মাত্র! কবি ফুল-বাগানে ফুলের মধ্যে ফুলরাণীকে খুঁজিয়া ফিরিতেছিল, অমনি বৈজ্ঞানিক আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং শানিত অস্ত্র দ্বারা ফুলের পাপড়িগুলিকে কাটিয়া উদ্ভিদতত্ত্বের গবেষণা শুরু করিল। নিশীথের অন্ধকারে পূর্ণচাঁদ ও তারকা মণ্ডলীকে দেখিয়া কবি নন্দন-কাননের শোভা দেখিতেছিল, বৈজ্ঞানিক আসিয়া অমনি সেই চাঁদে গভীর খাত ও কঠিন পাহাড় আবিষ্কার করিল আর তারাগুলোকে এক একটা গ্রহ-উপগ্রহ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া কবিকে একদম বেকুফ বানাইয়া ছাড়িল! এই রূপে যেদিকেই দৃষ্টিপাত করি না কেন, বৈজ্ঞানিকের ভয়ে কবি সর্বত্র আড়ষ্ট, শিহরিত ও সংকুচিত। বস্তুতঃ কোনো স্থানেই বৈজ্ঞানিকের যাইতে বাকী নাই ; সবখান হইতে সে কবি ও কল্পনাকে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিতেছে। নিদাঘ-দিবসে **(Mid-Summer Day)** কুঞ্জবাটিকায় এখন আর পরীর মেলা বসে না ; আকাশ-বীণার তারে তারে এখন আর সংগীত-ধ্বনি শোনা যায় না।

বৈজ্ঞানিকের কলকারখানার বিকট গর্জনে আজ কোকিল-পাপিয়া দেশ ছাড়িয়াছে, আলোর নাচন স্তব্ধ হইয়াছে, সব সুর, সব ইংগিত থামিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ প্রকৃতির বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিকেরা দস্তুরমত অভিযান চালাইয়াছে। প্রকৃতি তাই তার গোপন সম্পদ লইয়া যেন আরও দূরে সরিয়া যাইতেছে। রহস্যের দুয়ার সে যেন এখন বন্ধ করিয়া দিতেছে।

কিন্তু প্রকৃতিও সহজ পাত্রী নহে। বৈজ্ঞানিকের উপর সেও হাড়ে-হাড়ে চটিয়া গিয়াছে। সময়ে সময়ে সেও প্লাবন-ভূমিকম্প ঝটিকা-ঘূর্ণিবাত্যা ইত্যাদি মারণযন্ত্র দ্বারা বৈজ্ঞানিকের সকল প্রয়াসকে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। কোনো কঠিন ধাতব অস্ত্র বা বিস্ফোরক পদার্থ দ্বারা নয়—বরফস্তূপ দ্বারা সে সমুদ্র-জয়ী 'টাইটানিক' জাহাজকেও ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। কবিদের প্রতি সে এখনও সদয় আছে। তাই আমরা দেখিতে পাই—যুগে যুগে এক একজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিও এক একজন খ্যাতনামা কবিকে পাঠাইয়া দিয়াছে। টমসনের পাশে পোপ, নিউটনের পাশে মিলটন, জগদীশচন্দ্রের পাশে রবীন্দ্রনাথ এ-কথার সাক্ষ্য দেবে। এমনও ঘটিতেছে যে, কোনো কোনো বৈজ্ঞানিকের মধ্যেই কবির জন্ম হইতেছে। ওমর খৈয়াম তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত। প্রকৃতির কী অপরূপ প্রতিশোধ!

অধুনা বিজ্ঞানের যুগ আসিয়াছে। কাব্যের তাই আর ততো আদর নাই। কবির কল্পনা এখন বিদ্রূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু তবুও হতাশ হইবার কিছু নাই। বিজ্ঞানের প্রতিপত্তি যতোই বৃদ্ধি পাউক না কেন, জড়শক্তি যতোই প্রবল হউক না কেন, কবিকে একেবারে নির্বাসিত করা কিছুতেই সম্ভব হইবে না। মানুষ শুধু কর্ম লইয়া বাঁচিতে পারে না। কর্মও চাই, কল্পনাও চাই; কাজও চাই, কথাও চাই। শুধু কথা দ্বারা কাজ হয় না বটে কিন্তু কথা ছাড়াও তো কাজ হয় না। এ সম্বন্ধে জনৈক কবি বলিতেছেন:

"Words are deeds, the words we hear
May revolutionise or rear
A mighty State. The words we read
May be a spiritual deed

Excelling any fleshly one
As much as the celestial sun
Transcends a bonfiire, made to throw
A light upon some rare show ;
A simple proverb tagged with rhyme
May colour half the course of time.
The pregnant saying of a sage
May influence every coming age.
A song in its effect may be
More glorious than Thermopylae.

অর্থাৎ : কথাই কার্য। কথার দ্বারাই জগতে বড় বড় কার্য সাধিত হইতেছে। কথার দ্বারা এক একটা যুগের স্রোত ফিরিয়া যাইতেছে। একটা গান থার্মোপালির যুদ্ধজয়ের চেয়েও মূল্যবান।

বাস্তবিকই কথার মূল্য আছে। কথার দ্বারাই কতো ঘুমন্ত জাতি জাগিয়া উঠিতেছে, আবার কথার অভাবে কতো জাগ্রত জাতি ঘুমাইয়া পড়িতেছে। দ্বিতীয় মেসেনিয়ার যুদ্ধে (Second Messenian War in Greece) স্পার্টা-বাসীরা দৈববাণী (oracle) অনুসারে এথেন্সের নিকট একজন নেতার জন্য আবেদন করে। কিন্তু এথেন্সবাসীরা স্পার্টানদিগকে সাহায্য করিতে আন্তরিকভাবে ইচ্ছুক ছিল না ; অথচ দৈববাণীর অসম্মানও করা যায় না। তাই উভয় কূল বজায় রাখিতে গিয়া তাহারা টার্টিয়াস (Tyrtaeus) নামক একজন খোঁড়া লোককে স্পার্টান সৈন্যের অধিনায়করূপে প্রেরণ করে। টার্টিয়াস ছিলেন একজন কবি। স্পার্টাবাসীরা তাঁহাকেই নেতারূপে বরণ করিয়া লইয়া মেসেনিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে। প্রথমতঃ মেসে-নিয়ানরা জয়লাভ করিল। তদ্দৃষ্টে স্পার্টান সৈন্য ভীত ও হতাশ হইয়া পড়িল। কিন্তু এই সময়ে টার্টিয়াসের অনলবর্ষী সমর-সংগীতে স্পার্টানদের প্রাণে নববলের সঞ্চার হইল। নূতন উদ্যমে তাহারা আবার যুদ্ধদান করিল। এইবার মেসেনিয়ান সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল।

আরব ইতিহাসেও এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

বস্তুতঃ কবি না থাকিলে এই পৃথিবী কঠিন বাস্তবে পরিণত হইত। মাটির পৃথিবী অতিক্রম করিয়া আমাদের চিন্তা আর অনন্তের পথে উধাও হইতে পারিত না। নিরাকার আল্লার ধ্যান করাও তখন আর সম্ভব হইত না। সৃষ্টির অন্তরে কী গোপন রহস্য আছে, কোথায় কী ইংগিত আছে, কিছুই আমরা জানিতে পারিতাম না।

কবি কল্পনা লইয়া থাকেন, ইহাই তাহার অপরাধ। কিন্তু একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, কল্পনা না হইলে বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান-সাধনাও অচল হইয়া যায়। বৈজ্ঞানিক প্রথমতঃ কল্পনা বলে একটা থিওরী খাড়া করেন, পরে তাহাকে অবলম্বন করিয়া গবেষণা করিতে থাকেন। গবেষণা দ্বারা কল্পিত থিওরীটি সত্য প্রমাণিত হইলে তখনই তাহা বৈজ্ঞানিক তথ্যে পরিণত হয়। বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিকের জন্যও কল্পনার প্রয়োজন আছে।

অতএব দেখা যাইতেছে কবি সহজ পাত্র নন। কবির আদর চিরকাল ছিল, আছে এবং থাকিবে। সেই কবির মহিমা গাহিয়া এই প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিলাম।*

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা
১৯১৭

* ২৭।১২।১৭ তারিখে কলিকাতা মুসলিম ইনষ্টিটিউটে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

আনোয়ারা

(সমালোচনা)

ইহা একখানি সামাজিক উপন্যাস। মৌলবী নজিবর রহমান সাহেব কর্তৃক লিখিত এবং ৫-এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচসিকা।

বাঙালী মুসলমান এতদিন সম্যকরূপে বাংলা ভাষার সেবা করে নাই। সুখের বিষয় আজকাল এদিকে তাহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। অনেক প্রতিভাবান তরুণ লেখকের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ৩।৪ বৎসরের মধ্যেই উপন্যাসাদি অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। সেগুলির ভাব, ভাষা ও ভংগী দেখিলে লেখকের প্রাণের আবেগ, অন্তরের আকাংখা ও গতিপথের সন্ধান পাওয়া যায়।

পুস্তক তো অনেকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় সেগুলির উপযুক্ত সমালোচনা হইতেছে না। সাহিত্যে সমালোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। উপযুক্ত সমালোচনার অভাবে লেখকগণ উৎসাহ পাইতেছেন না, কিংবা নিজেদের দোষগুণ বুঝিতে পারিতেছেন না। সমালোচনা অনুকূলই হউক বা প্রতিকূলই হউক, উন্নত ধরনের (learned criticism) হইলে উহা হইতে লেখক অনেক বিষয় শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। যাহারা খেলোয়াড়, তাহারা নিজেদের ভুলচুক নিজেরা ততটা ধরিতে পারে না; দর্শকেরাই তাহা ভালো ধরিতে পারে।

যাক। আমাদের সমালোচনার বিষয়বস্তু হইতেছে উপন্যাস। অতএব উপন্যাস সম্বন্ধে এখানে দুই একটি কথা বলিলে বোধ হয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। উপন্যাস লইয়া আমাদের সমাজে রুচিবিরোধ ঘটিয়াছে। একদল

ইহার ঘোর বিরোধী, অপর দল ইহার ঘোর অনুরাগী। বিরুদ্ধবাদীরা উপন্যাসকে সৎসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন না। উপন্যাস দ্বারা জাতীয় চরিত্র গঠিত হয় না, উহা পাঠকের মনকে বিকৃত ও বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়, লোকে অযথা sentimental বা ভাববিলাসী হইয়া উঠে, প্রকৃত কাজের লোক গঠিত হয় না---ইহাই তাহাদের যুক্তি ও অভিমত। কথাগুলি সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও আংশিকভাবে সত্য বটে। তরল ভাব ও হালকা রসবোধ বহুবিধ অকল্যাণের কারণ। জাতির মেরুদণ্ড উহাতে দুর্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু অন্যদিক দিয়া দেখিতে গেলে উপন্যাসের যে কোনোই মূল্য নাই, এ কথা স্বীকার করিতে আমরা প্রস্তুত নই। সাহিত্যের দুইটি বিভাগ আছে; উচ্চাঙ্গের সাহিত্য ও সাধারণ সাহিত্য। উচ্চাঙ্গের সাহিত্যে দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাস ইত্যাদি পরিমার্জিত বিষয়গুলির একচেটিয়া অধিকার; আর গল্প-উপন্যাস ইত্যাদি যাহা কিছু সরস ও সাধারণের উপভোগ্য, তাহাই লইয়া সাধারণ সাহিত্য। এই দুই-এর সংমিশ্রণে সাহিত্যের পূর্ণতা। সুতরাং গল্প-উপন্যাসকে কি করিয়া আমরা সাহিত্যের আঙিনা হইতে তাড়াইয়া দিতে পারি? সাধারণ মানুষকে যেমন সমাজ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া যায় না, সাধারণ সাহিত্যকেও তেমনি সাহিত্যক্ষেত্র হইতে তাড়ানো যায় না। সকল কালের সকল সাহিত্যেই লোক-সাহিত্যের স্থান আছে। হোমারের 'ইলিয়াড', ভার্জিলের 'এনিড', হিন্দুর 'রামায়ণ-মহাভারত', মুসলমানের 'আলিফ্ লায়লা' একথার সাক্ষ্য দেয়।

তাছাড়া উপন্যাসের দ্বারা জাতিগঠনও সম্ভব। জাতীয় লক্ষ্য ও আদর্শের সহিত খাপ খাওয়াইয়া উপন্যাস রচনা করিলে তাহা দ্বারা সহজেই সমাজ-সংস্কার করা যায়। কথাই আছে "Example is better than precept". বাস্তবিক, উপদেশ দেওয়া অপেক্ষা উপদেশ অনুযায়ী একটি আদর্শ দেখাইয়া দিলে উহাতে অধিকতর ফল লাভের সম্ভাবনা। গল্প ও উপন্যাসের দ্বারা সেই কাজ করা সহজ হয়। কিরূপে লোকের মনে পাপের সঞ্চার হয়, কোথায় কেমন করিয়া তাহার পরিণাম ফল ফলে, কিরূপে প্রেম ও পুণ্যের জয় হয়; সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে কিরূপে মানুষের মন খেলা করে—সমস্তই উপন্যাসের মধ্য দিয়া সুস্পষ্ট ভাবে ফুটাইয়া তোলা যায়। বস্তুতঃ

মানুষের মনে রং ধরাইবার জন্য উপন্যাস এক শ্রেষ্ঠ উপকরণ। তাই আমার মনে হয় উপন্যাসকে একদম বর্জন না করিয়া উহাকে কাজে লাগানো আমাদের উচিত। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস দ্বারা বাঙালী হিন্দুর নবজীবন লাভ হইয়াছে। এইরূপ সমাজসংস্কার ও জাতিগঠনমূলক উপন্যাস বর্তমানে আমাদেরও একান্ত প্রয়োজন।

যাহারা উপন্যাস লিখিতেছেন, তাহাদের একটি কথা মনে রাখা উচিত। উপন্যাসের ধারা পরিবর্তিত হইতেছে। রোমান্টিক যুগ চলিয়া গিয়াছে, এখন মনস্তত্বের যুগ আসিয়াছে। মানব-মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিকে রূপ দেওয়াই এখনকার উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। আমাদের লেখকগণ যাহা লিখিতেছেন, তাহা অধিকাংশই রোমান্টিক। খুব আশ্চর্যজনক ঘটনার সামাবেশের নামই উপন্যাস নয়। মানব-চরিত্রের বিশ্লেষণই আজকার উপন্যাসের বড় কথা। রবীন্দ্রনাথের 'চোখেরবালি' 'নৌকাডুবি' ইত্যাদি এই শ্রেণীর উপন্যাস। বলা বাহুল্য এই ধরনের উপন্যাস আমাদের একটিও নাই।

উপরে উপন্যাস সম্বন্ধে সাধারণভাবে যাহা বলা হইল, 'আনোযারা' সম্বন্ধেও তাহা বলা যায়। ইহা অনেক স্থানে রোমান্টিক এবং অবাস্তবতা দোষদুষ্ট। আধুনিক উপন্যাসের যে বিশেষত্ব, আনোয়ারাতে তাহা নাই। তবে একেবারেই যে ইহা অবাস্তব রূপকথার অনুরূপ, তাহাও নহে। বাস্তব জীবনের কিছু স্পর্শ ইহাতে আছে। আনোয়ারার চরিত্র সাধারণ মুসলমানের আশানুরূপ হইয়াছে, একথা বলিতেই হইবে। আদর্শ পতিভক্তি, ধর্মপ্রাণতা, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, রন্ধন-নৈপুণ্য ইত্যাদি নারীধর্মের নানা গুণই আনোয়ারাতে বিদ্যমান। যে স্বামী আনোয়ারার মতো স্ত্রী-রত্ন লাভ করিতে পারে, তাহার দাম্পত্য জীবন নিশ্চিতই মধুময় হইয়া থাকে। আনোয়ারা উচ্চশিক্ষিতা না হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কিছু যায়-আসে না। **"The brain-woman never interests us like the heart-woman."**—অর্থাৎ বুদ্ধিমতী নারী হৃদয়বতী নারীর মতো আনন্দদায়িনী নয়। সেই হিসাবে আনোয়ারা-চরিত্র আমাদিককে প্রচুর আনন্দ দেয়। আনোয়ারা উপন্যাসের জনপ্রিয়তার গূঢ় কারণ এই।

কিন্তু দুঃখের বিষয় কয়েকটি স্থানে লেখক এমন সব আজগবী ঘটনার

সমাবেশ করিয়াছেন, যাহা আনোয়ারা-চরিত্রকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। লেখক অহেতুক তাঁর প্লটকে রোমান্টিক করিতে যাইয়াই সব মাটি করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, দুর্গা বৈষ্ণবীর প্ররোচনায় 'সঞ্জীবনীলতা' তুলিয়া আনিবার জন্য নিশীথ রাত্রে আনোয়ারার বাড়ীর বাহির হইয়া যাওয়া কোনোমতেই সমর্থনযোগ্য নহে—আর্টের দিক দিয়াও নহে, বাস্তবতার দিক দিয়াও নহে। কোনো নিষ্ঠাবান মুসলিম পরিবারে এরূপ ঘটনা নিতান্তই অস্বাভাবিক।

উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে আনোয়ারার "রূপার খাটে বসিয়া সোনার আলনায় চুল শুকানো" চিত্রটিও অত্যন্ত হাস্যকর। রূপকথাতেই এসব অলস কল্পনা ভালো মানায়। এইরূপ ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি আরও অনেক আছে।

তবু বলিতে চাই, নানা দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এ যুগের মুসলিম উপন্যাসগুলির মধ্যে আনোয়ারাই অগ্রগণ্য।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা

১৯১৮

বীরাঙ্গনা খাওলা

(ঐতিহাসিক কাহিনী)

বীর-কেশরী খালেদের নেতৃত্বে মুসলিম সৈন্য দামেস্ক নগরী অবরোধ করিয়াছে।

এই সংবাদে রোমক-সম্রাট হেরাক্লিয়াস খুব চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। দামেস্ক তাঁহার অধীন একটি প্রদেশ; সুতরাং ইহার রক্ষা-কল্পে উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা তাঁহার পক্ষে একান্ত কর্তব্য। এতদুদ্দেশ্যে তিনি আজানদিন প্রদেশে বিপুল সেনাসংগ্রহ করিলেন এবং ওয়ার্দ্দান নামক এক-জন বিচক্ষণ সমরনীতিবিশারদ ব্যক্তিকে তাহার অধিনায়কপদে বরণ করতঃ অচিরে দামেস্ক-দুর্গের অবরুদ্ধ সৈন্যদিগকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন।

মহাবীর খালেদ এই সংবাদ পাইয়া একটু বিচলিত হইলেন। সম্মুখে পশ্চাতে উভয় দিকেই শত্রু-সমাবেশ। কোন্ দিকে ফিরিবেন? যদি তিনি দুর্গ অবরোধ করিয়া বসিয়া থাকেন, তবে ওয়ার্দ্দানের সৈন্য আসিয়া পশ্চাদ্দিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিবে। আবার যদি অবরোধ উঠাইয়া লইয়া ওয়ার্দ্দানের সহিত যুদ্ধদান করিতে যান, তবে সেই সুযোগে দুর্গস্থিত শত্রু-সৈন্য তাহার পশ্চাদানুসরণ করিবে! সৈন্যসংখ্যাও এত বেশী নহে যে, দুই দলে বিভক্ত করিয়া দুই দিকেই যুদ্ধ চালনা করেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া তিনি সকলের নিকটে এ সম্বন্ধে পরামর্শ লইলেন। তখন অন্যান্য মুসলিম সৈন্যদল সিরিয়ার বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অবস্থান করিতেছিল। সুতরাং তাহাদের সাহায্য লাভ করাও সম্ভব বলিয়া

বোধ হইল না ; কারণ তাহাদিগকে কেন্দ্রীভূত করিতে হইলে সময়ের দরকার। পরামর্শের পর অবশেষে স্থির হইল যে, দামেস্ক হইতে অবরোধ উঠাইয়া আজানদিন অভিমুখেই যাত্রা করা যাউক। পথিমধ্যেই ওয়ার্দ্দানের সৈন্যদলকে বাধা প্রদান করিতে হইবে।

ফজরের নামাজের পর মঙ্গলময় খোদাতালার নিকট মুসলমানদের সর্ববিধ কল্যাণ এবং নিজেদের সংকল্পসাফল্য কামনা করিয়া সকলে দুর্গ-প্রাকার ছাড়িয়া চলিলেন। তখন প্রভাতের স্বর্ণ-প্লাবনে পূর্বাকাশ ভাসিয়া গিয়াছে। সেই রক্তিম আভা বিশ্ববুকে নামিয়া আসিয়া মোস্লেম সেনানীর ললাট-দেশ চুম্বন করতঃ তাহাদের ধর্মোজ্জ্বল মুখশ্রীকে আরও পবিত্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিল। হিরণ-কিরণের পুলকস্পর্শ খরধার মুক্ত তলোয়ারে বিশ্ববিজয়ী মুসলমান জাতির দোর্দণ্ডপ্রতাপ, অনুপম নির্ভীকতা, অসীম মনোবল এবং প্রবল বিজয়াকাঙ্খার রেখাপাত করিয়া গেল।

বিপক্ষীয়গণ দুর্গাভ্যন্তর হইতে যখন দেখিতে পাইল মুসলমান সৈন্য সদলবলে প্রস্থান করিতেছে তখন তাহারা মনে করিল, নিশ্চয়ই ইহারা ভয়ে পলায়ন করিতেছে। নতুবা এমন সময় এমন ভাবে অবরোধ উঠাইয়া লইবে কেন? সুতরাং আক্রমণের ইহাই উপযুক্ত সুযোগ মনে করিয়া 'পল' এবং 'পিটার' নামক ভ্রাতৃযুগলের অধিনায়কত্বে তাহারা মুসলমান সৈন্যর পশ্চাদ্ধাবন করিল। দশ সহস্র পদাতিক সৈন্য লইয়া পিটার অগ্রসর হইলেন, এবং পল ছয় সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য পরিচালনা করিলেন।

ইত্যবসরে খালেদ প্রমুখ বীরগণ প্রধান সৈন্যদল সহ দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া অনেকদূর চলিয়া গিয়াছেন। রসদপত্র সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি সহ স্ত্রীপুত্রাদি পশ্চাদ্ভাগে রহিয়াছে।

পলের অশ্বারোহী সৈন্যদল অধিকতর ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হইয়া পার্শ্বস্থিত মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করিল। ক্ষণপরে পিটার তাহার পদাতিক সৈন্য লইয়া সাজ-সরঞ্জাম, রসদ-সম্ভার এবং পুত্রকন্যাদিসহ রমণী-দিগকে ঘেরাও করিয়া ফেলিল। রমণীবৃন্দ যথাসাধ্য বাধাপ্রদান করিল বটে, কিন্তু অগণিত শত্রু-সম্মুখে তাহাদের ক্ষুদ্র বাধা প্রবল স্রোতের গতি-পথে বালির বাঁধের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া ভাসিয়া গেল। সকলে বন্দী-

হইল। রমণী দলের মধ্যে বীরবর জেরারের সহোদরা ভগিনী অনিন্দ্য-সুন্দরী রণরঙ্গিনী খাওলা অন্যতমা।

আল্লাহু-আকবর ধ্বনিতে আকাশ প্রকম্পিত করিয়া মুসলমান সৈন্য বিপুল বিক্রমে পলের অশ্বারোহী সৈন্যকে আক্রমণ করিল। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই স্বর্গীয় তেজোদীপ্ত অল্পসংখ্যক মুসলমান সৈন্যের প্রবল আক্রমণ প্রতিহত করা পলের একান্ত অসাধ্য হইয়া উঠিল। তাহার সৈন্যদল ক্রমে ক্রমে এত অধিক পরিমাণে নিহত হইতে লাগিল যে, অবশেষে পল তাহার ষষ্ঠি সহস্র সৈন্যের মধ্যে অতি অল্প-সংখ্যক সৈন্য লইয়া দামেস্কাভিমুখে পলাইয়া আসিতে বাধ্য হইলেন।

ইত্যবসরে পিটার বন্দিনীদিগকে লইয়া দামেস্কের পথে অনেকদূর অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন। ভ্রাতার সাহায্যকল্পে অগ্রসর না হইয়া তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন—অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করার ফলে মুসলমান সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া কোথায় পলাইয়া গিয়াছে। মুসলমানদিগের পরাজয় সম্বন্ধে তিনি স্থির নিশ্চিত ছিলেন, তাই তিনি আর ভ্রাতার সাহায্য করিতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করিলেন। নিমেষের মধ্যে মস্ত একটা শত্রু-বিজয় হইয়া গেল ভাবিয়া তাঁহার সৈন্যদল আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেল। তখন সকলে একটা নিভৃত স্থান দেখিয়া লুন্ঠন-লব্ধ যাবতীয় দ্রব্য নিজেদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইবার জন্য উপবেশন করিল। অদূরে একটি ক্ষুদ্র নহর প্রবাহিত হইতেছিল; তাহার পানিতে সকলে হস্তমুখ প্রক্ষালনপূর্বক প্রান্তরের মৃদুমন্দ সমীরণে ক্লান্তি দূর করিল। অতঃপর লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি এবং রমনীবৃন্দকে সকলের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইল। পিটারের অংশে রমনী দুর্লভ খাওলা নির্দেশিত হইলেন।

বন্টন শেষ হইলে সকলে শিবির' সন্নিবেশ করতঃ ইচ্ছামত বিশ্রাম করিতে প্রস্তুত হইল। বন্দিনীদিগকে নিরস্ত্র করিয়া তাহাদের পাহারা কার্যে একজন গ্রীক সৈন্যকে নিযুক্ত করা হইল। রমণীবৃন্দ বাহিরে পড়িয়া নিজেদের শোচনীয় পরিণাম চিন্তা করিতে লাগিলেন।

খাওলা বীরবর জেরারের উপযুক্ত ভগিনী। রমণী-সুলভ আকুল

ক্রন্দনে অথবা হা-হুতাশে ব্যাপৃত না হইয়া তিনি মুক্তির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন, এরূপ ভাবে বিধর্মীদিগের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে তাহাদের ভোগের দাসী হইতে হইবে। এই জ্ঞান তাঁহার বলিষ্ঠ আত্মমর্যাদাকে বারে বারে আঘাত দিতে লাগিল। তাঁহারা যে একটা বীর জাতির বংশ-সম্ভূতা, একথা মুহুর্মুহু তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; সঙ্গিনীদিগকে সম্বোধন করিয়া তেজোদৃপ্ত কন্ঠে বলিতে লাগিলেন: কি? আমরা কি মহাপুরুষ হজরতের অনুবর্তিদিগের বংশ-সম্ভূতা নই? আমাদের পিতা, আমাদের ভ্রাতা, আমাদের স্বামী, আমাদের পুত্র কি বীর নামে পরিচিত নয়? তাহাদের তেজোবীর্য কি আমাদের শিরায় শিরায় রক্ত-কণিকায় প্রবাহিত হইতেছে না? তাই যদি হয়, তবে কোন্ প্রাণে কোন্ হস্তে আমরা তাহাদের শুভ্র পবিত্র নামে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিব? স্বজাতির গৌরব রক্ষা কল্পে, সতীত্ব ও ধর্ম রক্ষা কল্পে, এসো, আমরা যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হই।

খাওলার সঙ্গিনীদিগের মধ্যে হামজা-বংশীয়া বীরজায়াগণ অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাদের সকলেই অশ্বারোহণে সুনিপুণা, তীর এবং বর্শা নিক্ষেপে সিদ্ধহস্তা। তাঁহারা খাওলার সেই জ্বালাময়ী ধিক্কারবাণী শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, "বোন, উপায় কি? তরবারি, বর্শা অথবা তীরধনু কিছুই যে আমাদের নাই।"

খাওলা উত্তর করিলেন—"কিছুই নাই বটে; কিন্তু শিবিরের এই সকল কাষ্ঠখণ্ড তো আছে? এসো, প্রত্যেকে ইহার এক একখানি লও। ইহা দ্বারাই আমরা যুদ্ধ করিব। খোদার অনুগ্রহে নিশ্চয়ই আমরা জয়যুক্ত হইব। আর যদি না হই, তাতেই বা ক্ষতি কি? বীরাঙ্গনার মতো একে একে শত্রুহস্তে জীবন বিসর্জন দিব, তথাপি এমনভাবে জীবিত থাকিয়া আমাদের স্বদেশ ও স্বজাতির মুখে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিতে পারিব না।"

অফিরা নাম্নী একজন বীররমণী খাওলার এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। অতঃপর সকলে সেইসব কাষ্ঠদণ্ড একে একে তুলিয়া লইলেন। খাওলা

সকলকে বৃত্তাকারে পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া দিয়া বলিলেন—"নড়িও না, ঠিক হইয়া দাঁড়াও! সম্মুখে যাহাকে পাইবে, তাহারই মস্তক লক্ষ্য করিয়া বিপুল বিক্রমে আঘাত করিবে। সাবধান, শত্রু যেন তোমাদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে না পারে।"

খাওলার যে কথা সেই কাজ। একজন গ্রীক সৈন্য এই সময় তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। তখনি খাওলার এক আঘাতে বেচারার মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। এই গোলযোগে পিটার আসিয়া দেখিলেন ব্যাপার গুরুতর! সৈন্যদিগের দ্বারা তিনি তাহাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং সকলকে শান্ত করিবার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু নারীবাহিনী অটল অচল! পক্ষান্তরে যে-ই তাঁহাদের দণ্ডসীমার মধ্যে আসিতে লাগিল, সে-ই আহত হইল।

সেই এলোকেশে রণরঙ্গিনী বেশে ভীতিহীনা দণ্ডপাণি খাওলার মুখাবয়ব এক অপূর্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল। কি সু-উন্নত দেহ! মাংসপেশী সমন্বিত কি সুডোল নিটোল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ! কি মনোরম গঠনভঙ্গিমা। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল নয়ন-তারার কি বহ্নি-দীপ্তি! দেখিলে মনে ভয় ও বিস্ময় জাগে।

খাওলার উজ্জ্বল-মধুর সৌন্দর্য দর্শনে পিটার অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সৈন্যদিগকে বলিয়া দিলেন, "সাবধান, একটি অস্ত্রও যেন কাহারও অঙ্গে নিক্ষিপ্ত না হয়।" তৎপর নিজে নানাবিধ প্রেমপূর্ণ মৃদু বচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন,—"সুন্দরী, শান্ত হও; এ দুঃসাহস পরিত্যাগ করো। অসংখ্য সৈন্যের বিরুদ্ধে তোমাদের এই যুদ্ধপ্রচেষ্টা নিতান্তই বাতুলতার পরিচায়ক। তুমি জানো, মুহূর্ত মধ্যে আমার সৈন্যদল তোমাদের ক্ষুদ্র অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া দিতে পারে; অতএব শান্ত হও। কিসের জন্য এত বিপুল প্রয়াস? শত্রু জয় করিবে? ভালো, তাই যদি, তবে রণমূর্তি পরিহার করো, বিনাযুদ্ধে শত্রুজয় হইবে। আমার এই বিশাল হৃদয়-রাজ্য তোমাকেই সমর্পণ করিতেছি; এসো, তুমি তাহার রাণী হইবে। সৈন্যসামন্ত, ধন-সম্পদ সকলি তোমার পদমূলে উৎসর্গ করিব। হে সুন্দরী, আমি তোমাকে ভালোবাসি।"

এই অযাচিত প্রেম-সম্ভাষণে সতী-সাধ্বী খাওলার ক্রোধ আরও শতগুণে বর্দ্ধিত হইল।—"ওরে বিধর্মী কুক্কুর, এত বড় স্পর্ধা।" বলিতে বলিতে খাওলার বিস্ফোরিত নয়নদ্বয় অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় জলজল করিয়া উঠিল।

খাওলার এই ঘৃণাসূচক ভীতি-প্রদর্শনে পিটারের মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল। বলিলেন--"সুন্দরি! সৌন্দর্যগর্বে বিভোর হইয়া একেবারে কাণ্ড-জ্ঞান শূন্য হইয়াছ? এখনও বলিতেছি, ক্ষান্ত হও, নতুবা মরণ নিশ্চিত।"

খাওলা একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন—"মরণ? আরব রমণী ধর্ম ও সতীত্ব রক্ষার জন্য মরণকে হাসিয়া বরণ করিতে জানে... সেজন্য তারা শত্রুকে একটুও ভয় করে না।"

শুনিয়া পিটারের ধৈর্যচ্যুতি হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি সৈন্য দিগকে হুকুম দিলেন—"আক্রমণ করো।" আদেশ প্রাপ্তিমাত্র সৈন্যগণ রমণীদিগের প্রতি ধাবিত হইতে উদ্যত হইল। কিন্তু পিটার ইঙ্গিতে তাহাদিগকে থামাইয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "মরণ যে অতি [illegible] কে তোমাদিগকে রক্ষা করিবে?"

খাওলা উর্ধ্বদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ পূর্বক বলিলেন, "রক্ষাকর্তা আল্লাহ্।"

"বটে! তবে দেখ।"—এই বলিয়া তিনি পুনরায় সৈন্যদিগকে আদেশ করিলেন—"আক্রমণ করো!"

এমন সময় ও কি! অদূরে ও কিসের শব্দ। এ যে অশ্বনিচয়ের সমবেত পদনির্ঘোষ। পিটার দেখিতে পাইলেন, বীরেন্দ্র জেরার সসৈন্যে তীরবেগে তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছেন।

দেখিয়াই পিটারের সর্বাঙ্গে কম্প উপস্থিত হইল। তাড়াতাড়ি তিনি সৈন্যদিগকে ক্ষান্ত হইতে আদেশ দিলেন। খাওলাকে লক্ষ্য করিয়া [illegible] "ফিরিয়া যাও। তোমরা মুক্ত। তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিলাম।" এই বলিয়া তিনি সদলবলে পলাইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। রণ-রঙ্গিনী খাওলা তখন দৃপ্তকন্ঠে বলিয়া উঠিলেন: "কেন, প্রণয়-বাসনা নিমেষেই মিটিয়া গেল? যাও কোথায়?" এই বলিয়া তিনি হস্তস্থিত দণ্ড দ্বারা পিটারের অশ্বের পদে ভীমবেগে আঘাত করিলেন। অশ্বের সঙ্গে সঙ্গে পিটার ভূমিতে

পতিত হইলেন। এমন সময় জেরার আসিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

দামেস্ক-দুর্গের পতন হইল।

তখন খাওলার সেই রণরঙ্গিণী মূর্তি আর নাই। ভীষণ ঝটিকাবর্তের পর প্রকৃতি যেমন শান্তভাব ধারণ করে, খাওলার মধ্যেও তেমনি একটা প্রশান্তি নামিয়া আসিয়াছে; রক্তিম অধরে হাসি ফুটিয়াছে; বিজয়োৎফুল্ল নয়ন-কোণে বিদ্যুৎ খেলিতেছে।

"আল্লাহু-আকবর" ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিল। দামেস্ক-দুর্গের মাথার উপরে ইসলামের হিলালী ঝাণ্ডা সগৌরবে উড়িতে লাগিল।

সওগাত, ১৯১৮

শিশুর শিক্ষা

প্রকৃতিবাদী ফ্‌রাসী মনীষী রুশো (Rousseau) বলিয়াছেন :

"Coming from the hand of the Author of all things, everything is good; in the hands of man everything degenerates."

অর্থাৎ: স্রষ্টার হাত হইতে যাহা-কিছু আসে সবই সুন্দর; মানুষের হাতে পড়িয়া সবই বিকৃত হইয়া যায়। কথাটি সর্বাংশে সত্য না হইলেও মানব-শিশুর বেলায় অনেকখানি সত্য। শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে থাকে অতি পবিত্র—অতি নির্মল। কিন্তু মানুষের হাতে পড়িয়া সে অন্যরূপ হইয়া যায়।

অবশ্য রুশোর কথা এখানে সম্পূর্ণরূপে মানিয়া লওয়া যায় না। রুশো হয়তো বলিতে চান শিশুর লালন-পালন ও শিক্ষার ভার প্রকৃতির উপর ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত; সেখানে মানুষের কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। কিন্তু মানুষ তো আর পশু নয়; সে বিবেক ও জ্ঞানসম্পন্ন (rational) জীব। একটা বিশেষ লক্ষ্য ও আদর্শ দ্বারাই সে চালিত হয়। কাজেই তার শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবন-পদ্ধতি প্রকৃতি হইতে অনেকাংশে স্বতন্ত্র না হইয়াই যায় না। মানুষের দ্বিতীয় স্বভাব (Second Nature) আছে; সে স্বভাব তার শিক্ষা, আচার-ব্যবহার, পারিপার্শ্বিকতা এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রভাবে গড়িয়া উঠে। এইজন্য মানুষের সভ্যতা, রুচি ও আদর্শের অনুযায়ী করিয়াই শিশুকে গড়িয়া তুলিতে হয়। শিশুর লালন-পালন ও শিক্ষাদান তাই আমাদের অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ এক কর্তব্য।

কিরূপ শিক্ষা শিশুকে দিতে হইবে? সে শিক্ষা কি প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হইবে? কোন্ লক্ষ্য ও আদর্শের দ্বারা সে শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত

হইবে? আমাদের হাতে শিশুর শিক্ষা সঠিক হইতেছে কিনা, কেমন করিয়া আমরা তাহা বুঝিব? ভালোমন্দ বিচার করিবার মাপকাঠি আমাদের কী?

এ বড় কঠিন প্রশ্ন।

আমাদের মনে হয়: মধ্য পথ ধরিয়া আমাদিগকে চলিতে হইবে। স্বভাব কী চায় তাহাও যেমন আমাদিগকে দেখিতে হইবে, মানব-সমাজ কী চায় তাহাও ঠিক তেমনই আমাদিগকে দেখিতে হইবে। শিশু নিঃসহায় হইয়া আমাদের হাতে আসে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সে অত দুর্বল নয়। নানা অস্ত্রে ভূষিত হইয়াই এই শিশু-বীরদল দুনিয়ার বুকে লাফাইয়া পড়ে। কাজেই তাহাদিগকে যতো সহজ ও নিরীহ বলিয়া মনে হয়, আসলে কিন্তু তাহারা ততো সহজ পাত্র নয়। বিশেষ বিবেচনা করিয়া তাহাদের গায়ে হাত দেওয়া উচিত।

শিশুকে কিভাবে আমরা লালন-পালন করি এবং কোথায় আমাদের ভুল হয়, সেই কথাই সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব। অন্য কাহারও কথা পরে হইবে, শিশুর যিনি জন্মদাত্রী, সেই জননী কি করেন, তাহাই আগে দেখা যাউক।

আমরা প্রথমেই বলিয়া রাখিতে চাই: জননীর স্নেহই শিশুর প্রথম ক্ষতির কারণ। আমাদের সতর্কতা সর্বপ্রথম এখান হইতেই আরম্ভ হওয়া উচিত।

মাতাপিতা প্রাণ দিয়া শিশুকে ভালোবাসেন ও লালন-পালন করেন কেন? উদ্দেশ্য: পরবর্তী কালে সে যাহাতে সত্যিকার 'মানুষ' হইয়া জগতে আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। ইহাই যদি লক্ষ্য হয়, তবে প্রত্যেক মাতাপিতার দৃষ্টি রাখা উচিত—শিশুর প্রতি তাঁহাদের স্নেহ ও মমতা যেন সেই মহান উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হইয়া না দাঁড়ায়।

কিন্তু জননী অনেক সময় সে কথা ভুলিয়া যান। অহেতুক স্নেহ করিতে গিয়া সন্তানের বহু অমঙ্গলই তিনি ডাকিয়া আনেন। স্তন্যদুগ্ধই হউক অথবা গোদুগ্ধই হউক, শিশু যখন খাইতে চাহে না, তখনও জননী জোর করিয়া শিশুকে দুধ খাওয়ান। শিশু কতোখানি খাইতে পারে বা কখন্ কখন্ তাহার ক্ষুধা লাগিতে পারে, সে সব কথা চিন্তা না করিয়াই তিনি শিশুকে দুগ্ধ

পান করান। শিশু যখন ঝিনুকের দুধ ওগ্‌রাইয়া ফেলে, তখনও ছাড়াছাড়ি নাই। জোর করিয়াই দুধের ঝিনুক তিনি তাহার মুখে পুরিয়া দেন। এখানে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। স্বভাব চায় না অথচ মা ছাড়েন না। দুধ কম খাইলে পাছে শিশু কাবু হইয়া যায়, এই তাঁর ভয়। ফলে শিশুর পেটের অসুখ দেখা দেয়, লিভার খারাব হয় এবং অন্যান্য উপসর্গ বাড়ে। কাজেই এখানে স্নেহকে কিছুটা সংযত করা প্রয়োজন। সময় এবং পরিমাণ ঠিক করিয়াই শিশুর দুগ্ধ পান করানো উচিত। শিশু কাঁদিয়া উঠিলেই যে বুঝিতে হইবে তার ক্ষুধা পাইয়াছে, এরূপ মনে করা ভুল। শিশুর ভাব-প্রকাশের একমাত্র উপায়ই তো কান্না। কোন্ খেয়ালে সে কাঁদে কে বলিবে? হয়তো মাকে না দেখিয়া কাঁদে, না হয় তো কৃমির জন্য পেট কামড়ায় বলিয়া কাঁদে, না হয় তো অন্য একটা কিছুর অভাবের বেদনায় কাঁদে। সুতরাং সব কান্নার ভিতর দিয়াই সে যে দুধ চায়, ইহা হইতেই পারে না।

অতএব শিশুর কান্নাকেই আমাদের প্রথম বুঝা উচিত। এই কান্না অতি ভয়ংকর। কান্নাকে না বুঝিলে শিশুর শিক্ষা কিছুতেই নির্ভুল হইতে পারে না। গোড়াতেই গলৎ ঘটিয়া যায়।

শিশুর কান্নায় অত্যধিক মনোযোগী হইলে শিশু স্বভাবতই বুঝিতে পারে কান্না দ্বারাই তাহার সকল সাধ পূর্ণ হইতেছে। সুতরাং কান্নাকে সে তার সাধ-পূরণের উপায় স্বরূপ মনে করিয়া লয়। শিশু যতোই বর্ধিত হইতে থাকে, ততোই সে কান্নার গুণ বুঝিতে পারে। শিশু যখন খাইতে শিখে, হাঁটিতে পারে, অথচ কথা বলিতে পারে না, তখন সে একটু সজাগ ভাবেই কান্নার অস্ত্র নিক্ষেপ করে। প্রথম খাওয়া শিখিয়াই সে সবকিছু খাইতে চায়, খাওয়ার প্রতি তার লোভ বাড়িয়া যায়। বিস্কুট, লজেন্স, মিষ্টি, পিঠা, মাছ, গোশ্‌ত্, কমলালেবু যাই কিছু সে দেখে, সবই সে বেশী বেশী খাইতে চায়। কিছু হাতে দিলে চলে না। সেটুকু খাইয়া আবার সে দাবী করে। নিজেরা কিছু খাইতে গেলে অমনি সে আসিয়া পাশে দাঁড়ায় আর নানারূপ দৌরাত্ম্য আরম্ভ করে। একটু রাগ করিলেই বস্, কান্না জুড়িয়া দেয়। তখন বাধ্য হইয়া আবার একটা অংশ দিয়া তাহাকে শান্ত করিতে হয়। এখানে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথম বারের কান্নায় তার কিছু করুণ মিনতি

থাকে, কিন্তু দ্বিতীয় বা তৎপরবর্তী কান্নায় আর মিনতির ভাব থাকে না, সেখানে আসে তার হুকুম। অশ্রুর হুকুম।

রুশো তাই ঠিকই বলিয়াছেন :

"The first crying of children is a prayer. If we do not heed to it well, this cry soon becomes a command."

অর্থাৎ: শিশুর প্রথম কান্না একটি প্রার্থনা। যদি এই প্রার্থনার প্রতি আমরা মনোযোগী না হই, তবে শীঘ্রই ইহা আদেশে পরিণত হয়। কথাটি খুবই সত্য, সন্দেহ নাই। শিশু যখন কোনো কিছু আবদার ধরিয়া না পায়, তখন সে যে-কান্না কাঁদে, তাহা দস্তুর মতো একটা ছোট খাটো বিদ্রোহ। Locke-এর ভাষার বলিতে গেলে বলিতে হয় : সেটা একটা open declaration of their insolence or obstinacy" অর্থাৎ বিদ্রোহ বা জিদের প্রকাশ্য ঘোষণা।

সুতরাং শিশুর জীবন-গঠনের প্রাক্কালে মাতাপিতাকে এই অশ্রুর যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইবে। শিশুর ভালোমন্দের জ্ঞান তো নাই, কাজেই যে কোনো বিষয়ে আবদার করিলেই যে তাহা পূরণ করিতে হইবে, তাহা কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নহে। অবশ্য সব কান্নাকেই যে অবহেলা করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি না। প্রকৃত বেদনা বা অভাবের অনুভূতি হইতে যদি কান্না আসে, তবে প্রথমবারেই তাহা পূরণ করা উচিত। মাতাপিতার করুণায় শিশু যেন আস্থা না হারায়। কিন্তু যেখানে পরিষ্কার বুঝা যাইবে যে, শিশু অন্যায় আবদার বা জিদ ধরিয়াছে এবং সে আব্দার রক্ষা করিলে তাহার অকল্যাণ হইবে, তখন কিন্তু মাতাপিতাকে কঠোর হইতেই হইবে। কিছুতেই সেরূপ আব্দারকে তাঁরা যেন প্রশ্রয় না দেন। কিছু মিথ্যা স্তোকবাক্য দিয়া তাহাকে থামানোও বিপজ্জনক। মাতাপিতার এরূপ মিথ্যা আচরণ দেখিয়া দেখিয়াই শিশুরা পরে মিথ্যা কথা বলিতে শিখে। কেঁদো না সোনা-মানিক, তোমাকে একটা ভা-লো রাঙা ঘোড়া কিনে দেবো, অ-নে-ক লবেঞ্চুস এনে দেবো—এই ধরনের কথা বলা ভালো নয়। যদি কিছু বলিতেই হয়, তবে যেন কাজেও তাহা করা হয়। জিদ্দী কান্নার সময় বরং শিশুর প্রতি অবজ্ঞা দেখানো ভালো। গোড়াতেই বলিয়া দিলে হয় : চুপ করো, নয়তো

তোমার কোনো কথা আমি শুন্‌বো না। শিশু যদি চুপ করে ভালোই, নইলে মাতাপিতাকেই কঠোর হইয়া চুপ করিতে হইবে; হাজার কাঁদিলেও তাহারা যেন সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করেন। এখানে কিছু শিথিলতা দেখাইলেই বিপদ ঘটে। শিশু ভাবে, একটু জোর দিয়া কাঁদিয়া যখন কিছুটা পাইয়াছি, আর একটু জোর দিয়া কাঁদিলে নিশ্চয়ই আরো বেশি পাইব। কিন্তু যদি একবার সে বুঝিতে পারে যে তার কান্নায় কোনো ফল হয় না, তখন সে ঐ অস্ত্র ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করে। অবশ্য শিশু নত হইলে তখন তার প্রতি সহানুভূতি দেখান উচিত। এ অবস্থায় রুশোর উপদেশ যুক্তিসঙ্গত। তিনি বলিতেছেন:

"So long as he cries, I will not go to him ;
as soon as he stops, I will run to him."

অর্থাৎ: যতোক্ষণ শিশু কাঁদিবে ততোক্ষণ আমি তার কাছে যাইব না; যেই থামিবে অমনি তার কাছে দৌড়াইয়া যাইব।

অতএব পরিষ্কারই দেখা যাইতেছে শিশুর কান্নাকে কন্ট্রোল না করিতে পারিলে ফল উল্টা ফলে। মাতাপিতা কোথায় শিশুকে শাসন করিবেন তাহা না হইয়া শিশুই মাতাপিতাকে শাসন করে। এই জন্যই দার্শনিক Locke বলেন: শৈশবেই বরং শিশুর প্রতি কিছুটা নিষ্ঠুর হইয়া (অন্তরে নয় প্রকাশ্যে) বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ভালোবাসা ও স্নেহ জ্ঞাপন করিতে হয়।

কান্নাকে প্রশ্রয় দিলে শিশুর চরিত্র কিরূপ বিকৃত হইয়া পড়ে, তাহার দুই একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি:

একটি ছেলে কোনো কিছু চাহিয়া না পাইলেই অভিমান করিয়া মাটিতে শুইয়া পড়িত। ছেলের মা হাসিয়া হাসিয়া তাহাকে তাড়াতাড়ি কোলে তুলিয়া লইতেন। খোকা তখনও কথা বলিতে শিখে নাই, অথচ তার এত দুষ্টামি। খোকার মা'র কিন্তু এটা খুব ভালো লাগিত। তিনি ইহার পুনরভিনয় করাইতেন। দুই-এক দিন পরে দেখা গেল, খোকার যে-কোনো অভাব পূর্ণ না হইলে, অথবা একটু কিছু চোখ রাঙাইলেই বা তিরস্কার করিলেই অমনি সে শুইয়া পড়ে, কিছুতেই উঠিতে চাহে না। এমন কি, হামাগুড়ি

দিয়া ঘরের দাওয়ার একদম কিনারে গিয়া পা ঝুলাইয়া দেয়; যেন সে ইচ্ছা করিয়াই পড়িয়া যাইবে। মা তাড়াতাড়ি গিয়া তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া আনেন। দুইচারিদিন এইরূপ দেখিয়া একদিন আমি খোকার মাকে বলিলাম, ধরিও না, দেখি কি করে। খোকার মা তাহাই করিলেন। প'ল। প'ল। গেল। গেল। —ইত্যাদি কোনোরূপ সহানুভূতিসূচক শব্দও তিনি করিলেন না। খোকা অনেকক্ষণ সেইরূপ ভাবেই পড়িয়া যাইবার ভান করিয়া থাকিল। অনেকক্ষণ পরে যখন সে দেখিল কেহই তাহাকে তুলিতে বা ধরিতে যাইতেছে না, তখন সে নিজেই খানিকটা সরিয়া আসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দুই একদিন এইরূপ করিবার পর দেখা গেল তাহার এই অভ্যাস দূর হইয়াছে।

ইচ্ছা করিলে শিশুর এইরূপ অনেক বদভ্যাসই ত্যাগ করানো যায়।

মাতাপিতার স্নেহ-মমতা আর একদিক দিয়াও শিশুর জীবন গঠনে অন্তরায় সৃষ্টি করে। শিশুকে সব সময়ে আমরা সতর্ক পাহারা দিয়া রাখি—যাহাতে বিপজ্জনক কোনো কাজে সে হাত না দেয়। ছুরি-কাঁচি হাতে লইলে, রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করিতে গেলে অথবা ঐরূপ অন্য কোনো কাজ করিতে দেখিলে আমরা তাড়াতাড়ি ছুরিটা তার হাত হইতে কাড়িয়া লই বা রৌদ্রের মধ্য হইতে ধরিয়া আনি। এরূপ সতর্কতার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। অন্যথায় মারাত্মক বিপদ ঘটিতে পারে। কিন্তু দুঃখ ও বিপদের সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতা হইতে শিশুকে দূরে রাখিয়া দিলেও তো তার মস্তবড় অকল্যাণ করা হয়। মানব-জীবন কুসুমাস্তৃত নহে। এর অধিকাংশ পথই কন্টকিত। দুঃখ ও বেদনার মধ্য দিয়াই মানুষকে চলিতে হয়। কাজেই, জীবনে যে-দুঃখ অনিবার্য হইয়া আছে, তাহার কোনো আভাস বা অভিজ্ঞতা না দিয়াই তাহাকে সংসারে ছাড়িয়া দেওয়াও আমাদের উচিত নয়। আমরা তো চাই যে, শিশু যেন বড় হইয়া জীবন-যুদ্ধে জয়ী হয়। অতএব, যেসব কাজে কিছু কিছু বিপদ আছে, তাহার ধারণা প্রথম হইতেই শিশুকে দিতে হইবে। মারাত্মক কোনো অভিজ্ঞতা দিতে চাহি না বটে, কিন্তু ছোটখাটো দুঃখ ও বিপদের অভিজ্ঞতা দেওয়া দরকার। ছুরিতে একটু হাত কাটিয়া যাওয়া, একটু আছাড় খাইয়া পড়িয়া যাওয়া—এই ধরনের দুঃখে মাতাপিতার বরং কিছু

উৎসাহ দেওয়া উচিত। শিশুকে একেবারে 'good boy' করিয়া রাখা উচিত নয়। এ বিষয়ে রুশোর কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য। রুশো তাঁহার কল্পিত শিশুপুত্র 'এমিল' (Emile) সম্বন্ধে বলিতেছেন:

"Far from taking care that Emile does dot hurt himself I shall be dissatisfied if he never does and so grows up unacquainted with pain."

অর্থাৎ: এমিল কোনোরূপ আঘাত পাইলে আমি দুঃখিত হইব না, কিন্তু কোনোরূপ আঘাত না পাইয়া, জীবনের দুঃখ-বেদনা সম্বন্ধে কোনোরূপ অভিজ্ঞতা না লইয়া সে যদি বড় হইয়া উঠে, তবেই আমি দুঃখিত হইব।

অতএব আমাদের শিশু-শিক্ষার মূলনীতি হইবে:

"Neither slave nor tyrant."

অর্থাৎ: শিশুকে একেবারে ক্রীতদাসও করা হইবে না, আবার তাহাকে দারুণ ডংকাবাজও করা হইবে না।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা
১৯২২

ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ

কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গীতি-কবিতায় যে-ভাব ও আদর্শ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সহিত ইসলামের চমৎকার সাদৃশ্য আছে। তাঁহার ভাব ও ধারণাকে যে-কোনো মুসলমান অনায়াসে অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পারে। বাংলা ভাষায় আর কোনো কবি এমন করিয়া মুসলমানের প্রাণের কথা বলিতে পারেন নাই। শুধু বাংলা ভাষা কেন, জগতের কোনো অমুসলমান কবির হাত দিয়াই এমন লেখা বাহির হয় নাই। পৌত্তলিকতা, বহুত্ববাদ, নিরীশ্বরবাদ, জন্মান্তরবাদ, সন্ন্যাসবাদ প্রভৃতি যে সমস্ত ধারণা ইসলামী আদর্শের ঘোর বিরোধী, তাহা রবীন্দ্রনাথের লেখায় অনুপস্থিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে সর্বপ্রথমেই আমাদিগকে বুঝিতে হইবে—ইসলাম কী এবং উহার বিশেষত্ব কী; কারণ তাহা হইলে ইসলামের সহিত রবীন্দ্রনাথের কোথায় কতোটুকু মিল আছে, তাহা বুঝিবার সুবিধা হইবে।

ইসলামের বিশেষত্ব

(১) খোদাতালাকে এক ও অদ্বিতীয় প্রভু মনে করা—ইসলামের মূল-মন্ত্রই হইতেছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" (এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেহ উপাস্য নাই)। নিখিল বিশ্বের নিয়ামক তিনি, জীবন-মরণের প্রভু তিনি। "আমরা তোমাকেই আরাধনা করি, এবং তোমারই নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করি"—ইহাই মুসলমানের দৈনন্দিন প্রার্থনা।

(২) খোদাতালার মহান ইচ্ছার সম্মুখে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা—তাঁহার ইচ্ছাকে সর্ব অবস্থায় জয়যুক্ত করাই ইসলামের প্রধান শিক্ষা। সফলতা-নিষ্ফলতা সুখ-দুঃখ সম্পদ-বিপদ—সমস্তই তাঁহারই দান। এখানে অহমিকা নাই, আমিত্বের কোনো গর্ব নাই। রিক্ত-মুক্ত ভাবে খোদাতালার জন্যই সমস্ত কাজ করিতে হয়।

(৩) খোদাতালা এবং তাঁহার সৃষ্টজীবের সহিত প্রেম স্থাপন করা—ইসলামের ধাতুগত অর্থও হইতেছে শান্তি। সুতরাং ইসলাম শান্তির ধর্ম। এখানে বিরোধ নাই, বিদ্রোহ নাই, আছে কেবল শান্তি, আছে কেবল প্রেম—খোদাতালার সহিত প্রেম, তাঁহার সৃষ্টির সহিত প্রেম।

(৪) বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস বর্জন করা—ইসলাম বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস কখনো অনুমোদন করে না; সংসারের সমস্ত কর্তব্য পালন করিয়া ধর্ম-সাধন করিতে বিধান দেয়। খোদাতালা-দত্ত এই আলো-বাতাস, এই ভোগ-বিলাস, এই প্রিয়-পরিজন সমস্তই ব্যর্থ করিয়া দিয়া নির্জন বনে একাকী ধ্যান-মগ্ন অবস্থায় মুক্তি-সাধন করা ইসলামের বিধি নয়। বিশ্বের পরতে পরতে আপনাকে জড়াইয়া দিয়া অন্তরে অন্তরে অনন্ত প্রেমরাজ্যে বাসা বাঁধাই ইসলামের অনুমোদিত ধর্ম-পদ্ধতি।

(৫) জন্মান্তরবাদ অস্বীকার করা—

(৬) সাম্য ও বিশ্বপ্রেম স্থাপন করা—ইসলামে কৌলিন্য প্রথা নাই। এখানে সকলেই ভাই ভাই। মানুষ হিসাবে ব্রাহ্মণ-শূদ্র রাজা-প্রজা ধনী-ভিক্ষুক সকলেই সমান।

ইহাই হইতেছে মোটামুটি ভাবে ইসলামের বিশেষত্ব। এখন আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব—রবীন্দ্রনাথের কবিতাতে এই সমস্ত ভাব ও আদর্শ কতোখানি অভিব্যক্ত হইয়াছে। অবশ্য ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমি রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতাই

"A Muslim, according to the Holy Quran, is he who has made his peace with God and man, with the Creator as well as His creatures. Peace with God implies submission to His will Who is the source of all purity and goodness and peace with man implies the doing of good to one's fellowmen."—Muhammad Ali : Preface to his 'Holy Quran'.

নিঃশেষে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। সেরূপ করা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। ইসলামী ভাবসমন্বিত এত কবিতা রবি বাবু লিখিয়াছেন যে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখানো অসম্ভব।

গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালী, গীতপঞ্চাশিকা, শেফালি, কেতকী ও অন্যান্য গানের বই সমস্তই খোদা-প্রেমবিষয়ক গানে ভরপুর। তত্ত্বাণ্বেষী পাঠক রবি বাবুর ঐ সব পুস্তক পড়িলেই এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

সর্বপ্রথমেই গীতাঞ্জলির প্রথম কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে—

আত্ম-সমর্পণ

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধূলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।
নিজেরে করিতে গৌরবদান
নিজেরে কেবলি করি অপমান
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে।
আমারে না যেন করি প্রচার
আমার আপন কাজে
তোমারি ইচ্ছা করহে পূর্ণ
আমার জীবন মাঝে।
যাচি হে তোমার চরম শান্তি
পরাণে তোমার পরম কান্তি
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও
হৃদয়-পদ্ম দলে।"

এই কবিতাটিকে আমি সর্বোচ্চ স্থান দি। 'সূরা ফাতেহার' সহিত ইহার চমৎকার মিল আছে। মাত্র এই একটি কবিতার দ্বারাই কবির

সমস্ত কবিতার প্রকৃতি ও মূলসুর নির্ণয় করা যায়। এই কবিতার ভিতরে ইসলামের প্রায় সব সত্যেরই সমাবেশ হইয়াছে। একমাত্র খোদাতালাকেই সর্বময় প্রভু মনে করিয়া তাঁহার চরণ-তলে মাথা নত করা, নিজের অক্ষমতা নিবেদন করা এবং তাঁহারই সাহায্য প্রার্থনা করা, অহমিকা বিসর্জন দিয়া খোদার ইচ্ছাকেই জয়যুক্ত করা, অন্য কিছু কামনা না করিয়া খোদাতালারই 'চরম শান্তি' ও 'পরম কান্তি' প্রার্থনা করা,—এ সমস্তই খাঁটি ইসলামের কথা। কোরান শরীফে আছে---পরকালে বেহেশ্‌তে শুধু চিরশান্তি বিরাজ করিবে; সকলের মুখেই "শান্তি" "শান্তি" রব উত্থিত হইবে। আর বেহেশ্‌তের দার্শনিক ব্যাখ্যাও হইতেছে—খোদাতালার দিদার লাভ করা। পুণ্যবানেরা সেখানে সর্বদা খোদাতালার দিব্যকান্তি অনুভব করিবে। এই দুইটি কথার সহিত—

"যাচি হে তোমার চরম শান্তি
পরাণে তোমার পরম কান্তি"—

এ কথার কী গভীর সম্বন্ধ!

অন্যত্র কবি বলিতেছেন,—

"ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা
প্রভু তোমার পানে তোমার পানে
তোমার পানে।
যায় যেন মোর সকল গভীর আশা
প্রভু তোমার কানে তোমার কানে
তোমার কানে।"

এখানেও কবি শুধু খোদাতালাকেই একমাত্র লক্ষ্যস্থল মনে করিতেছেন এবং নিজের আশা-আকাঙ্খা, অভাব-অভিযোগ তাঁহারই সকাশে নিবেদন করিতেছেন।

অনিত্য সংসারে সকল ঠেলিয়া একমাত্র খোদাতালাকেই যে কামনা করিতে হয়, সে সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন—

"চাই গো আমি তোমারে চাই
তোমায় আমি চাই

এই কথাটি সদাই মনে
বলতে যেন পাই।
আর যা কিছু বাসনাতে
ঘুরে বেড়াই দিনেরাতে
মিথ্যা সে সব, মিথ্যা ওগো
তোমায় আমি চাই।”

ইসলামের শিক্ষাও তো এই। খোদাতালাকে পাওয়াই সত্যিকার পাওয়া, আর যা কিছু সমস্তই মিথ্যা।

কবি যে পৌত্তলিকতা বা সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেন না, তাহা নিম্নের কবিতা হইতে অতি সুন্দর ভাবে বুঝা যায়—

‘মুগ্ধ ওরে স্বপ্ন ঘোরে
যদি প্রাণের আসন কোণে
ধূলায় গড়া দেবতারে
লুকিয়ে রাখিস সংগোপনে—
চিরদিনের প্রভু তবে
তোদের প্রাণে বিফল হবে
বাহিরে সে দাঁড়িয়ে রবে
কত না যুগ যুগান্তরে।”

এই সমস্ত কবিতাতে রবীন্দ্রনাথ খাঁটি ইসলামী ভাবেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। একমাত্র খোদাতালাকেই তিনি অদ্বিতীয় প্রভু মনে করেন, তাঁহারই চরণে তিনি মাথা নত করেন, তাঁহারই সকাশে সাহায্য প্রার্থনা করেন; তিনি ছাড়া আর কোনো ‘ধূলায় গড়া দেবতারে’ আপন মনে স্থান দেন না।

প্রেম ও শান্তি স্থাপন

এ সম্বন্ধে বিশেষ কোনো কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার কোনো প্রয়োজন নাই। এ প্রবন্ধের প্রায় সব কবিতাই তো গভীর ঐশী প্রেমের পরিচায়ক। প্রেম না থাকিলে আত্ম-সমর্পণ ও মিলন কিসের। রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর সকল কবিতাতেই একটা অতৃপ্ত মিলনের আকাঙ্খা সূচিত হইয়াছে।

কোথায়ও তিনি উদ্ধত ভাবের বা বিদ্রোহের পরিচয় দেন নাই। 'তুমি এসো, আমার হৃদয়-পদ্ম-দলে দাঁড়াও', 'গানের সুরের আসনে বসো,' ঐ যে তুমি 'আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে', 'যেও না সখা হেলায় ঠেলে'— ইত্যাদি ভাবের বিরহ ও বেদনার অভিব্যঞ্জনায় সমস্ত কবিতা ভরপুর। রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকৃতিও মিলন-প্রয়াসী। নিখিল বিশ্বের ছোট বড় সকলকেই তিনি তাঁহার উদার হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন; সকলকেই তিনি ভালোবাসিতে পারিয়াছেন। তিনি বলিতে পারিয়াছেন: "জগত আসে প্রাণে, জগতে যায় প্রাণ, জগত-প্রাণে মিলি গাহিছে এ কী গান।" বাস্তবিকই তিনি "বিশ্ব-জগতের" সহিত এমন ভাবে মিশিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহাকে আলাদা করিয়া দেখিলে তাঁহাকে বুঝা যাইবে না। নিখিল বিশ্বের মর্মে মর্মে যে সহজ সুরের ঝঙ্কার উঠিতেছে, তাহারই মধ্যে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। তিনি যেন বিশ্বপ্রকৃতিরই বেশী আপন, আমাদের ততো নন। কোরান শরীফে আছে—

"আল্লাহ্ মানবমণ্ডলীকে যে নিজের ফিৎরাতের (Nature) উপর সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা দৃঢ় ভাবে অবলম্বন করো। আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে রদ-বদল নাই, ইহাই সরল 'দীন' (ধর্ম)"—[সুরা রুম, ৩০ আয়াত] রবীন্দ্রনাথ সেই 'প্রকৃতির'ই সন্তান। তিনি প্রকৃতিকে বাস্তবিকই দৃঢ় ভাবে অবলম্বন করিয়াছেন।

বিশ্বপ্রকৃতি ও রবীন্দ্রনাথ

কোরান শরীফে আছে—

"নিশ্চয়ই স্বর্গে মর্তে বিশ্বাসীদিগের জন্য অনেক নিদর্শন আছে।" —[সুরা আল-জাসিয়া, ৩ আয়াত] "এবং রাত্রি ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে এবং খোদাতালা লোকের জীবন ধারণের জন্য মেঘ হইতে পৃথিবীতে যাহা প্রেরণ করেন এবং যদ্দ্বারা মৃতকে পুনর্জীবিত করেন, (তাহার মধ্যে) এবং আবহাওয়ার পরিবর্তনের মধ্যে তাহাদের জন্য অনেক নিদর্শন আছে— যাহারা চিন্তা করে।" —[সুরা আল জাসিয়া, ৫ আয়াত] কোরানের এই বাণী রবীন্দ্রনাথের জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। প্রকৃতিকে

তিনি যেভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা গভীর অনুভূতি-প্রসূত। সূর্য-চন্দ্র, আঁধার-আলো, সন্ধ্যা-প্রভাত, ঝঞ্ঝা-বাদল, বর্ষা-বসন্ত প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্য দিয়া তিনি একমাত্র খোদাতালারই অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছেন। দৃশ্য দেখিতে দেখিতে দৃশ্যের আড়ালে লুকানো সেই বিরাট পুরুষের সন্ধান পাইয়া তাঁহার মন উদাস আকুল চঞ্চল হইয়াছে। কবি বলিতেছেন—

"এই যে তোমার প্রেম ওগো
হৃদয়-হরণ।
এই যে পাতায় আলো নাচে
সোনার বরণ।
এই যে মধুর আলস ভরে
মেঘ ভেসে যায় আকাশ পারে
এই যে বাতাস দেহে করে
অমৃত ক্ষরণ,
এই ত তোমার প্রেম ওগো
হৃদয়-হরণ।"

প্রেমিকের উপযুক্ত কথাই বটে। বসন্তে কবি গাহিতেছেন—

"আজি গন্ধ-বিধুর সমীরণে
কার সন্ধানে ফিরি বনে বনে
আমি পুলকিত কার পরশনে॥"

অন্যত্র—

"আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে
মোর পরাণে দখিন বায়ু লাগিছে
কারে দ্বারে দ্বারে কর হানি মাগিছে
এই সৌরভ-বিহ্বল রজনী
কার চরণে ধরণীতল জাগিছে।
ওগো সুন্দর বল্লভ কান্ত
তব গম্ভীর আহবান কারে।"

বর্ষায়—

"হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মত নাচে রে
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচে রে।"

অন্যত্র তিনি বাদল-বরিষণের ভিতর দিয়া খোদাতালাকে কেমন সুন্দর ভাবে আহবান করিতেছেন—

"এস হে এস সজল-ঘন
বাদল-বরিষণে
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে
এস হে এ-জীবনে।"

শরতে—

"শরতে আজ কোন্ অতিথি
এল প্রাণের দ্বারে
আনন্দ গান গা রে হৃদয়
আনন্দ গান গা রে।
যে এসেছে তাহার মুখে
দেখরে চেয়ে গভীর সুখে
দুয়ার খুলে তাহার সাথে
বাহির হয়ে যা রে।"

ঝড়ের রাতে—

"ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার।
আকাশ কাঁদে হতাশ সম
নাই যে ঘুম নয়নে মম
দুয়ার খুলি হে প্রিয়ত[illegible]
চাই যে বারে বার।

প্রাকৃতিক দৃশ্য সকলেই দেখিয়া থাকি, কিন্তু এমন ভাবে কয়জন দেখি! স্বর্গে-মর্ত্যে যে ''অসংখ্য নিদর্শন'' আছে, সে কথা তো মিথ্যা নয়। চোখ থাকিলে সে-সব নিদর্শন যে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অবশ্য ইসলাম **Pantheism** ও **Paganism**-কে সমর্থন করে না।

সুখ-দুঃখ

ইসলাম সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে জীবনে-মরণে খোদাতালারই জয়-গৌরব ঘোষণা করে। কোরান বলিতেছে—

''বলো (হে মোহাম্মদ) নিশ্চয়ই আমার আরাধনা, ত্যাগ, জীবন ও মরণ সমস্তই আল্লার জন্য।''—[সূরা আল-আনাম, ১৬৩ আয়াত] কবি ইহারই সহিত সুর মিলাইয়া বলিতেছেন:—

> ''সুখী হও দুঃখী হও, তাহে চিন্তা নাই
> তোমরা তাঁহারই হও, আশীর্বাদ তাই।''

> ''বাঁচান বাঁচি মারেন মরি
> বল ভাই ধন্য হরি।
> সুধা দিয়ে মাতান যখন
> ধন্য হরি ধন্য হরি
> ব্যথা দিয়ে কাঁদান যখন
> ধন্য হরি ধন্য হরি।''

এই সমস্ত কবিতাতে কবি এই কথাই বলিতেছেন যে, সুখে-দুঃখে জীবনে-মরণে খোদাতালাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। সাফল্য বা বিজয়-গৌরবের মধ্যেও যে খোদাতালারই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিতে হয় আর সকল জয়-গৌরব যে তাঁহারই চরণে নিবেদন করিয়া দিতে হয়, সে কথা কবি তাঁহার 'নোবেল প্রাইজ' প্রাপ্তি উপলক্ষে রচিত কবিতায় অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

> ''কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে
> আজ ফাগুন দিনের সকালে।

তার বর্ণে তোমার নামের রেখা
গন্ধে তোমার ছন্দ লেখা
লুকিয়ে তুমি ঐ গানেরি আড়ালে
আজ ফাগুন দিনের সকালে।"

অন্যত্র এই সম্বন্ধেই বলিতেছেন—

"এই মণিহার আমার নাহি সাজে,
এরে পরেতে গেলে লাগে, এরে
ছিঁড়তে গেলে বাজে।
তাই ত বসে আছি
এ হার তোমায় পরাই যদি
তবেই আমি বাঁচি।"

মুসলমানগণ দৈনন্দিন জীবনে প্রতি কাজে বলেঃ 'শোকর আল্‌হামদুলিল্লাহ্!' ইহাও তাই। দুঃখ-দৈন্যকে কবি ঠিক ইসলাম অনুযায়ীই গ্রহণ করিয়াছেন। দুঃখ-দৈন্য পূর্বজন্মের কর্মফল এমন কথা তিনি কোথাও প্রকাশ করেন নাই। জীবনের সার্থকতার জন্য যে দুঃখ-দৈন্যেরও প্রয়োজন আছে, দুঃখ যে খোদাতালার বিশেষ অনুগ্রহেরই রূপান্তর, সুখ-সম্পদ ছাড়া জীবনের যে মহত্তর লক্ষ্য আছে, এই কথা মনে করিয়াই কবি সগৌরবে দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছেন। এ সম্বন্ধে কোরান বলিতেছেঃ—

"হে বিশ্বাসিগণ। ধৈর্য এবং প্রার্থনার ভিতর দিয়া সাহায্য প্রার্থনা করো; নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদিগের সহিত।"—[সূরা বকরা, ১৫৩ আয়াত।] "এবং নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে ভয়, সম্পদ-হানি, জীবন-হানি, ফল-হানি বা ঐরূপ কিছু দিয়া পরীক্ষা করিব; এবং যাহারা ধৈর্যশীল তাহাদিগের নিকট সুসংবাদ প্রেরণ করিব (অর্থাৎ ধৈর্যের পুরস্কার দিব)"—[সূরা বকরা, ১৫৫ আয়াত।] "তাহাদেরই উপরে (অর্থাৎ উক্ত ধৈর্যশীলদিগের উপরে) তাহাদের প্রভুর দিক হইতে আশীর্বাদ এবং করুণা (বর্ষিত হইবে)"—
—[ঐ ১৫৭ আয়াত।]

কবি বলিতেছেন—

"আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই
বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর
জীবন ভরে।
এ যে তব দয়া জানি জানি হায়
নিতে চাও বলে ফিরাও আমায়
পূর্ণ করিয়া লবে এ জীবন
তব মিলনেরি যোগ্য করে।"

... ...

"দুঃখ যদি না পাবে ত
দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে।"

... ...

"পুষ্প দিয়ে মারো যারে
চিনল না সে মরণকে
বাণ খেয়ে যে পড়ে সে যে
ধরে তোমার চরণকে।"

... ...

"লাগে না গো কেবল যেন
কোমল করুণা,
মৃদু সুরের খেলায় এ প্রাণ
ব্যর্থ করো না।"

... ...

"দুঃখ-রথের তুমিই রথী
তুমিই আমার বন্ধু
তুমি সঙ্কট, তুমিই ক্ষতি
তুমি আমার আনন্দ।"

"এই করেছ ভাল নিঠুর
এই করেছ ভাল
এমনি করে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বাল।

আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছুই আলো।

যখন থাকে অচেতনে
এ চিত্ত আমার
*আঘাত সে যে পরশ তব
সেইত পুরস্কার।"*

"দুঃখের বরষায় চোক্ষের জল যেই নামল
বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামল।"

ইহাই রবীন্দ্রনাথের দুঃখ-দৈন্যের দার্শনিক ব্যাখ্যা। সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে, সকল অবস্থাতেই তিনি খোদাতালাকে বন্ধু বলিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়াছেন। লক্ষ্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি স্থির-নিবদ্ধ, কোনো অবস্থাতেই তিনি সেই লক্ষ্যপথ হইতে স্খলিত হন নাই। মুসলমানগণও দুঃখের দিনে বলিয়া থাকে—"আমরা আল্লার নিকট হইতে আসিয়াছি এবং আল্লাই আমাদের লক্ষ্য।"—[সুরা বকরা, ১৫৬ আয়াত]

বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস

রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্য বা সন্ন্যাসবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। গম্ভীরভাবে তিনি ঘোষণা করিতেছেন—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার।
যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।"

ইহাই তো ইসলাম। অসংখ্য বন্ধন মাঝে মুক্তি লাভ করাই তো প্রকৃত পৌরুষের কাজ। কোরান বলিতেছে---"এবং যে সন্ন্যাসব্রত (খৃষ্টানগণ) সৃষ্টি করিয়াছে তৎসম্পর্কে আমি তাহাদিগকে কিছুই বলি নাই। পৃথিবীতে তোমাদের জন্য যে (ভোগের) স্বত্ব নির্ধারিত আছে, তাহা বিস্মৃত হইও না।"

"হে মুসলমানগণ! খোদাতালা তোমাদের জন্য যে সমস্ত জিনিস বৈধ করিয়াছেন, তাহা অবৈধ করিও না।" হযরত মোহাম্মদের জীবনের গতিও এই পথেই চলিয়াছে। সংসারের সমস্ত বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া তিনি আধ্যাত্ম জগতে বিহার করিতেন।

সাম্য ও বিশ্বপ্রেম

সাম্য ও বিশ্বপ্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠিক ...র উক্তিরই প্রতিধ্বনি তুলিয়াছেন---

"যুক্ত করহে সবার সঙ্গে
মুক্ত করহে বন্ধ
সঞ্চার কর সকল কর্মে
শান্ত তোমার ছন্দ।"---

"এস হে আর্য এস অনার্য
হিন্দু মুসলমান।
এস এস আজ তুমি ইংরাজ
এস এস খৃষ্টান।
এস ব্রাহ্মণ, শুচি কর মন
ধর হাত সবাকার

এস হে পতিত, হোক অপনীত
সব অপমান ভার।"

কোরান বলিতেছে—

"সমস্ত মানবমণ্ডলী এক জাতি"—[সুরা বকরা, ২১৩ আয়াত]। "হে মানব, নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে এক পুরুষ ও এক নারী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমাদিগকে বংশ ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়াছি, যাহাতে তোমরা পরস্পরকে চিনিতে পারো।"—[সুরা আল্-হুজুরাত, ১৩ আয়াত।]

অন্যত্র কবি মানুষ হইয়া মানুষকে ঘৃণা করার জন্য তাঁর দেশবাসীকে তিরস্কার করিতেছেন:

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদেরে করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

তের শত বৎসর পূর্বে ইসলাম যে সত্য গম্ভীরভাবে ঘোষণা করিয়াছে, আজ তাহা নূতন করিয়া রবীন্দ্রনাথের মুখে ধ্বনিত হইতেছে।

উপসংহার

এইরূপে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গীতি-কবিতাতেই ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও আদর্শ ব্যক্ত হইয়াছে। অশরীরী ভাবও (spirit of abstraction) তাঁহার কাব্যের আর একটি বিশেষত্ব। পারস্যের সুফী কবি হাফিজের সুর বাঙালী কবিদের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রকাব্যেই শুনিতে পাওয়া যায়।

বস্তুত, রবীন্দ্রকাব্যে ইসলামের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথকে লইয়া এইখানে মুসলমানদের গর্ব করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা
১৯২২

আর্টের স্বরূপ

আধুনিক সাহিত্যে 'আর্টের' আলোচনা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। গল্পে, উপন্যাসে, কাব্যে, কবিতায়, চিত্রে, নাটকে, সঙ্গীতে—আর্ট এমন ভাবেই প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিয়াছে যে, তাহাকে এড়াইয়া ঐ সব বিষয়ে কোনো কথা বলা আজকাল একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। সাহিত্যের বাজারে যাঁহারা বিকিকিনি করেন, তাঁহারাও এ-সম্বন্ধে খুবই সজাগ। তাই দেখিতে পাই, কোনো একখানি উপন্যাস বা কাব্য প্রকাশিত হইলে সেখানি আর্টের দিক দিয়া সার্থক হইল, কিংবা 'একেবারে মাটি হইয়া গেল,' মাসিক সাহিত্যের সমালোচক সে কথা উল্লেখ করিতে ভুলেন না। কেননা এ কথা তাঁহার বেশ ভালো রকমই জানা আছে যে, ঐ শ্রেণীর কোনো পুস্তক-সমালোচনায় আর্টের উল্লেখ না করিলে সমালোচনা বা সমালোচকের মূল্য বাড়ে না। যে কোনো একখানা উপন্যাস বাহির হইলেই তাহার বিজ্ঞাপনে লেখা হইয়া থাকে—"আর্টে ও মনস্তত্ত্বে অনুপম", "ফরাসী আর্টের নিপুণ নিদর্শন" ইত্যাদি ইত্যাদি। আর্ট লইয়া তর্ক-বিতর্কও নিতান্ত কম হয় না। কেহ বলেন—"Art for art's sake", কেহ বলেন—"আর্ট ধর্মনীতি বা সভ্যতার কোনো তোয়াক্কা রাখে না।" কেহবা বলেন "গুরু মহাশয়-গীরি করা আর্টের কাজ নয়,"—এইরূপ ধরনের অনেক কথাই শুনা যায়।

বস্তুতঃ আর্ট সম্বন্ধে অনেকের ধারণাই পরিচ্ছন্ন নয়। বর্তমান প্রবন্ধে আমি তাই আর্ট সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

আর্ট কী?

এই প্রশ্নের উত্তর আর্ট-প্রেমিকগণ যতো সহজ মনে করিয়া বসিয়া আছেন, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ততো সহজ নয়। আর্টবাদী হয়তো এক কথায় ইহার উত্তর দিবেন---'সৌন্দর্য-সৃষ্টিই আর্ট।' কিন্তু এ উত্তরে মোটেই সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। আর্ট যদি সৌন্দর্য-সৃষ্টিই হয়, তবে সৌন্দর্য জিনিসটা কি? সেটা তো আমাকে আগে বুঝিতে হইবে। কাজেই আর্ট কি, এই প্রশ্নের পূর্বে সৌন্দর্য কি, ইহাই সর্বাগ্রে আমাদিগকে মীমাংসা করিতে হইবে।

সৌন্দর্য কি?

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। কতকগুলি মৌলিক বিষয় আছে, যাহাদের কোনো সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া চলে না। গন্ধ কি, আস্বাদ কি, এসব প্রশ্নের কোন সংজ্ঞা নাই। তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বর্ণনা দ্বারা এই সব বিষয়ের একটা মোটামুটি ধারণা দেওয়া যাইতে পারে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই সৌন্দর্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে এবং এই কারণেই আর্টের সংজ্ঞাও বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

প্রাচীনকালে সৌন্দর্য সম্বন্ধে কাহারও কোনো সঠিক ধারণা ছিল না বা এ সম্বন্ধে কোনো দার্শনিক কোনো গবেষণাও করেন নাই। গ্রীস দেশের পণ্ডিত সক্রেটিস, প্লেটো, এরিষ্টটল প্রভৃতির মতে, 'যাহাই কার্যকরী তাহাই সুন্দর।' অর্থাৎ তাঁহারা সৌন্দর্যকে মঙ্গল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন নাই। কথিত আছে, সক্রেটিসের নাসা-রন্ধ্র ও মুখ-গহ্বর অতিমাত্রায় প্রশস্ত ও কদাকার হইলেও তিনি উহাদিগকেই অপেক্ষাকৃত সুন্দর বলিতেন, কেননা, বাতাস ও খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের পক্ষে উহারাই অধিকতর কার্যকরী ছিল। সৌন্দর্য সম্বন্ধে প্রাচীন কালের প্রায় সকল দার্শনিক ও পণ্ডিতই এই মত পোষণ করিতেন। শুধু প্রাচীন যুগ কেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মতভাবে কেহই কোনো আলোচনা বা গবেষণা করেন নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (১৭১৪-১৭৬২) জার্মানীতে বমগার্টেন (Baumgarten) নামক জনৈক খ্যাতনামা দার্শনিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে সুশৃঙ্খলার সহিত আলোচনা আরম্ভ করেন। আধুনিক সৌন্দর্য-

বিজ্ঞানের (Aesthetics) তিনিই একরূপ জন্মদাতা। তাঁহার মতে সৌন্দর্য অনুভূতির বিষয়ীভূত। চিন্তা (thinking) দ্বারা সত্য, ইচ্ছা (will) দ্বারা মঙ্গল এবং অনুভূতি (feeling) দ্বারা সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করা যায়। সত্য, মঙ্গল এবং সুন্দরের মূলাধার হইতেছে—সেই একমাত্র খোদাতালা। চিন্তার ভিতর দিয়া, নৈতিক ইচ্ছার ভিতর দিয়া এবং সৌন্দর্যানুভূতির ভিতর দিয়া—তিন উপায়েই তাঁহাকে লাভ করা যায়। সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া তিনি বলেন, "অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরস্পরের মধ্যে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সমগ্রের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানই সৌন্দর্য। (A correspondence of the parts in their mutual relation to each other and in their relation to the whole.) সৌন্দর্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বলেন—আনন্দ-দান এবং অন্তরে কোনো একটা কামনার উদ্রেক করাই সৌন্দর্যের উদ্দেশ্য। আর্ট সম্বন্ধে তাঁহার মত—'সৌন্দর্য সৃষ্টি করাই আর্টের প্রধান লক্ষ্য, তবে প্রকৃতির ভিতর হইতেই আর্টের উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে, কেননা সেই চরম ও পরম অশরীরী সৌন্দর্য (Absolute Beauty) প্রকৃতির ভিতর দিয়াই সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

অতএব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, বমগার্টেনের মতে সৌন্দর্যের একটা অন্যনিরপেক্ষ মৌলিক রূপ (Absolute Beauty) আছে ; সৌন্দর্যের সহিত আনন্দ ও আকাঙ্খার সম্বন্ধ আছে এবং সৌন্দর্যই আর্টের প্রাণ।

বমগার্টেনের অব্যবহিত পরেই সুল্‌জার, মেণ্ডেল্‌সোহন, মরিজ প্রভৃতি লেখকবৃন্দ আর এক নূতন মত প্রচার করেন। তাঁহারা বলেন—আর্টের লক্ষ্য সৌন্দর্য নয়, মঙ্গল। নৈতিক সুসম্পন্নতাই (moral perfection) আর্টের উদ্দেশ্য।

কিন্তু পরবর্তী কালে উইলকেনম্যান উপরোক্ত উক্তির বিরুদ্ধে এই মত প্রচার করেন যে, শুধু সৌন্দর্যই আর্টের লক্ষ্য ; তাহার সহিত মঙ্গল ভাবের কোনোই সম্বন্ধ নাই। লেসিং, হার্ডার, গ্যেটে প্রভৃতি অনেকেই এই মত পোষণ করেন। অবশেষে খ্যাতনামা দার্শনিক ক্যান্ট (Cant) সৌন্দর্য ও আর্ট সম্বন্ধে আর এক নূতন কথা বলেন। তাঁহার মত এইরূপ—মানুষ যে নিজে প্রকৃতির মধ্যে রহিয়াছে এবং তাহার বাহিরেও যে প্রকৃতি রহিয়াছে

এ জ্ঞান তাহার আছে। বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে সে সত্যের সন্ধান করে এবং নিজের মধ্যে সে মঙ্গলের সন্ধান করে। চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তির দ্বারা এই দুই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। কিন্তু চিন্তা ও ইচ্ছা ছাড়া মানুষের আরও একটি অনুভূতি আছে—যাহা চিন্তা বা ইচ্ছার কোনোই ধার ধারে না। সে হইতেছে সৌন্দর্যানুভূতি। কাজেই ক্যান্টের মতে চিন্তা বা ইচ্ছার উদ্রেক না করিয়া এবং মঙ্গলামঙ্গলের সঙ্গে কোনোই সম্বন্ধ না রাখিয়া যাহাই আনন্দ দান করে, তাহাই সৌন্দর্য। অন্য কথায়, সৌন্দর্য তাহাকেই বলা হইবে, যাহা দেখিলে আনন্দ পাওয়া যাইবে বটে, কিন্তু লাভ-লোকসানের কোনোই কথা উঠিবে না। আর্টের ধারণাও তাঁহার এইরূপ। তাঁহার মতে আনন্দ দানই আর্টের উদ্দেশ্য।

—

ক্যান্টের পরবর্তী লেখকগণের মধ্যে হেগেলের (Hegel) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সৌন্দর্যকে তিনি আর একভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন—খোদাতালা দুই উপায়ে আত্মপ্রকাশ করেন, (১) ভাবরূপে (subjectively) এবং (২) বস্তুরূপে (objectively)। বস্তুর ভিতর দিয়া সেই ভাবময়ের উজ্জ্বল বিকাশই সৌন্দর্য। আত্মাই প্রকৃতপক্ষে সুন্দর ; বাহিরের এই সৌন্দর্য সেই আত্মার সৌন্দর্যেরই বহির্বিকাশ। হেগেলের মতে সত্য এবং সুন্দর একই বস্তু। তফাৎ এই—সত্য হইতেছে সেই ভাবময়ের আসল বস্তুবিহীন রূপটি (Idea)—যাহা শুধুই চিন্তা ও ধারণার বিষয়; আর সৌন্দর্য হইতেছে সেই সত্যেরই বাস্তব বিকাশ। সত্য যখন বাহিরে রূপ পরিগ্রহ করে, তখন ইহা শুধু সত্য নয়, সুন্দর হইয়াও দেখা দেয়।

'শিলার' নামক আর একজন খ্যাতনামা দার্শনিক বলেন—'সসীমের মধ্যে অসীমের অনুভূতিই হইতেছে সৌন্দর্য এবং হৃদয়ে এই অনুভূতির উদ্রেক করাই আর্টের কার্য।

এইরূপভাবে ফিক্‌টে, হারবার্ট, ডারউইন প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা দার্শনিক সৌন্দর্য ও আর্ট সম্বন্ধে নানাভাবে নিজেদের মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছে। কিন্তু কেহই কোনো সর্ববাদী সম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারেন নাই।

উপরোক্ত মতবাদগুলিকে মোটামুটিভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—

(১) সৌন্দর্যের একটা স্বাধীন অশরীরী সত্তা (Absolute Being) আছে ;
(২) সৌন্দর্য বলিয়া আসলে কিছুই নাই, যাহাই আনন্দ দান করে, তাহাই সৌন্দর্য।

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত মতদ্বয়ের কোনোটাই সন্তোষজনক নহে। প্রথমটি শুনিতে খুব গুরুগম্ভীর হইলেও উহা নিতান্তই হেঁয়ালীপূর্ণ, দুর্বোধ্য এবং ধারণাতীত। উহার দ্বারা সৌন্দর্য সম্বন্ধে মনের মধ্যে কোনো ধারণাই জমাট বাঁধিয়া উঠে না। দ্বিতীয়টি সহজবোধ্য হইলেও নিতান্তই ভ্রমপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। কেননা, যাহাই আনন্দ দান করে, তাহাই যদি সৌন্দর্য হয়, তবে সৌন্দর্যের কোনোই আদর্শ (standard) থাকে না। একই বস্তু একজনের নিকট সুন্দর এবং অন্য জনের নিকট অসুন্দর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কারণ সৌন্দর্যানুভূতি সকলের সমান নহে। ঠিক একই কারণে এহেন অনিশ্চিত ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান আর্টেরও কোনো স্থিরতা থাকে না ; আর্টের নামে স্বেচ্ছাচার আরম্ভ হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে, আর্টকে সৌন্দর্যের ভিত্তির উপর দাঁড় করাইয়া ব্যাখ্যা করিতে গেলে প্রকৃতপক্ষে কোনো ব্যাখ্যাই করা হয় না ; উহা এক হেঁয়ালী হইতে আর এক হেঁয়ালীতে লইয়া যায় মাত্র।

আর্ট তবে কী? আমার মতে টলষ্টয় যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাই ঠিক। তিনি বলেন, আর্টকে সম্যকরূপে বুঝিতে হইলে সর্বপ্রথম কর্তব্য এই হইবে যে, আনন্দকে বাহিরে রাখিয়া আর্টকে দেখিতে হইবে। অর্থাৎ সৌন্দর্য ও আনন্দের সহিত আর্টকে যোগ-সম্বন্ধ ভাবে দেখিতে হইবে না। আর্ট মানব জীবনেরই একটি ক্রিয়া বা অবস্থা ; মানুষের মনোভাবের পরস্পর আদান প্রদানেরই ইহা অন্যতম উপায় স্বরূপ। বাক্‌শক্তি যেমন মানুষের চিন্তা ও অভিজ্ঞতার বিষয় অপর সকলের নিকট পৌঁছাইয়া দেয় এবং পরস্পরের মধ্যে একটা যোগস্থাপনা করে, আর্টও তদ্রূপ মানুষের অন্তরের অব্যক্ত অনুভূতিকে অপর হৃদয়ে পৌঁছাইয়া দেয়। মানুষ যাহা চিন্তা করে বা দেখে তাহা কথার দ্বারা অনায়াসে সে অপরের নিকট ব্যক্ত করিতে পারে ; কিন্তু অন্তরের অন্তস্থলে সে যাহা অনুভব করে তাহা সাধারণ কথার দ্বারা সম্যক প্রকাশ পায় না; সেইখানে আর্টের প্রয়োজন হয়। সুতরাং আর্টকে অনুভূতির ভাষা বলা যাইতে পারে।

নিজ অন্তরে যাহা অনুভব করা যায় অপর হৃদয়ে তাহাই অবিকল পৌঁছাইয়া দিবার কলা-কৌশলই আর্ট। টলষ্টয় বলেন :—

"Art is a human activity, consisting in this, that one man consciously, by means of certain external signs, hands on to others, feelings he has lived through and that others are infected by these feelings and also experience them."

অর্থাৎ আর্ট একটি মানবীয় ক্রিয়া যদ্দ্বারা কোনো মানুষ সজ্ঞানে কতিপয় প্রক্রিয়া দ্বারা নিজের মনের অনুভূত কোনো ভাবকে এমনভাবে অপরের মনে পৌঁছাইয়া দেয় যে, অপরেব মন সেই ভাবে সংক্রমিত হইয়া নিজেই উহা উপলব্ধি করিতে পারে।

কতিপয় দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক :—

একটি অনাথিনী বিধবা তাহার একমাত্র পুত্রের মৃত্যুশোকে নিশীথ রাত্রে করুণ কণ্ঠে এমন ভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার মনের ব্যথা বাহিরে ব্যক্ত করিতেছে যে, শ্রোতার মনেও সেই বেদনা সঞ্চারিত হইয়া গেল। এই খানে বলা যাইতে পারে যে, সেই ক্রন্দনেরভিতরে আর্ট আছে। স্বদেশ-স্বজাতির লাঞ্ছনা ও দুর্দশায় ব্যথিত হইয়া কোনো দেশনেতা স্বদেশবাসীর সম্মুখে এমনভাবে বক্তৃতা দান করিলেন যে, বক্তার মনের ব্যথা ও ভাব শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়েও ছড়াইয়া গেল এবং সকলেই বক্তার সহিত একমত হইয়া দেশের কার্যে আত্মনিয়োগ করিল। এখানেও আর্ট ক্রিয়া করিল। কোনো লোক জঙ্গলের মধ্যে বাঘের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া আসিয়া তাহার বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট এমন ভাবে উহার বর্ণনা দিল যে, সকলেই যেন সেই ভাব ও অবস্থা আপন প্রাণের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিল এবং চক্ষুর সম্মুখে যেন সেই দৃশ্যাবলী দেখিতে লাগিল। এখানেও বর্ণনাকারীর বর্ণনায় যথেষ্ট আর্ট প্রকাশ পাইল। কোনো ঔপন্যাসিক, কবি বা চিত্রশিল্পী কোনো একটি বিষয় আপন প্রাণে উপলব্ধি করিয়া, অথবা কোনো একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া উপন্যাসে কবিতায় বা চিত্রে তাহা এমন ভাবে ফুটাইয়া তুলিল যে, পাঠক বা দর্শক সকলেই সেই ভাবের ভাবুক হইয়া পড়িল।

এখানে তাহাদের সৃষ্টিতে আর্ট আসিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে আরব্যোপন্যাসের কথা। কাহিনীগুলি আর্টে পরিপূর্ণ, কারণ ঐ সমস্ত গল্প পড়িতে পড়িতে পাঠক একেবারে তন্ময় হইয়া যায়,---লেখকের প্রাণে যে ভাবরাশি খেলা করিয়াছে, পাঠকও ঠিক সেই ভাবরাশি আপন প্রাণে অনুভব করিতে পারে।

অতএব দেখা যাইতেছে, অনুভূতির আন্তরিকতা এবং সংক্রামকতাই আর্টের প্রধান লক্ষণ। সে অনুভূতি সুখের হউক, দুঃখের হউক, সৌন্দর্যের হউক, কুৎসিতের হউক, আনন্দের হউক, বেদনার হউক---তাহাতে কিছু যায় আসে না। অনুভূতিবিহীন রং-চং সাজ-সজ্জা, শব্দালঙ্কার বা অভিনয় আর্ট নহে ---তা সে যতই সুন্দর হউক না কেন। প্রকৃত আর্ট-সৃষ্টির মূলে সত্যানুভূতি (Sincerity of feeling) থাকা চাই, আর তার প্রকাশ-ভঙ্গী বা বহিঃসৌষ্ঠব (technique) এরূপ হওয়া চাই যেন তাহার ভিতর দিয়া আর্টিষ্টের মনের আসল ভাবটি অপর হৃদয়ে সংক্রমিত হইয়া পড়ে। যে আর্টিষ্টের অনুভূতি যতো গভীর হইবে এবং প্রকাশভঙ্গী যতো সহজ ও সুন্দর হইবে, তাহার আর্টও ততো পরিমাণে সার্থক ও সুন্দর হইবে।

এ স্থলে বলিয়া রাখা ভালো, কোনো লোক হাসিতে হাসিতে অপর সকলকে হাসাইলে বা হাই তুলিয়া অপরকেও হাই তুলিতে বাধ্য করিলে, তাহা আর্ট হইবে না। ব্যাঘ্র-কবলে পতিত কোনো লোকের ভীতিসঙ্কুল মুখাকৃতি বা প্রাণভয়ে পলায়ন ও ভয়ার্ত চীৎকার আর্ট নহে। ফটোগ্রাফিও আর্ট নহে। আর্ট কতকটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড জিনিস। আগে কিছু প্রাণ দিয়া অনুভব করা চাই, পরে তাহাই বিশ্বস্ত ভাবে প্রকাশ করা চাই, তবেই সেখানে আর্ট ফুটিবে। কোকিলের কুহু কুহু ডাকটিই আর্ট নহে; কিন্তু যদি কোনো ছেলে মেয়ে অবিকল কোকিলের মতো করিয়া ডাকিতে পারে, তবেই সেখানে আর্ট আসিল। আর্ট স্বভাব নহে,---স্বভাবের অনুকরণ (a representation, ond not a reality.)

উপরে যাহা বলা হইল, উহাই আর্ট সম্বন্ধে টলষ্টয়ের অভিমত এবং আমার বিশ্বাস, এই মতই ঠিক। বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আর্ট-সমালোচক বিখ্যাত ইটালীয়ান দার্শনিক বেনেডেটো ক্রোস (B. Croce)---যিনি সৌন্দর্য

বিজ্ঞানকে এক স্বতন্ত্র ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন,—তিনিও আর্টের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাও টলষ্টয়ের সংজ্ঞার সহিত অবিকল মিলিয়া যায়। ক্রোস বলেন—"Art is expression of impression". অর্থাৎ অনুভূতির প্রকাশই আর্ট। টলষ্টয়ও তো এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন।

এ পর্যন্ত যাহা বলা হইল, আশা করি আর্টকে চিনিবার পক্ষে উহাই যথেষ্ট। কিন্তু আর্টকে আরও ব্যাপকতর ভাবে বুঝিতে হইলে আর্টের সহিত সত্য, মঙ্গল ও সুন্দরের কি সম্বন্ধ, তাহাও আমাদিগকে জানিতে হইবে।

আর্ট ও সত্য

উপরে বলা হইয়াছে যে, স্বভাব বা সত্যের অনুকরণই হইতেছে আর্ট। সুতরাং সত্যই হইতেছে আর্টের প্রাণ। সত্য ছাড়া আর্ট বাঁচিতেই পারে না। আর্টিষ্টের সৃষ্টি বাস্তবতার কতো কাছাকাছি, তাহাই দেখিয়া তাহার সফলতার বিচার করিতে হইবে। দৃশ্যচিত্রে বা অভিনয়ে অস্বাভাবিকতা আসিলেই তাহা একেবারে ব্যর্থ হইয়া যায়। ধরুন রঙ্গমঞ্চে সীতা অভিনীত হইতেছে। সীতা যদি হাল ফ্যাশানের বেশভূষা করিয়া আসিয়া দাঁড়ায়, রাম যদি হ্যাট-কোট পরিয়া সিংহাসনে উপবেশন করে, শিল্পী যদি ইডেন গার্ডেনের এক কুঞ্জবনের অনুকরণে বাল্মিকীর তপোবন অঙ্কিত করিয়া দেখায়, এবং অভিনয়ে যেখানকার যে ভাবটি সম্যকরূপে ফুটিয়া না উঠে, তবে সে অভিনয় দেখিয়া কি কেহ মুগ্ধ হইতে পারে? কখনোই না। অভিনয় তখন একটি প্রহসনে পরিণত হয় মাত্র।

অতএব দেখা যাইতেছে, অস্বাভাবিকতাই আর্টের মৃত্যুর কারণ। আর্টিষ্ট যাহাই অঙ্কিত করিতে চাহেন না কেন, প্রকৃতির ভিতরে থাকিয়াই তাহা করিতে হইবে। অস্বাভাবিক বা অতিপ্রাকৃতিক কোনো কিছুই তিনি অঙ্কিত করিতে পারেন না, করিলে তাহা আর্ট হিসাবে ব্যর্থ হইয়া যায়। গ্রীষ্মকালের একটি চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে প্রকৃতির গুমট ভাব, গরমের জ্বালায় মানুষের অস্থিরতা; গায়ের কাপড় ফেলিয়া দিয়া বা শিথিল করিয়া পাখা দিয়া বাতাস খাওয়া ইত্যাদি ভাবই ফুটাইয়া তুলিতে হইবে; কারণ ইহাই সত্য বা স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিকতা যতো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জীবন্ত করিয়া

ফুটাইয়া তুলা যাইবে, আর্টিষ্টের সৃষ্টি ততোই সুন্দর বলিয়া বিবেচিত হইবে। গল্পে উপন্যাসে কাব্যে সর্বত্রই এই একই নিয়ম। স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া কোনো আর্টিষ্টই চলিতে পারে না।

সত্য বা স্বাভাবিকতাই যখন আর্টের প্রাণ এবং এই সত্যের মূলে যখন সকল সত্যের মূলাধার সেই খোদাতালা, তখন এ কথা অনায়াসেই বলা যাইতে পাবে যে, সকল আর্টের মূলই হইতেছে সেই সত্যময় খোদাতালা। তিনিই আর্টের কেন্দ্রস্বরূপ; তাঁহাকে ঘিরিয়াই সমস্ত আর্ট প্রকাশ পায়।

এইখানে একটা সমস্যা উঠিতে পারে। স্বাভাবিকত্ব রক্ষা করাই যদি আর্টের প্রধান লক্ষ্য হয়, তবে অনেক অশ্লীল বা কুৎসিত ভাবের চিত্রকেও আর্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, কারণ সেগুলিও স্বভাবতঃ সত্য। কুৎসিতের মধ্যেও যে আর্ট আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু আর্ট হইলেই তো হয় না। প্রত্যেক জিনিসেরই ভালো-মন্দ তো আছে। আর্টের ভিতরেও এই শ্রেণীর আর্ট নিতান্ত জঘন্য আর্ট, ইহাদিগকে বর্জন করিয়া চলা সর্বতোভাবে আমাদের কর্তব্য। 'বাতাস আমাদের জীবন ধারণের উপায়'—এ কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেও আমরা যেমন প্রাণনাশক দূষিত বাতাসকে বর্জন করিয়া অক্সিজেনপূর্ণ বিশুদ্ধ বাতাসেরই সন্ধান করি, আর্টের বেলায়ও অবিকল এইরূপ। আর্টে সত্য ও স্বাভাবিতা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে বলিয়া যে নির্বিচারে যে-সে সত্য ঘটনাকেই আর্ট-সৃষ্টির উপাদান বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এমন কোনো কথা নাই। বাস্তবতাকে এই অর্থে গ্রহণ করিলে ভুল করা হইবে। এই শ্রেণীর আর্টকে নিছক (realistic art) বা প্রত্যক্ষ-দ্যোতক আর্ট বলে। যাহাই প্রকৃতিতে আছে, নির্বিচারে তাহাই অঙ্কিত করিয়া লোক-চক্ষুর সম্মুখে ধরা এই আর্টের কর্ম। বর্তমানে এই শ্রেণীর আর্টবাদীর সংখ্যাই বেশী। তাহারা জীবনের আস্তাকুঁড়ে হইতে কুৎসিৎ পচা জিনিস তুলিয়া আনিয়া realistic art এর নামে চালাইতে চান। গল্পে উপন্যাসে কাব্যে ও চিত্রে এই মনোভাব অধিকাংশ লেখকদিগের মধ্যে দেখা যাইতেছে। তাঁহারা সত্য বা স্বাভাবিকতাকে অনুকরণ করিতে চান করুন, ইহা খুব ভালো কথা। কিন্তু তাঁহারা যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে-ছেন, তাহা সত্য সত্যই সত্য কিনা, সেটুকু তো চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে।

নিত্য যাহা চোখের সাম্‌নে ঘটিতে দেখিতেছি, অনেক সময় তাহা সত্য হয় না। বাস্তবতার মধ্যেও যে মিথ্যা লুকাইয়া আছে, এ সত্য তাহাদিগকে বুঝিতে হইবে। টলষ্টয় ঠিকই বলিয়াছেন :

"Truth will be known not by him who knows only what has been, is and really happens, but by him who recognises what should be according to the will of God".

অর্থাৎ যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, ঘটিতেছে বা ঘটে, তাহাই যে সত্য বলিয়া জানে, সে প্রকৃত সত্যকে চিনে নাই। খোদাতালার ইচ্ছা অনুসারে কি ঘটা উচিত তাহাই যে উপলব্ধি করিতে পারে, সে-ই সত্যকে চিনিয়াছে।

আর্টিষ্টের সত্য-সাধনা এইরূপই হওয়া উচিত। অন্ধ realist না হইয়া তাহাকে idealist বা আদর্শবাদীও হইতে হইবে। কোনো লম্পট-প্রকৃতির ধনী যুবক সমাজ-শাসন ও নীতিধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়া বিলাসব্যাসনে মহা-সুখে কালাতিপাত করিতেছে দেখিয়া যদি কেহ মনে করেন যে, সে প্রকৃতই সুখী, তবে তিনি ভুল করিবেন। প্রকৃত সুখী সে নয়, কেননা খোদাতালার বিধানে ঐরূপ জীবনের মধ্যে সুখ নিহিত নাই। পক্ষান্তরে "হিতোপদেশ" বা "ঈশপের গল্প" সমূহ সত্য না হইলেও সত্য, কেননা খোদাতালার ইঙ্গিত যে কোন্‌দিকে, তাহা ঐ সব গল্পে পরিষ্কারভাবে দেখানো হইয়াছে।

অতএব স্বাভাবিকতার খাতিরে অতিস্বাভাবিকতা ভালো নয়। স্বাভাবিক সত্যের সহিত আদর্শ সত্যের যোগ থাকা চাই, নতুবা কোনো শিল্পীর আর্টই সার্থক হইবে না। স্বাভাবিক সত্যের মধ্যে যাহা অসত্য, তাহা বর্জন করিতে হইবে এবং অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা স্থান বিশেষে আদর্শ সত্যেরও সৃষ্টি করিতে হইবে।

আর্ট ও সৌন্দর্য

টলষ্টয় আর্টের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং আমরাও যাহা সমর্থন করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে হয়তো অনেকে মনে করিতে পারেন, আর্টের সহিত সৌন্দর্যের বুঝি কোনোই সম্বন্ধ নাই। এ ধারণা ভুল। সৌন্দর্যের সহিত যে আর্টের কোনোই সম্বন্ধ থাকিবেনা, টলষ্টয় এমন ব[illegible]লেন নাই।

সৌন্দর্য ও আনন্দ হইতে আর্টকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তিনি উহার সঠিক স্বরূপ দেখাইয়াছেন মাত্র। পূর্বে লোকের ধারণা ছিল, সৌন্দর্য ও আনন্দ যাহার মধ্যে আছে, তাহাই আর্ট। টলষ্টয় এই ধারণাকে ভাঙিয়া দিয়া আর্টকে জীবনের মধ্যে সহজভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যাহাই সুন্দর ও আনন্দ দায়ক, তাহাই আর্ট---এ কথার তিনি প্রতিবাদ করিয়াছেন বটে, কিন্তু যাহাই আর্ট তাহাই যে সুন্দর ও আনন্দদায়ক হইবে না, তাহা তো তিনি বলেন নাই। বস্তুতঃ আর্টের সহিত সৌন্দর্যের কোনো বিরোধ তো নাই-ই, বরং ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। সত্য যেমন আর্টের প্রাণ, সৌন্দর্য তেমনই আর্টের পরিচ্ছদ। সৌন্দর্য ছাড়া আর্ট বাহিরে আসে না। সৌন্দর্যের সহিত আর্টের এতই ঘনিষ্ঠতা যে বাহিরের লোক তাহার এই উজ্জ্বল বহিরাবরণ দেখিয়া মনে করিয়াছে, সৌন্দর্য ও আর্ট একই বস্তু।

উপরে রঙ্গমঞ্চের দৃষ্টান্তে দেখানো হইয়াছে, অভিনয় ও দৃশ্যাবলী যতো পরিমাণে স্বাভাবিক বা সত্য হয়, ততো পরিমাণে উহা সুন্দর দেখায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে সৌন্দর্যের সহিত সত্যের সম্বন্ধ আছে। সত্য যেখানে পরিষ্কারভাবে বাহিরে আত্ম-প্রকাশ করে, সেখানে তাহা সুন্দর না হইয়াই পারে না। ইহা খোদাতালারই বিধান। তিনি যেমন সত্য ও মঙ্গল স্বরূপ, সেইরূপ সুন্দরও। বিশ্ব-প্রকৃতিতে তাই এত রূপের লীলা। বস্তুতঃ সৃষ্টির দুই মূলীভূত উপাদানই হইতেছে সুর আর রূপ। একটু সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে সুরও দূরীভূত হইয়া যায়, থাকে কেবল রূপ ; কেননা যাহা সুর তাহাও রূপ। রূপের অন্তরালে 'অরূপ রতন' বিরাজিত রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাকে পাইতে হইলে এই 'রূপ-সাগরেই' ডুব দিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ তাই ঠিকই বলিয়াছেন---

"রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করে।"

মানুষ এই রূপের মধ্যেই ডুবিয়া আছে। সুতরাং তাহার নিজস্ব সৃষ্টিতে যে রূপ বিদ্যমান থাকিবে, ইহা স্বাভাবিক।

সৌন্দর্যের সহিত আর্টের এই যে প্রাণের যোগ, ইহা আর্টেরই বিশিষ্ট বৈজ্ঞান বলো, দর্শন বলো, প্রত্যেক বিষয়েরই একটা স্বতন্ত্র

প্রকৃতি বা মেজাজ আছে। বিজ্ঞান ও দর্শনের মূল লক্ষ্য সত্য-উপলব্ধি হইলেও, প্রত্যেকের গতিপথ স্বতন্ত্র। বিজ্ঞান যে-পথ দিয়া চলে, দর্শন সে-পথ দিয়া চলে না; সে চলে আর এক নূতন পথ দিয়া। সেইরূপ আর্টের পথও বিভিন্ন। তার পথ হইতেছে সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া। এই পথ দিয়াই সে আমাদিগকে সত্যের সন্নিধানে লইয়া যায়।

অতএব দেখা যাইতেছে আর্টের সহিত সৌন্দর্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সৌন্দর্য ছাড়া আর্ট বাহিরে প্রকাশ পাইতেই পারে না।

আর্ট ও মঙ্গল

সত্য যদি আর্টের প্রাণ হইল, সৌন্দর্য যদি তাহার পরিচ্ছদ হইল, তবে লক্ষ্য তাহার কী হইবে? কোথায় কোন্ উদ্দেশ্যে যে যাত্রা করিবে?

আর্টের লক্ষ্য হইবে মঙ্গল। এই 'মঙ্গল-গ্রহের' দিকেই তাহাকে ছুটিতে হইবে। বিশ্ব-মানুষের কল্যাণ সাধনই হইবে তাহার চরম লক্ষ্য।

আর্ট ও নীতি

এখানেই আর্টের সহিত নীতির (morality) কথা আসিয়া পড়ে। এই প্রশ্ন লইয়া যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। একদল বলেন, আর্টে ভালো-মন্দ বিচার করিতে হইবে, নতুবা আর্টের নামে স্বেচ্ছাচার আরম্ভ হইবে। আর একদল বলেন---ওরূপ নৈতিক বিচার (moral judgment) আর্টের বেলায় খাটিবে না। একদল বলেন---নৈতিক সুসম্পন্নতাই (moral perfection) আর্টের উদ্দেশ্য। অন্য দল বলেন-- নিছক আনন্দ দানই আর্টের উদ্দেশ্য; ভালোমন্দ বা মঙ্গলামঙ্গলের সে কোনো ধার ধারে না। আর্টিষ্টের সৃষ্টিতে সৌন্দর্য ও আনন্দের সন্ধান পাওয়া গেল কি না, তাহাই শুধু বিচার্য। নীতি বা মঙ্গলের অনুশাসন মানিয়া চলিলে আর্টিষ্টের সৃষ্টি পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হয়, কোনো নূতন সৃষ্টি সম্ভবপর হয় না।

এই মতদ্বয়ের কোনটি সত্য? আমার মনে হয়, আর্ট যে নীতির গণ্ডীর বাহিরে, ইহা হইতেই পারে না। কোনো বাধাবন্ধ নাই, শাসন-শৃঙ্খলা নাই,

সংযম-শুচিতা নাই,—আর্টিষ্ট যাহা খুশী তাহাই করিয়া চলিবেন, আর তাহাই আর্টের নামে কাটিয়া যাইবে, ইহা বাতুলের উক্তি। ইহার নাম স্বাধীনতা নয়, উচ্ছৃঙ্খলতা। "গুরু মহাশয়গিরী করা আর্টের কাজ নয়"—ইহা না হয় স্বীকার করিলাম; কিন্তু তাই বলিয়া আর্টে যে কোনোই সংযম-শাসন থাকিবে না, এ কেমন কথা? আর্ট মানব জীবনে এমন কী এক দুর্লভ পদার্থ, যার জন্য নীতিধর্ম ও মঙ্গলকে জলাঞ্জলি দিয়া তাহার সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিতে হইবে? আর্ট এমনই বা কী বস্তু, যাহার নামে অকল্যাণ ও দুর্নীতিকে অকাতরে জীবনের মধ্যে বরণ করিয়া লইয়া অধোগতির পথে যাইতে হইবে? মঙ্গল ও সুনীতির নামে এত কেন আপত্তি? 'নূতন সৃষ্টির' ব্যাঘাত ঘটিবে, তাই? সৌন্দর্য ও আনন্দকে স্বাধীনভাবে উপভোগ করা যাইবে না, তাই? কতোটুকু ব্যাঘাত ঘটিবে? কতোটুকু লোকসান হইবে? আমার তো মনে হয় আর্টের নামে যাঁহারা স্বাধীনতার দাবী করেন, তাঁহারা হয়তো এ সব লাভ-লোকসানের বিষয় আদৌ চিন্তা না করিয়াই একে অপরের দেখাদেখি প্রচলিত ধূয়ার প্রতিধ্বনি করেন মাত্র, নয় তো তাহারা আসলেই অতি বদ, তাহাদের মতলবও নিতান্ত খারাপ। নৈতিক চৌহদ্দী বজায় রাখিয়া কি সৃষ্টি সম্ভব নয়? বরং সৃষ্টির এক প্রধান সত্যই হইতেছে নিয়ন্ত্রণ।

আর্টিষ্টের সৃষ্টি নৈতিক বিচারের গণ্ডীর মধ্যে আসিবে না কেন? আর্ট যখন একটি মানবীয় ক্রিয়া (human activity), এবং মানুষ যখন একটি সামাজিক ও নৈতিক জীব (social and moral being), তখন তার সৃষ্টিতে বা শিল্পকর্মে ভালোমন্দের বিচার যে চলিবে, ইহা তো নিতান্তই স্বাভাবিক। যে কার্যের ভিতর কোনো উদ্দেশ্য (intention) নিহিত আছে, তাহা যে নৈতিক গণ্ডীর ভিতরে আসিবে, নীতি-শাস্ত্রের ইহা তো খুবই সোজা কথা। শিল্পী যখন কাব্যে উপন্যাসে বা চিত্রে কোনো সুন্দর বা কুৎসিৎ ভাব অঙ্কিত করিয়া জনসাধারণের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন, তখন তার মধ্যে কোনো-না-কোনো একটা উদ্দেশ্য তো থাকেই। তার সৃষ্টি সকলে দেখুক এবং তাহাকে সুখ্যাতি করুক—এ উদ্দেশ্য প্রত্যেক শিল্পীর অন্তরেই বিরাজিত। অন্ততঃ তার সৃষ্টিকে বাহিরে প্রকাশ করিবার আনন্দটুকু উপভোগ করাও তো

একটা উদ্দেশ্য। যদি কোনো উদ্দেশ্যই না থাকিবে, তবে শিল্পীরা আপন আপন সৃষ্টিকে সাধারণ্যে প্রচার করিতে এত ব্যগ্র কেন? আপনার সৃষ্টি আপনারই আত্মতৃপ্তির জন্য গোপন করিয়া রাখিলেই তো চলিত! তাহা যখন দেখি না, তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে, আর্টিষ্টের সৃষ্টি উদ্দেশ্য বিহীন নহে।

আর্টিষ্ট যাহাই বলুন না কেন, তার সৃষ্টি যখন জনসমাজে প্রচারিত হয়, তখন নিশ্চয়ই তার একটা প্রভাব আছে। কাজেই সে প্রভাব ভালো কি মন্দ, সে বিচার সমাজ করিবেই। "আর্টের খাতিরে আর্ট", "নীতি-ধর্মের সহিত আর্টের কোনো সম্বন্ধ নাই"—ইত্যাদি বলিয়া শত চীৎকার করিলেও কোনো ফল হইবে না। সামাজিক জীব হিসাবে আমার যেমন কতকগুলি ব্যক্তিগত অধিকার (rights) আছে, সেইরূপ কতকগুলি কর্তব্য-বন্ধনও (duties and responsibilities) আছে। আপন বাড়ীতে স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করিবার আমার পূর্ণ অধিকার থাকিলেও আমি যখন-যাহা-খুশি-তাহাই করিতে পারি না। প্রতিবেশীর তাহাতে অসুবিধা ও আপত্তি আছে কিনা, তাহার প্রতি আমার লক্ষ্য রাখিতে হয়, নতুবা আইন আমলে আসে। সেইরূপ আর্টিষ্টের সৃষ্টিও যখন সমাজের সংস্পর্শে আসিতে বাধ্য, তখন সমাজের কল্যাণ-অকল্যাণের দিকে আর্টিষ্টের লক্ষ্য রাখিতেই হইবে। আর্টিষ্ট যদি সমাজ-গণ্ডীর বাহিরে এক জনহীন "Palace of Art"-এ বাস করিয়া "Art for art's sake" ইত্যাদি বুলি আওড়াইতেন এবং যাহা-খুশী-তাহাই করিতেন, তবে তাঁহার উপর কোনো বিচারই চলিত না। কিন্তু যতক্ষণ তিনি সমাজের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া কোনো কার্য করিবেন—তা সে আর্টই হউক আর অপর কিছুই হউক—ততক্ষণ তাঁহাকে ভালোমন্দের বিচারাধীন থাকিতেই হইবে।

আর্ট ও মনোবিজ্ঞান

মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে দেখিলেও আর্টকে নৈতিক গণ্ডীর মধ্যে ফেলা যায়। মানব-মনের মাত্র তিন অবস্থা:—thinking, feeling,

willing, অর্থাৎ হয় সে চিন্তা করিবে, নয় সে অনুভব করিবে, নয় সে কিছু ইচ্ছা করিবে। এই তিন মনোবৃত্তির বাহিরে মানুষ থাকিতেই পারে না। সত্য ও জ্ঞান চিন্তা-সাপেক্ষ, সৌন্দর্যানুভূতি, প্রেম প্রভৃতি অনুভূতি-সাপেক্ষ এবং মঙ্গলামঙ্গল ইচ্ছা-সাপেক্ষ। অন্য কথায় 'সত্য' 'সুন্দর' ও 'মঙ্গলের' মূল ভিত্তিই হইল thinking, feeling এবং willing. এই তিনটি মনোবৃত্তি পরস্পর স্বতন্ত্র—এমন কি স্থানে স্থানে বিরোধী হইলেও, পরস্পরের মধ্যে মিলও কিন্তু যথেষ্ট। অন্তরে যখন প্রেম জাগ্রত হয়, চিন্তা বিবেক বা মঙ্গলামঙ্গলের কথা তখন দূরে থাকে। চিন্তা করিতে গেলে অনেক স্থলে হয় তো প্রেম করাই হয় না। আবার কার্যক্ষেত্রে নামিয়া কবির মতো শুধু ধ্যান করিতে গেলে, হয় তো সে কার্যই পণ্ড হইয়া যায়। যে মানুষ ডুবিয়া মরিতেছে, তাহাকে দেখিয়া যদি যুক্তিতর্ক দ্বারা কর্তব্য স্থির করিতে যাই, তবে সে বেচারার আর উদ্ধার নাই। ইহা দ্বারাই বুঝা যাইতেছে, এই তিনটি মনোবৃত্তি পরস্পর কতো স্বতন্ত্র। কিন্তু অনেক স্থলে ইহাদের মধ্যে পরস্পর মিলও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। জ্ঞান জন্মিলেই অনুভূতি জন্মিতে পারে, এবং পরে তাহা হইতে কর্মপ্রবৃত্তিও জাগিয়া উঠে। স্বদেশ বা স্বজাতির লাঞ্ছনা ও দুরবস্থার কথা যখন জানিতে পারি, তখন অন্তর-তলে বেদনার অনুভূতি আপনা-আপনিই জাগিয়া উঠে এবং সেই অনুভূতি হইতেই দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। অনুভূতি হইতেও অনেক সময় জ্ঞানে পৌঁছিতে পারি। এইরূপে জ্ঞান, অনুভূতি এবং কর্মস্পৃহা পরস্পর পরস্পরকে অনেক সময় সাহায্য করিয়া প্রত্যেকের গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেয়। পরস্পর স্বতন্ত্র হইলেও কেহই স্বাধীন ভাবে চলে না। প্রেম, ক্রোধ প্রভৃতি অনুভূতি-প্রধান মনোবৃত্তিগুলি যখন স্বাধীন ভাবে কাজ করে, তখনই জগতে মহা অনর্থ সাধিত হয়। কিন্তু তাহারা যখন বিবেক বা জ্ঞানের শাসন মানিয়া চলে, তখনই তাহারা সুন্দর ও সার্থক হয়।

আর্টও যখন এই feeling-এর অন্তর্ভূক্ত, তখন সেও একেবারে বিবেক ও নীতির বাহিরে থাকিতে পারে না। সত্য ও মঙ্গলের দ্বারা সংযত হইয়া চলিলেই সে প্রকৃতপক্ষে সুন্দর হয়।

আর্ট ও প্রকৃতি

উপরে বলা হইয়াছে, আর্ট হইতেছে স্বভাবের অনুকরণ। সুতরাং এইবার আমরা বিবেচনা করিয়া দেখিব, স্বভাবের মধ্যে কোনো মঙ্গলভাব বা নৈতিক প্রভাব নিহিত আছে কি না। যদি থাকে, তবে আমাদের আর্টেও উহা স্বতঃসিদ্ধ ভাবে থাকিবে।

স্বভাব বা প্রকৃতির অনুকরণ করাই আর্টের কাজ। প্রকৃতিকে ছাড়িয়া আর্ট দাঁড়াইতেই পারে না। প্রকৃতিই হইতেছে আর্টের প্রতিষ্ঠাভূমি। কিন্তু এই প্রকৃতি নিজেই একটি আর্ট---স্বয়ং খোদাতালা ইহার শিল্পী। কাজেই দেখা যাইতেছে, মানুষের আর্ট হইতেছে খোদার আর্টের সন্তান। অর্থাৎ আমাদের আর্টের অবস্থা ঠিক যেন নাতী-নাতনীর অবস্থার ন্যায়। **Dante** তাই বলিয়াছেন :---

> **"Nature takes its method and its ends**
> **From God, Whose mind in**
> **skill and art is shown,**
> **Your Art, as far as may be, close behind**
> **Follows, as scholars near**
> **their teacher tread;**
> **So in your Art we may**
> **God's grandchiled find."**

এখন দেখা যাউক, খোদার আর্টের মধ্যে---অর্থাৎ এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে খোদাতালা কোনো মঙ্গলভাব নিহিত রাখিয়াছেন, না তিনিও **"Art for art's sake"** নীতির অনুসরণ করিয়াছেন। একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, এই যে নানা বর্ণে নানা বৈচিত্র্যে প্রকৃতি আমাদের সম্মুখে নিত্য নব নব মূর্তিতে প্রকাশ পাইতেছে, ইহা কোনো খেয়ালী বিধির সৃষ্টি নয়, ইহার মধ্যে মঙ্গলভাব ওতপ্রোতভাবে নিহিত রহিয়াছে। বসন্তের দখিন্ হাওয়ায়, কুসুমের হাসির হিল্লোলে, ভরা-বাদরের জল-কল্লোলে, চন্দ্র-সূর্যের আলোক-পাতে ---ফুলে ফলে বর্ণে গন্ধে,---সর্বত্রই কার যেন মঙ্গল হস্তের সুখ-স্পর্শ অনুভব করি। প্রভাতে অরুণ কিরণ বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় কি অপরূপ শোভাই না

ফুটাইয়া তোলে! কিন্তু সেই শোভা ও সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া নিখিল বিশ্বের সুপ্ত প্রাণে সে নব-জীবনের পুলক-স্পন্দনও আনিয়া দেয়। ফুল-শাখায় দোলা দিয়া, কচি ধানের বুকের উপর ঢেউ খেলাইয়া, বাতাস বাহিয়া যায়। কিন্তু তার মধ্য দিয়া সে মানুষের ঘরে-ঘরে সঞ্জীবনী-সুধাও দান করিয়া চলে। অন্ধকার রাত্রিতে তারকা-বালারা মিষ্টি চোখে মুচ্‌কি হাসি হাসিয়া ধরার মানুষকে শুধু পাগলই করে না, ধ্রুবতারা হইয়া তাহারা কতো দিগ্‌-ভ্রান্ত পথিকের পথ-নির্দেশও করিয়া দেয়। কতো বর্ণে, কতো গন্ধে পুষ্প বিকশিত হইয়া উঠে, কিন্তু তারাও মানুষের অশেষ কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে। ফল হইয়া মানুষের কাজে লাগাই হইতেছে ফুলের জীবনের গোপন সাধনা এবং যতক্ষণ এই সাধনা সিদ্ধ না হয়, ততক্ষণ যেন তার সৌন্দর্য সার্থক হইয়া উঠে না। নদনদী শুধু প্রকৃতির আনন্দ ও শোভা বর্দ্ধনই করে না, জনপদের ভিতর দিয়া দিকে দিকে প্রবাহিত হইয়া সে মানুষের বহু কল্যাণ সাধনও করিয়া থাকে। বস্তুতঃ যেদিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই দেখিতে পাই—সৌন্দর্য ও আনন্দের মধ্য দিয়া জগতের মঙ্গল-সাধনই প্রকৃতির উদ্দেশ্য।

খোদাতালার আর্টের ইহাই যখন লক্ষ্য তখন মানুষের আর্টে কেন ইহার ব্যতিক্রম হইবে? সত্য বটে, প্রকৃতিতে অসুন্দরের বা অমঙ্গলেরও অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে। ঝড় ভূমিকম্প অনাবৃষ্টি বন্যা প্রভৃতিও প্রকৃতির অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু তাই বলিয়া উহারাই প্রকৃতির চরম সত্য নয়। আর ঐগুলি যে প্রকৃতই অমঙ্গল, তাহারও কোনো নিশ্চয়তা নাই। আমাদের জ্ঞান নিতান্তই সসীম। এই সসীম জ্ঞান লইয়া অসীমের লীলা কি করিয়া আমরা বুঝিব? তাই দেখিতে পাই, আমাদের নিকট যাহা অমঙ্গল বলিয়া অনুভূত হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহা অমঙ্গল নয়। অতি ঊর্ধ্ব হইতে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, তথাকথিত অনেক অমঙ্গলই আর এক বৃহত্তর মঙ্গলের কারণ স্বরূপ। সুতরাং এ কথা আমরা অনায়াসে বলিতে পারি যে, খোদাতালা তাঁহার সৃষ্টিতে সর্বত্রই মঙ্গল-ভাব নিহিত রাখিয়াছেন।

এখানে একটা কথা উঠিতে পারে যে, প্রকৃতিতে যাহা অমঙ্গল বলিয়া মনে হয়, তাহা যদি প্রকৃত অমঙ্গল না হয়, তবে মানুষের সৃষ্টিতেও যাহা

আমরা অমঙ্গল বলিয়া মনে করি, তাহাও তো প্রকৃত অমঙ্গল না হইতেও পারে! পরিণামে সব অমঙ্গলই তো মঙ্গলপ্রসূ হইবে। এ কথা অনেকটা সত্য বটে। কিন্তু মানুষের কৃত অমঙ্গলকে মঙ্গলে পরিণত করিতে প্রকৃতি এত দীর্ঘ সময় গ্রহণ করে যে, তাহার ফল ভোগ করিবার পূর্বেই বহু লোক ধ্বংস মুখে গিয়া পৌঁছে। বহিঃপ্রকৃতির অমঙ্গল ভাব অপেক্ষা মানুষের অমঙ্গল ভাব দ্রুত কার্যকরী, মানুষের কাজ মানুষের উপর সহজেই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। কাজেই কোনো মানুষকেই দুর্নীতি বা অমঙ্গল ভাব প্রচার করিতে দেওয়া নিরাপদ নয়।

অনেকে বলেন, আর্টে নীতি ও মঙ্গলের শাসন চলিলে আর্টিষ্টের সৃষ্টি ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয়, স্বাধীন সৃষ্টি অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। 'স্বাধীন সৃষ্টির' দ্বারা তাঁহারা যে কি বোঝেন, বুঝি না। মানুষের স্বাধীন সৃষ্টির অর্থ কী? তার সৃষ্টি স্বাধীন হইতে পারে কি? কখনই নয়। মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ, সে অন্যনিরপেক্ষ নয়, সুতরাং স্বাধীন সৃষ্টি তাহার হস্তে কি করিয়া সম্ভব? একমাত্র খোদাতালাই স্বাধীন সৃষ্টি করিতে সক্ষম, কেননা তাঁহার সৃষ্টি অন্য কাহারও অপেক্ষা রাখে না। ইচ্ছা করিলেই তিনি যাহা খুশী তাহাই করিতে পারেন। এ হেন স্বাধীন সৃষ্টি মানুষ কি করিয়া আশা করিতে পারে? কাজেই মানুষের স্বাধীন সৃষ্টির কোনো অর্থই হইতে পারে না। তাহাকে কোনো না কোনো নিয়মের অধীন হইয়া সৃষ্টি করিতেই হইবে। অতএব স্বাধীন সৃষ্টির নামে নীতি ও মঙ্গলকে দূরে ঠেলিয়া ফেলা তাহার পক্ষে নিতান্তই ধোকাবাজী।

তবে এখানে এইটুকু বলিতে পারি যে, "সদা সত্য কথা বলিবে, চুরি করা বড় পাপ" ইত্যাদি ধরনের নীতিবাক্যই যে বাছিয়া আর্টে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে তাহা নহে। আর্টিষ্টের নীতি-শাস্ত্র একটু স্বতন্ত্র ধরনের। নীতি-শাস্ত্রের গণ্ডীর মধ্যে রাখিয়াও তাহাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারে। পদে পদে পথ-নির্দেশ করিতে গেলে তাহার সৃষ্টি ব্যাহত হয় বটে, কিন্তু এমনও তো হইতে পারে যে, একটা ব্যাপক সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও সে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারে। স্বভাবের সৃষ্টিতেও তো এমন একটা ব্যাপক বাউণ্ডারী লাইন আছে।

এত বিধি-নিষেধ, এত সীমানা-নির্দেশ মোটেই দরকার হয় না—আর্টিষ্ট যদি প্রকৃতপক্ষেই খাঁটি আর্টিষ্ট হন। যার মধ্যে প্রতিভা আছে, সত্য সাধনা আছে, অন্তর্দৃষ্টি আছে, হৃদয় যাহার পবিত্র, উদ্দেশ্য যাহার সাধু, সেই আর্টিষ্টকে সমস্ত বাধা-বন্ধন হইতে একেবারে মুক্ত করিয়া দিলেও তাহার স্থষ্টি কিছুতেই সৎ ছাড়া অসৎ হইবে না। কুশ্রী জিনিসও তাঁহার তুলিকার যাদুস্পর্শে সৎ ও সুন্দর হইয়া দেখা দিবে। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি বিহীন কোনো লোক আর্টিষ্ট সাজিলেই সে কেবলই তর্ক করিবে এবং আইনের ফাঁক খুঁজিয়া নিজের প্রবৃত্তিকে সমর্থন করিবার চেষ্টা করিবে। এত তর্ক, এত আলোচনা—এ শুধু তাহাদের জন্য। সাদী, হাফেজ, রুমী, মাইকেল এঞ্জেলো, র‍্যাফেল প্রভৃতির জন্য নয়।

উপরে যাহা বলা হইল, আশা করি তাহা দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, কোনোদিক দিয়াই আর্টের আঙিনা হইতে আমরা নীতি ও মঙ্গলকে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিতে পারি না।

আর্ট ও মানব-জীবন

আর্টের চরম সার্থকতা মানুষের আপন জীবন। আর্টের ক্ষেত্র শুধু কাব্য-উপন্যাসই নয়, আর্টের ক্ষেত্র সুবিস্তীর্ণ মানব-জীবন। তুলি দিয়া, রং দিয়া বাইরে কোনো শিল্পবস্তু স্থষ্টি করিলেই আর্ট পূর্ণবিকশিত হয় না; আপন-আপন জীবন-পটে শিল্প রচনা করিতে পারিলে তবেই আর্টের চরম সদ্ব্যবহার করা হয়। ম্যাডোনা, মোনালিসা শিল্প হিসাবে যতো সার্থক-স্থষ্টিই হোক—তাহারা প্রাণহীন নির্জীব। জীবন্ত ম্যাডোনা বা জীবন্ত মোনালিসা বিশ্বধরার স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকিলে কি অধিকতর সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক হয় না? কি পুরুষ, কি নারী, পৃথিবীর যাবতীয় মহৎ ও সুন্দর মানব চরিত্রগুলিকে আর্টের আলোকে এইরূপে ব্যাখ্যা করা যায়। বলা যায় প্রত্যেকে তারা আর্টিষ্ট এবং প্রত্যেকে তারা নিজের জীবন-শিল্পকে সুন্দর করিয়া রচনা করিয়াছে। জীবনের মাঝে আর্টকে এই ভাবে গ্রহণ করিলে তখন আর "Art for Art's sake" থাকে না, তখন হয়

'Art for Man's sake''. আর্টের এই প্রয়োগই চরম প্রয়োগ এবং এখানেই তার সার্থকতা।

আর্টের সার্বজনীনতা ও সহজবোধ্যতা

এই স্থানে আর একটি প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে। শ্রেষ্ঠ আর্টের নিদর্শন কী? সত্য সুন্দর ও মঙ্গল তিনই না হয় বিদ্যমান রহিল, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এমনও তো হইতে পারে যে, কোনো আর্ট সহজেই লোকের বোধগম্য হইতে পারে, কোনো আর্ট বা নিতান্ত দুর্বোধ্য ও সাধারণের উপভোগের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে কোন্ শ্রেণীর আর্টকে শ্রেষ্ঠ বলা যাইবে? যাহা আপামর সকলেই বুঝিতে পারে তাহাই, না যাহা কতিপয় মুষ্টিমেয় লোককেই কেবল আনন্দ দেয়, তাহাই।

টলষ্টয় বলেন, যাহা সর্বসাধারণেই উপভোগ করিতে পারে, তাহাই শ্রেষ্ঠ আর্ট। আর্টিষ্ট যখন কোনো একটা নূতন ভাব আপন প্রাণে উপলব্ধি করিয়া জনসাধারণে তাহা প্রচার করিয়া দিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার আর্ট সৃষ্টি করেন, তখন তাহা যতো সহজে লোকের বোধগম্য হইতে পারে, ততোই সুন্দর বলিয়া মনে করিতে হইবে। লোকে যদি কিছু নাই বুঝিল, তবে সে আর্টের সার্থকতা কোথায়? হজরত ইব্রাহিমের পুত্র-কোরবানি, ইউসুফ-জুলেখার প্রেম-কাহিনী, রাম-লক্ষ্মণ ও সীতার উপাখ্যান প্রভৃতিই টলষ্টয়ের মতে শ্রেষ্ঠ আর্ট, কারণ উহাদের অন্তর্নিহিত ভাবনিচয় সহজেই লোকে গ্রহণ করিতে পারে।

কিন্তু বর্তমান আর্টবাদী ও সমালোচকবৃন্দ টলষ্টয়ের এই উক্তি হয়তো মানিতে চাহিবেন না। তাঁহারা বলিবেন, ওরূপ ভাবে আর্টের বিচার করিলে নিতান্ত নিম্নস্তরের আর্টকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিতে হয়। শিক্ষা, সাধনা বা মার্জিত রুচির কোনোই মূল্য থাকে না। পাঁচালি, জারি, গ্রাম্য কবি-গান, বটতলার পুঁথি, রাধাকৃষ্ণের চিত্রাবলী, এই সমস্তকেই তাহা হইলে রুমি, হাফেজ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির উপরে আসন দিতে হয়।

এই দুই মতের কোন্‌টি সত্য? আমার মনে হয়, দুই দিকেই সত্য নিহিত আছে। টলষ্টয়ের মতকে নির্বিচারে মানিয়া লইলে বাস্তবিকই

মুড়ি-মিছরী সব এক দর হইয়া যায়। এ কথা সর্ববাদিসম্মত যে, শিক্ষা সভ্যতা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা মানুষের রুচি ও বোধশক্তি উন্নত ও মার্জিত হয়, সাধারণ লোক যাহা বুঝিতে না পারে বা তাহার নিকট যাহা ভালো না লাগে, কোনো শিক্ষিত লোকের নিকট তাহা সহজবোধ্য ও আনন্দদায়ক হইতে পারে। একজন অশিক্ষিত স্থূলরুচিবিশিষ্ট গ্রাম্য লোক একজন সুশিক্ষিত মার্জিত রুচি-সম্পন্ন ভদ্রলোকের সহিত কোনো উন্নত ভাবকে সমভাবে গ্রহণ করিতে পারিবে, এরূপ আশা করা নিতান্তই অসঙ্গত। প্রকৃতির গূঢ় মর্ম শিক্ষিত ও উন্নতমনা ব্যক্তির নিকটেই সমধিক বোধগম্য, কোনো নিরক্ষর অজ্ঞ লোকের নিকট নয়। কাজেই দেখা যাইতেছে, সর্বসাধারণের বোধগম্য করিয়া আর্ট রচনা করিতে গেলে আর্টকে অনেকখানি নীচে নামিয়া আসিতে হয়; উন্নত ও সৌন্দর্যানুভূতিকে আশ্রয় করিয়া আর কোনো আর্ট রচনা সম্ভবপর হয় না।

কিন্তু অন্য দিকেও বলিবার যথেষ্ট আছে। আজকাল এক শ্রেণীর তথাকথিত আর্টিষ্টের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহারা আর্টের নামে তাঁহাদের ভাবকে এমন ঘোরালো-পেঁচালো করিয়া প্রকাশ করা আরম্ভ করিয়াছেন যে, সাধারণ লোকে তো তার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝিতেই পারে না। মেটারলিঙ্ক, ভারলেন প্রভৃতি ফরাসী কবিগণ হেঁয়ালি সৃষ্টির উদ্দেশ্য লইয়াই কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। এখনো অনেক ফরাসী কবির মত এই যে, কবিতায় একটা না একটা কিছু হেঁয়ালি বিদ্যমান থাকা চাই-ই, নতুবা উহা কবিতাই হইবে না। সম্ভবতঃ এই মনোভাব লক্ষ্য করিয়াই টলষ্টয় উপরোক্ত মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আর্টের নামে ভাবহীন রচনা বা প্রাণহীন দেহ যে উচ্চ মূল্যে বিকাইয়া যাইবে, ইহাও তো ঠিক নয়।

এখন এ সমস্যার সমাধান হইবে কিরূপে? আর্টকে সহজবোধ্য করিতে গেলেও অনেক উন্নত ভাব আর্টে ধরা পড়ে না, আবার উন্নত ভাবের সমাবেশ করিতে গেলেও অনেক স্থলে ভাবহীন হেঁয়ালির সৃষ্টি হইয়া পড়ে। কোন্ পথ অবলম্বনীয়?

আমার মতে দুই-এর কোনোটিকেই একক ভাবে গ্রহণ করা সমীচীন হইবে না। আর্টিষ্টকে দুই কূলই রক্ষা করিতে হইবে। মার্জিত রুচি-

সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের জন্য যেমন উন্নত ভাবের আর্ট চাই, সাধারণের জন্যও সেইরূপ সহজবোধ্য আর্ট চাই। সাধারণের উৎপন্ন দ্রব্যে যেমন কবি, সাহিত্যিক, আর্টিষ্ট ও বড় লোকদের অধিকার আছে, সাহিত্যিক ও আর্টিষ্টদের উৎপন্ন দ্রব্যেও সাধারণের তেমনই একটা দাবী আছে। এই গণতন্ত্রের যুগে সাহিত্যে ও ললিত কলায় পূর্বের আভিজাত্য রক্ষা করিতে গেলে চলিবে না। সকলেরই ন্যায্য দাবী বুঝিয়া দিতে হইবে। শিল্পীদের শ্রেণী বিভাগের তাই প্রয়োজন আছে।

আর্টের খাতিরে আর্ট

"Art for art's sake" এই কথাটি প্রায়ই যার-তার মুখে শুনা যায়। আর্টে নীতির প্রশ্ন উঠিলেই অনেক এই একটি কথার দ্বারা নীতিবাদীর মুখ বন্ধ করিয়া দেন। যেন এ কথাটা কেহই জানে না, একমাত্র তিনিই ইহার মর্ম বুঝেন। কিন্তু এত আদরের এই বাঁধা বুলিটার অর্থ যে কি, তাহা যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তবে অনেকেরই কিন্তু চক্ষুস্থির হইয়া পড়িবে! "আর্টের খাতিরে আর্ট" এ কথাটা কোথা হইতে আসিল এবং ইহার তাৎপর্যই বা কি? ইহা দ্বারা আনন্দমূলক-আর্টবাদী কী যে বুঝেন, বুঝি না! আর্টকে আর্টের মতো করিয়াই সেবা করিতে হইবে, নীতি, ধর্ম, সমাজ বা অন্য কোনো কিছুর সহিত জড়িত করিয়া দেখিতে হইবে না, ইহাই যদি ইহার অর্থ হয়, তবে এ কথার ভিতর নূতনত্ব কী রহিল? আর নূতন যুক্তিই বা এমন কি দেখানো হইল যার জন্য নীতি বা মঙ্গলের প্রবেশ একদম নিষিদ্ধ হইয়া গেল? "খাওয়ার খাতিরে খাও", "ধর্মের খাতিরে ধর্ম করো", "কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য করো" ইত্যাদি কথার যাহাই অর্থ হউক না কেন, ইহাদের উদ্দেশ্যের কথা তো কিছুতেই ধুইয়া মুছিয়া যায় না! তুমি খাও, কেন খাও?—খাবার খাতিরে খাও। এর কি কোনো একটা সঙ্গত অর্থ হয়? খাবার খাতিরে যদি খাও, তবে ছাই-ভস্ম গু-গোবর খাও না কেন? তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝা যাইতেছে, খাবার খাতিরে খাইলেও তোমার অন্তরে একটা কিছু উদ্দেশ্য লুক্কায়িত

আছে। সেই উদ্দেশ্য সাধন করিবার পক্ষে যেসব জিনিস উপযোগী. তাহাই তুমি খাও, আর যেগুলি উপযোগী নয়, তাহা খাও না। সেইরূপ "কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য" করিলেও তার একটা উদ্দেশ্য তো থাকিবেই। আর কিছু না থাকুক, অন্ততঃ কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য করিতে প্রবৃত্ত হওয়ার যে আনন্দ, তার উপভোগটুকুও তো একটা উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য বিহীন কোনো কাজ জগতে আছে কি? বাতুল যাহারা, একমাত্র তাদের কাজই উদ্দেশ্যবিহীন। কাজেই উদ্দেশ্য যদি থাকিল, তবে তাহার উপর বিচারও চলিবে।

বস্তুতঃ ইহা একটা যুক্তিও নয়, নূতন তথ্যও নয়। সংসারের সমস্ত সম্বন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া কেহই কোনো কাজ করিতে পারে না। পরিপার্শ্বের সহিত যোগ-সম্বন্ধ ভাবেই আমাদিগকে সমস্ত করিতে হয়। আর্টকেও আমরা কোনো মতে তার পরিপার্শ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে পারি না। "লাট সাহেবের বাড়ী" অঙ্কিত করিয়া দেখাইতে হইলেও পরিপ্রেক্ষণার ভিত্তিতে (perspective view) আনিয়া উহাকে অঙ্কিত করিতে হইবে। অর্থাৎ উহা যে কোথায় অবস্থান করিতেছে, উহার চতুস্পার্শ্বে গাছ-পালা, বাড়ী-ঘর, রাস্তা-ঘাট কোথায় কি আছে, তাহা দেখাইতে হইবে, নতুবা কিছুই বুঝা যাইবে না! কাজেই দেখা যাইতেছে আর্টকে উহার পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সেবা করিবার উপায় নাই। সেরূপ করাও যা, মাছকে পানি হইতে পৃথক করিয়া দেখাও তাই। "আর্টের খাতিরে আর্ট" চর্চা করিতে গেলে আর্টের মৃত্যু অনিবার্য।

এই মারাত্মক কথাটি কোথা হইতে আমদানী হইল, তাহার সন্ধান করিতে গেলে আমাদের দাসমনোভাবই মূর্ত হইয়া ধরা দিবে। পশ্চিম হইতে আমদানি করা এই কথাটি কিরূপ নির্বিচারেই না আমরা গ্রহণ করিয়াছি। অর্থ জানি না, তাৎপর্য বুঝি না, কবে কোথায় কিরূপ অর্থে কে ইহা প্রথম বলিয়াছিল তাহার খবর রাখিনা, অথচ হরদম বলিয়া চলি, "Art for art's sake"! "Art for art's sake"।

কথাটার উৎপত্তি কোথা হইতে হইল, তাহা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও নিশ্চিতরূপে স্থির করিতে পারি নাই। সম্ভবতঃ জার্মান দেশে অষ্টাদশ

শতাব্দীতে August Wilhelm Schlegel নামক এক ব্যক্তি এই মতবাদ প্রথম প্রচার করেন। যে যুগে এই কথা প্রচার করা হইয়াছিল, জার্মানির পক্ষে সে যুগ বিশ্লেষণের যুগ। সমস্ত জিনিসকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখাই সে যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল। তা ছাড়া ধর্ম ও নীতির বন্ধনও তখন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই আর্টকে কোনো লোক হয়তো বিশ্লেষণের দৃষ্টিতেও দেখিয়া থাকিবে। অথবা নীতিধর্মবর্জিত আনন্দ-মূলক আর্টবাদ (Aesthetic hedonism) হইতেই এই কথার উদ্ভব হইয়া থাকিবে। ইহা ছাড়া ইহার অন্য কোনো ব্যাখ্যা নাই।

পরবর্তী কালে Whistler নামক জনৈক আমেরিকান আর্টিষ্ট 'Art for art's sake"--এই নীতি খুব জোরে-শোরে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহা একটু জানিলেই তাঁহার মতের কতোখানি মূল্য তাহা বুঝা যাইবে। তিনি ছিলেন একজন মাথা-পাগলা লোক। আর্টিষ্ট যাহাই ভালো বুঝিবে তাহাই করিবে এবং সাধারণ লোক ও সমালোচকদিগের আর্ট বুঝিবার কোনো ক্ষমতা নাই---ইহাই ছিল তাঁহার ধারণা। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বিখ্যাত ইংরাজ আর্ট-সমালোচক রাস্কিনের বিরুদ্ধে এক মানহানির মোকদ্দমা দায়ের করেন, কারণ তিনি তাঁহার চিত্রাবলীকে "এক কৌটা রং সাধারণের মুখের উপর ছুঁড়িয়া ফেলা হইয়াছে" (a pot of paint flung on public face), এই বলিয়া সমালোচনা করিয়াছিলেন। বিচারে তিনি রাস্কিনের বিরুদ্ধে এক ফার্দ্দিং ক্ষতিপূরণ পাইয়াছিলেন। (Vide Encyclopaedia Britanica)

Whistler-এর দেখাদেখি ইংরাজ-লেখক Oscar Wilde-ও "Art for art's sake" নীতি অনুসরণ করিয়া জীবন যাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনিও অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি তাঁহার গৃহ ময়ূরপুচ্ছ, লিলি ফুল প্রভৃতি দিয়া সাজাইয়া রাখিতেন এবং উহাদের মতো করিয়া জীবন যাপন করিতে প্রয়াস পাইতেন।

এইরূপ ধরনের লেখক দ্বারাই "Art for art's sake" মতবাদ উদ্ভূত হইয়াছিল। উহারই ঢেউ আসিয়া বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রকে প্লাবিত করিয়াছে।

আর্টের ভবিষ্যৎ

আর্টের এই বিকৃত রূপ বেশীদিন থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। ইহার প্রতিক্রিয়া অনিবার্য। যৌন-আবেদন লইয়া আর্ট রচনা করিলে সে আর কতোদিন মানুষের তৃপ্তিসাধন করিতে পারিবে? উহা একঘেঁয়ে না হইয়াই পারিবে না। নব নব ভাব (fresh feeling) না দিতে পারিলে সে আর্ট মানুষকে বেশী দিন আনন্দ দান করিতে পারে না। তা ছাড়া মানুষ তাহার জীবনে শুধু যৌন সম্বন্ধকেই বড় করিয়া দেখে নাই। যৌন সম্বন্ধ ছাড়া তাহার আরও মহত্তর উদ্দেশ্য আছে। তাই শুধু যৌন ক্ষুধার খোরাক দ্বারা তাহার আত্মা বাঁচিতে পারে না, আরও কোনো উন্নত খোরাক তাহার চাই। আর্টের মধ্য দিয়া সেই খোরাক তাহাকে দিতে হইবে। আর্টে ভালো-মন্দ—দুইই যুগে যুগে ছিল, আছে এবং থাকিবে। আলোকের পাশে যেমন অন্ধকার আছে, সত্যের পাশে যেমন মিথ্যা আছে, সৎ আর্টের পাশে তেমনই অসৎ আর্টও থাকিবে। দেহ যতোদিন আছে, দেহের ক্ষুধাও ততোদিন থাকিবে। ইহা প্রকৃতিরই নিয়ম। এ নিয়ম হাজার চেঁচামেচি করিয়াও কেহ খণ্ডন করিতে পারিবে না। সুতরাং কোন্ আর্ট থাকা উচিত আর কোন্ আর্ট থাকা উচিত নয়, তাহার আমাদের প্রশ্ন নয়; আমাদের প্রশ্ন হইতেছে—কোন্ আর্ট আমাদিগের গ্রহণ করা উচিত।

উপসংহার

আর্টের নানা দিক তো আমরা দেখিলাম। এখন আমাদের প্রশ্ন এই—কিরূপ আর্ট আমাদের চাই? তদুত্তরে আমি বলিব—আমাদের আর্ট সঙ্কীর্ণ হইবে না। আমরা সত্য সুন্দর এবং মঙ্গল—তিনজনকেই চাই। যে আর্টে এই তিনেরই অনুরণন থাকিবে, তাহাকেই আমরা শ্রেষ্ঠ আর্ট বলিব। আমাদের মনের ভিতর যখন সত্য সুন্দর ও মঙ্গলের মৌলিক উপাদান রহিয়াছে, তখন একটাকে ছাড়িয়া একটাকে গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে না। সৌন্দর্য এবং আনন্দকে আমরা বয়কট করিতে চাই না; কিন্তু তাহার সহিত সত্য ও কল্যাণকে সঙ্গে করিয়া আনিতে বলি।

আমার চিন্তাধারা

খোদাতালার আর্টকে আমরা সম্পূর্ণরূপে অনুকরণ করিতে চাই। তাঁহার আর্টে আমরা যেমন সত্য সুন্দর ও মঙ্গল-- তিনেরই সমাবেশ দেখি, আমাদের আর্টেও সেইরূপ সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই। তাঁহার আর্টের প্রতি চাহিয়া থাকিলে কলুষ ভাব না আসিয়া প্রাণে যেমন অব্যক্ত পুলকের সঞ্চার হয়, সসীমের মধ্যে অসীমের অনুভূতি লাভ করি, আমাদের আর্টেও সেই সত্য, সুন্দর ও আনন্দের স্পর্শ আমরা চাই।

মাসিক মোহাম্মদী
১৯২৬

মুসলিম সাহিত্যের গতি ও লক্ষ্য

বাংলা সাহিত্যের বর্তমান ভাবধারায় মুসলমানের জাতীয় সত্তা যে সম্যক রূপে পরিস্ফুট হইতে পারিতেছে না, তাহার জন্য যে স্বতন্ত্র সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজন ঘটিয়াছে, এ কথা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। এ সম্বন্ধে অনুভূতি যাহাদের খুব তীব্র, এমন অনেক মুসলমান ইতিমধ্যেই পাক্কা, 'মোছলমান' বনিয়া গিয়াছেন। দোষ-গুণের বিচার না করিয়া এ কথা অনায়াসেই বলা যায় যে আত্মোপলব্ধি ও আত্ম-প্রতিষ্ঠারই ইহা শুভ লক্ষণ।

বাংলা ভাষা প্রকৃত পক্ষে মুসলমানদের হস্তেই লালিত ও পালিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় মুসলমানদের গাফলাতির ফলে তার তালিম কিন্তু পুরাদস্তুর মুসলিম জনোচিত হয় নাই। পুঁথি-সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় তার ধারা ও আদর্শে কিছুটা ত্রুটি ঘটিয়াছিল। নিজেদের শৈথিল্য, অক্ষমতা ও অদূরদর্শিতার ফলে এ ভাষা কালে কালে তাহাদের হাত ছাড়া হইয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই কতিপয় ইংরাজ পাদ্রী ও হিন্দু পণ্ডিতের মিলিত চেষ্টায় বাংলা ভাষার রূপ পরিবর্তন হইতে থাকে। এতদিন বাংলা ভাষা ছিল আরবী ফারসী শব্দ মিশ্রিত হিন্দু-মুসলমানের সাধারণ ভাষা; কিন্তু এখন হইতে হিন্দু পণ্ডিতেরা আরবী ফারসী শব্দ বর্জন করিয়া ইহাকে সংস্কৃতমুখীন করিয়া তুলিলেন; ফলে মুসলমানদিগের বাংলা জবান কোণ-ঠাসা হইয়া গেল। রাজ অনুগ্রহে পুষ্ট হইয়া হিন্দু বাংলা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; মুসলিম বাংলা ধীরে ধীরে স্তিমিত হইয়া অবজ্ঞার অন্ধকারে মুখ লুকাইল।

এক শতাব্দী পরে মুসলমানদের আবার চৈতন্যোদয় হইতেছে; বাংলা ভাষাকে তাহারা আবার আপনার করিয়া লইবার সাধনায় মগ্ন হইয়াছে।

কিন্তু পরিবর্তিত পরিবেশে অনেকগুলি নূতন সমস্যা আসিয়া দেখা দিয়াছে। জাতীয় সাহিত্য চাই—শুধু এই কথাই আমরা বলিতেছি, কিন্তু সে সাহিত্যের আকৃতি ও প্রকৃতি কিরূপ হইবে, তাহার লক্ষ্য ও আদর্শ কী হইবে, সে সম্বন্ধে কোনো কথাই আমরা বলিতেছি না। কেহ কেহ বলিতেছেন পূর্বের সেই পুঁথি সাহিত্যেই আমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে; কেহ বলিতেছেন পণ্ডিতী বাংলার মধ্যেই প্রয়োজনীয় আরবী ফারসী শব্দ ঢুকাইয়া ইসলামী ভাব-ধারার প্রবর্তন করিতে হইবে; কেহ বলিতেছেন আরবী বর্ণমালা দিয়াই বাংলা ভাষা লিখিতে হইবে। অনুলিখন প্রণালী (transliteration) লইয়াও কেহ কেহ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এই সমস্ত সমস্যা একেবারে উপেক্ষনীয় না হইলেও আসল প্রশ্ন এ নয়। জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইলে তার অর্থ কি, উদ্দেশ্য কি এবং লক্ষ্য কি হইবে সেই বিষয়ে সর্বাগ্রে আমাদিগকে অবহিত হইতে হইবে। নতুবা রাশি রাশি আরবী ফারসী শব্দ ঢকাইলেও অথবা 'স'-কে 'ছ' দিয়া লিখিলেও জাতীয় সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে না। আমাদের জাতীয় সাহিত্যের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে আমাদিগকে তাই প্রথমেই সচেতন হইতে হইবে?

সে লক্ষ্য সে আদর্শ তবে কী হইবে?

এক কথায় বলিতে চাই—অতীত যুগের মুসলিম জ্ঞান-কর্ষণার আদর্শ ও লক্ষ্য যাহা ছিল, আমাদিগকেও সেই আদর্শ ও লক্ষ্যের অনুসরণ করিতে হইবে।

কথাটা হয়তো অস্পষ্ট হইয়া গেল। মুসলিম কাল্‌চারের প্রকৃতি ও লক্ষ্য কী ছিল তাহা যতক্ষণ পর্যন্ত না জানিতে পারিতেছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এ বিষয়ে কোনোই পরিচ্ছন্ন ধারণা জন্মিবেনা।

মুসলিম কালচার

মুসলিম কালচার অর্থে আমরা সেমিটিক কালচারকেই বুঝি। এই কালচারের বৈশিষ্ট্য হইল ধর্ম ও কর্ম, দীন্ ও দুনিয়ার সমন্বয়। দেহকেও সে মানে, আত্মাকেও মানে। এই সমন্বয়ী মনোভাবই ইসলামের বৈশিষ্ট্য।

মুসলিম বা ইসলামী কালচারের প্রকৃতি তাই একপ্রান্তিক নহে; ইহা উদার ও মিলনধর্মী। এর মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা নাই। স্বয়ং রসুলুল্লাহ বলিয়াছেন: 'জ্ঞান-সাধনার জন্য প্রয়োজন হইলে সুদূর চীনদেশে পর্যন্তও যাও।' হজরত আলী রসুলুল্লার জীবদ্দশাতেই আপন প্রাণে সে বাণীর বাস্তব রূপ দান করিলেন। নিজে তো নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করিলেনই, অপর সকলকেও জ্ঞান সংগ্রহের জন্য প্রকাশ্যভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে রসুলুল্লার জীবদ্দশাতেই মদিনা নগরে মুসলমান জাতির বিরাট জ্ঞানকর্ষণার সূত্রপাত হইল।

হজরত মুহম্মদের মৃত্যুর পর বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা লইয়া আরবগণ যখন দিগ্বিজয়ে বাহির হইল, তখন তাহাদের লক্ষ্য শুধু দেশ-বিজয়ই ছিল না, জ্ঞান-আহরণও ছিল তাহাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। জ্ঞানের দিক দিয়া দেখিতে গেলে তৎকালে জগতের অবস্থা যে নিতান্তই শোচনীয় ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। সমগ্র জগৎ তখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। গ্রীস, রোম, মিসর ও ভারতের প্রাচীন জ্ঞান-শিখা তখন নির্বাপিত প্রায়। একমাত্র সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়াতেই প্রাচীন গ্রীসের সেই গৌরবোজ্জ্বল জ্ঞান-প্রদীপ তখনও মিটি মিটি জ্বলিতেছিল। বহু গ্রীক গ্রন্থাবলী সিরীয় ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল এবং তাহাদের ভিতর দিয়াই গ্রীসের জ্ঞানালোক এশিয়া খণ্ডে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

জ্ঞান-আহরণে বহির্গত হইয়াই গ্রীকজাতির এই প্রাচীন জ্ঞান-ভাণ্ডারের সহিত আরবদিগের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটিল। সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া ও পারস্য বিজয়ের পর উম্মাইদ্ খলিফাগণের সময়ে রাজধানী যখন মদিনা হইতে দামেস্ক নগরে স্থানান্তরিত হইল, তখন এইখানে সিরিয়ান পারসিক প্রভৃতি জাতির সঙ্গে তাহাদের পরস্পর পরিচয় হইতে লাগিল। এই সংস্পর্শের ফলেই মুসলমানগণ গ্রীক দর্শন-বিজ্ঞান আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু উম্মাইদ খলিফাগণ প্রতিনিয়ত যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকায়, তাঁহারা জ্ঞানানুশীলনের প্রতি বড় একটা মনোযোগ দিতে পারিলেন না। কাজেই মুসলমানাদিগের নব-জাগ্রত জ্ঞান-পিপাসা তথায় তৃপ্ত হইল না; তাঁহাদের পিপাসা ও ব্যাকুলতা আরও বাড়িয়া গেল।

অতঃপর আব্বাসীয় খলিফাগণের সময়ে যখন বাগদাদে রাজধানী স্থাপিত হইল, তখন হইতেই মুসলমানদিগের প্রকৃত জ্ঞান-সাধনা আরম্ভ হইল। মহামতি খলিফা মনসুরের আদেশক্রমে এরিষ্টট্‌ল্, টলেমী, ইউক্লিড প্রভৃতি গ্রীক পণ্ডিতদিগের দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী আরবী ভাষায় প্রথম অনুবাদ করা হইল। শুধু গ্রীক নহে, ভারতীয় এবং পারসিক জ্ঞান-ভাণ্ডারও উন্মুক্ত করা হইল। তাহাদের মধ্যে যেখানে যতোটুকু গ্রহণযোগ্য ছিল, সমস্তই গ্রহণ করা হইল। ষষ্ঠ খলিফা আল্-মামুনের খেলাফৎ কালে মুসলমানদিগের এই জ্ঞান সাধনা চরমোৎকর্ষ লাভ করিল। বিশ্বের তৎকালীন সমস্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার মুসলমানদিগের করতলগত হইল। দর্শন, বিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যোতিষ, খগোল, ভূগোল, গণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, চিকিৎসাশাস্ত্র, ইতিহাস, কাব্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা প্রভৃতি নানা বিষয়ক জ্ঞানানুশীলনে তাঁহারা প্রবৃত্ত হইলেন। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা—সর্বত্রই যখন গভীর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, সেই সময়ে একমাত্র মুসলমানগণই এইরূপে জ্ঞান-শিখা জ্বালাইয়া অন্ধকারের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিলেন।

শুধু যে বাগদাদেই মুসলমানদিগের এই জ্ঞান-চর্চা সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা নহে। কায়রো, মরক্কো, কর্ডোভা, গ্রাণাডা, সিসিলি, টলেডো প্রভৃতি স্থানেও মুসলমানদিগের বহু জ্ঞানকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল। এইরূপে এশিয়া হইতে আফ্রিকা এবং ইউরোপে সে আলোক ছড়াইয়া পড়িল। ইউরোপের খৃষ্টানগণ নানা দেশ হইতে আসিয়া স্পেনীয় মূরদিগের পাদমূলে বসিয়া জ্ঞান শিক্ষা করিতে লাগিল এবং স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া স্বজাতীয়দিগের মধ্যে উহা প্রচার করিতে আরম্ভ করিল। ইউরোপীয় সভ্যতার এইখানেই সূচনা।

মৌলিক দানের জন্যও মুসলমান জাতি জগতে বড় হইয়া আছে। প্রত্যেক নূতন সৃষ্টির অর্থই হইতেছে সর্বাগ্রে পুরাতনের সন্ধান লওয়া। কি আছে এবং কি নাই, ইহা না জানিয়াই যাহারা নূতন সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের সৃষ্টি সব সময়ে সার্থক হয় না। কাজেই মুসলমানগণ সর্বপ্রথম পুরাতনের সন্ধান লইয়াছিল। তাহা ছাড়া বিশ্ব-মানুষের উন্নতি ও সভ্যতার

এরূপ কোনো জাতি-বিচার করাও চলে না। হাজার যুগের হাজার ধারার পরস্পর মিলন ও সংঘর্ষে মানুষের সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। দেশ, কাল বা জাতিভেদে কোনো সভ্যতাই এককভাবে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। কাজেই মুসলমানগণ কাহার নিকট হইতে কি ধার লইয়াছেন, সে বিচার করিতে গিয়া তাহার বিরাট দানকে অস্বীকার বা খাটো করিবার প্রবৃত্তি আদৌ প্রশংসনীয় নহে। মুসলমানগণ যদি মৌলিক কিছু দান নাও করিতেন, তবুও মাত্র প্রাচীন জ্ঞান-সভ্যতাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য এবং বর্তমান সভ্যতার সহিত তাহার ধারাবাহিকতা (Continuity) রক্ষা করিবার জন্যও জগৎ তাহাদের নিকট চিরঋণী হইয়া থাকিত।

মুসলমানদিগের মৌলিক দান সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বর্তমান জগতের বড় বড় দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক মতবাদ গুলি প্রধানতঃ মুসলমানদিগের নিকট হইতেই ধার-করা। নিউটন, গ্যালিলিও, কোপার্নিকাস, কেপ্‌লার ডেকার্ট, লক, ডারউন, কলম্বস, ভলটেয়ার প্রভৃতি জ্ঞান-জগতের যুগ-প্রবর্তক আবিষ্কারকগণ সকলেই মুসলমানদিগের নিকট ঋণী। বস্তুতঃ মডার্ণ ইউরোপের জন্মদাতাই মুসলমান। ইউরোপের ইতিহাস যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৪৫২) ইউরোপে এক বিরাট নব জাগরণ সংঘটিত হয়। ইহাকে 'Renaissance' বলে। এই Renaissance-এর সঙ্গে সঙ্গেই Modern Europe-এর আরম্ভ। কিন্তু এই জাগরণ সম্পূর্ণরূপে মুসলমান-দিগেরই দীর্ঘ সাত শত বৎসরের জ্ঞান-চর্চার অমৃতময় ফল। ইউরোপকে জাগাইবার জন্য এত দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হইত না—যদি ইউরোপ সোজা-সুজি ইসলামের এই বিপুল জ্ঞানালোকের সংস্পর্শে আসিতে পারিত। আরব গণের দক্ষিণ ফ্রান্স আক্রমণ যদি ব্যর্থ না হইত, তবে এই পথ দিয়াই ইসলাম তাহার আলোক বর্তিকা হস্তে ইউরোপের অন্তর্দেশে গিয়া পৌঁছিতে পারিত, আর তাহা হইলে সাতশত বৎসর পূর্বেই আমরা ইউরোপের এই নব-জাগরণ দেখিতে পাইতাম। মিঃ আমির আলি ঠিকই বলিয়াছেন:—

"Had the Arabs been less keen for the safety of their spoils, less divided among themselves, had they succeeded in

driving before them the barbarian hots of Charles Martel, the history of the darkest period in the annals of the world would never have been written. The Renaissance, civilization, the growth of intellectual liberty would have been accelerated by seven hundred years." —The Spirit of Islam

বর্তমান সভ্য জগৎ মুসলমানদিগের নিকট যে কতোখানি ঋণী, নিম্নের উদ্ধৃতি সমূহ হইতেই তাহা প্রতিপন্ন হইবে :—

"After a chequered career in the east, it (Hellenic culture) passed over to the western Muslim community in Spain, where it had a very specialised development, which finally made a deeper impression on Christian and Jewish thought than on that of the Muslims themselves and attained its final evolution in North-East Italy, where, as an anti-ecclesiastical influence, it prepared the way for the Renaissance."

—Arabic thought and its place in History—by O'Leary.

"The real home of Averroism was the University of Bologna with its sister University of Padua and from these two centres an Averroistic influence spread over all North East Italy, including Venice and Ferrara, and so continued until the 17th century." —O' Leary.

"The adoption of the sign 'zero' (Arabic zifr) was a step of the highest importance."

—Arab Civilization—by J. Hell.

"About the year 820 A.D. the mathematician Alkharrizmi wrote a text book of Algebra in examples and this elementary treatise—translated into Latin—was used by weastern scholars down to the sixteenth century."

—Arab Civilization by J. Hell.

"In the domain of Trignometry the theory of sine, consine and tangent is an heirloom of the Arabs. The brilliant epochs of Peurbach, of Regeomontanus, of Copurnicus

cannot be recalled without reminding us of the fundamental and preparatory labours of the Arab mathematicians."

—J. Hell.

"Two of the oldest Muslim astronomers Al-Faragni and Al-Battani (d. 929) were the preceptors of Europe."

—J. Hell

"Up to the sixteenth century the ninth volume of the works of Razi (Latin Rases) and the canon of Avicina constituted the basis of lectures on Medicine in the Universities of Europe."

—J. Hell

অধিক উদ্ধৃত করা বাহুল্য মাত্র। আশা করি, ইহা হইতেই বুঝা যাইবে বর্তমান বিশ্ব-সভ্যতায় মুসলমানদিগের দান কতোখানি।

এতক্ষণ যে মুসলমানদিগের জ্ঞান-চর্চার ধারাবাহিক ইতিহাসের একটা মোটামুটি বিবরণ দিলাম, ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে—বর্তমান সভ্যতার সহিত অতীত যুগের মুসলিম সভ্যতার যোগসূত্র প্রদর্শন করা এবং মুসলিম জ্ঞান-সাধনার সার্থকথা প্রতিপন্ন করা।

কিন্তু আমার আসল কথাটি এখনও বলা হয় নাই। মুসলমানদিগের এই যে বিরাট জ্ঞান-সাধনা, যাহার ফলে আজ সমগ্র জগৎ আলোকিত, ইহার প্রকৃতি ও লক্ষ্য কী ছিল? কোন্ আদর্শে তাঁহারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন?

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায়—অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় জ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রেও মুসলমানগণ ইসলামের চিরন্তন আদর্শকে অনুসরণ করিয়াছিলেন। 'দীন' এবং 'দুনিয়া'—দুইটিই যে আমাদের কাম্য,—একটিকে ছাড়িয়া একটাকে অবলম্বন করা যে ন্যায়সঙ্গত নহে,—কোরআন-হাদিসের এই শিক্ষাই মুসলমানদিগের সমগ্র জ্ঞান-সাধনাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। সাহিত্য যেমন জাতীয় জীবন-গঠনের উপাদান, তেমনই আবার ইহা জাতীয় জীবনেরই প্রতীক। জাতির ধর্ম, জীবনাদর্শ, সামাজিক রীতিনীতি ও বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করিয়াই সাহিত্য গড়িয়া উঠে। সুতরাং মুসলমানের

জ্ঞান-সাধনাও তাহাদের জাতীয় আদর্শের পথ ধরিয়াই যে চলিয়াছিল, এসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনো অবকাশ নাই। কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি।

জ্ঞান-আবিষ্কারে বহির্গত হইয়া মুসলমানগণ জগতের সমস্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার তন্ন তন্ন করিয়া ফিরিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু গ্রীক বা Hellenic culture-কেই তাঁহারা তাঁহাদের জ্ঞান-সৌধের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারত এবং পারস্য হইতেও তাঁহারা কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা সেরূপ উল্লেখযোগ্য নয়। ভারতীয় গণিত শাস্ত্র হইতে তাঁহারা দশমিক বিন্দু প্রথা (decimal system), জ্যোতির্বিদ্যার কিয়দংশ, হিতোপদেশের গল্প এবং এই শ্রেণীর আরও কিছু গ্রহণ করিয়াছিলেন। পারস্য হইতে কাব্য, শিল্প, সুফীবাদ ও আরও কিছু তামদ্দুনিক উপকরণ ধার লইয়াছিলেন। কিন্তু এই দুই দেশের কোনো সভ্যতাই মুসলমানদিগের জ্ঞান-সাধনার উপর সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই; কোনোটিকেই তাঁহারা আদর্শরূপে গ্রহণ করেন নাই। পক্ষান্তরে পারস্য সভ্যতা মুসলমানদিগের যাদু-স্পর্শে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইয়া নিজের স্বকীয়তা হারাইয়া ফেলিয়াছিল। ভারতীয় সভ্যতা হইতেও ইসলাম বিশেষ কিছুই প্রেরণা লাভ করে নাই, ইহা অতি সত্য কথা। ভারতীয় ষড়দর্শন, বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত—ইহাদের কোনো বিশেষ প্রভাবই মুসলিম কালচারের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একমাত্র গ্রীক কালচারই মুসলমানদিগের মনের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

কিন্তু একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভারতীয়, পারসিক এবং গ্রীক কালচারের নিকট মুসলমানগণ অল্প-বিস্তর ঋণী হইলেও এবং এই তিন বিজাতীয় আদর্শের মুকাবেলায় দীর্ঘ সাতশত বৎসর ধরিয়া জ্ঞান-সাধনা করিলেও তাঁহারা কিন্তু ইসলাম-বিরোধী কোনো আদর্শ বা ভাবধারাকেই গ্রহণ করেন নাই। দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্প-সাহিত্য যেখান হইতেই যে উপকরণ সংগ্রহ করুন না কেন, প্রত্যেকটিকেই তাঁহারা রূপান্তরিত করিয়া ইসলামী বেশে নূতনভাবে জগতের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

ভারত ও পারস্যের কথা তো ধর্তব্যের মধ্যেই নহে; যে গ্রীক বা Hellenic culture-কে তাঁহারা তাহাদের জ্ঞান-সৌধের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার ভিতরেও যাহা কিছু অনৈসলামিক, সমস্তই তাঁহারা সতর্কতার সহিত বর্জন করিয়া চলিয়াছিলেন। গ্রীক দর্শন-বিজ্ঞান এত আলোচনা করিলেও গ্রীক পৌরাণিক কাহিনী (Greek mythology) কিন্তু মুসলমানগণ কোনও দিনই গ্রহণ করেন নাই। এ সম্বন্ধে Draper তাঁহার সুবিখ্যাত "History of the Intellectual Development of Europe" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন:

"The Arabs never translated into their own tongue the great Greek poets, though they so sedulously collected and translated the Greek philosophers. Their religious sentiments and sedate character caused them to abominate the lewdness of our classical mythology and to denounce indignantly any connection between the licentious, impure Olympean Jove and the Most High God as unsufferable and unpardonable blasphemy."

বলা বাহুল্য এই কারণেই ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীও মুসলমানগণ সর্বত্র বর্জন করিয়াছেন। তাছাড়া, পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় সভ্যতার আদর্শের সহিত ইসলামের বহু ক্ষেত্রে মিল থাকিলেও অনেক ক্ষেত্রে আবার বিরোধও রহিয়াছে। পৌত্তলিকতা, অবতারবাদ, পুনর্জন্মবাদ, জাতিভেদ, গোঁড়ামি, কুসংস্কার, সংসার-বিমুখতা বা বৈরাগ্য—ইত্যাদি ভারতীয় সভ্যতার বিশেষত্ব। গ্রীক সভ্যতার বিশেষত্ব কিন্তু তাহা নহে। জীবনকে পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করাই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য। Aristotle-এর কথায় বলিতে গেলে: "To live happily and beautifully" অর্থাৎ সুখে এবং সুন্দরভাবে জীবন-যাপন করাই তাহাদের শিক্ষা ও সভ্যতার আদর্শ। এই আদর্শের সহিত মুসলিম আদর্শের মূলতঃ কোনো বিরোধ তো নাই-ই, বরং চমৎকার সাদৃশ্য আছে। বলা বাহুল্য, এই সব কারণেই মুসলমানগণ গ্রীক কালচারের প্রতি এত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে এখন স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, মুসলমানদের হস্তে যে বিচিত্র জ্ঞান-সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা হেলেনিক কাল্‌চার ও সেমেটিক কালচার এই দুই-এর পরস্পর সংমিশ্রণ। কর্মজীবনের জন্য মুসলমানগণ নানা বিষয়ে গ্রীকদিগের নিকট হইতে জ্ঞান-সংগ্রহ করিয়াছিল, কিন্তু ধর্মজীবনের জন্য তাঁহারা জগতের কাহারও নিকট ঋণী নহে। একমাত্র কোরান-হাদিস হইতেই তাঁহারা প্রেরণা লাভ করিয়াছিল। হেলেনিক কাল্‌চারের বৈজ্ঞানিক ভাব (**scientific spirit**) এবং **Semitic culture**-এর ধর্মভাব (**religious spirit**) মুসলমানদিগের হস্তে চমৎকার মিশিয়া গিয়াছিল ; দীন্‌ এবং দুনিয়ার অদ্ভুত সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। মুসলিম কালচারের ইহাই ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য।

উপসংহার

অতীত যুগের মুসলিম জ্ঞান-কর্ষণার যে আদর্শ ও যে লক্ষ্য ছিল, আমাদিগকেও সেই আদর্শে ও সেই লক্ষ্যে চলিতে হইবে। আমাদের জাতীয় সাহিত্যের দুইটি দিক থাকিবে, একদিকে দীন, অন্য দিকে দুনিয়া। অন্য কথায় আমাদের সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক ভাব এবং ধর্মভাব---দুই-ই থাকিবে; আত্মাও থাকিবে দেহও থাকিবে---এবং এই দু-এর সমন্বয়ে একটা পরিপূর্ণ জীবন্ত সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে। এইরূপে আমাদের জাতীয় জীবন-দর্শনের সঙ্গে আমাদের জাতীয় সাহিত্য একসুরে বাঁধা হইবে। আমাদের লক্ষ্য অনেক উচ্চে। এবার আর **Hellenic culture** নয়, এবার **World culture** বা জগতের সমগ্র জ্ঞান-সাধনার উপরে আমাদের হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। যেখানে যেটুকু বিকৃতি ও বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, তাহাই আমাদিগকে পূরণ করিতে হইবে। ঠিক প্রাচীন যুগের হেলেনিক কালচারের ন্যায় বর্তমান যুগের বিশ্ব-কালচারও নিতান্ত **Godless** বা ধর্মভাবশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। এই ত্রুটি সংশোধনের কাজ হইবে ইসলামের। বিশ্ব-সভ্যতার সহিত আবার আমাদের কালচারের সংযোগ-সাধন করিতে হইবে। এই সংযোগের ফল গতবারের অপেক্ষা এবার আরও ব্যাপক ও মধুর হইবে। সমগ্র জগৎ সে দান হাসি মুখেই গ্রহণ করিবে। সংস্কার, সংরক্ষণ, সমন্বয় ও সংযোজন—এই কয়টিই হইল মুসলিম কাল্‌চারের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য আগেও যেমন ছিল, এখনও তেমনি থাকিবে।

মাসিক মোহাম্মদী

১৯২৭

দার্জিলিং ভ্রমণ

কলিকাতা হইতে রাত্রি দশটায় 'নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসে' দার্জিলিং ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। বহুক্ষণ জাগিয়া ছিলাম; তারপর কখন এক দুর্বল মুহূর্তে ঘুমাইয়া পড়িলাম। সে ঘুম যখন ভাঙিল, তখন দেখি ট্রেন আসিয়া 'ঈশ্বরদি' ষ্টেশনে থামিয়াছে।

কোন্‌খানে যে সূর্যোদয় হইল, মনে নাই। একটু বেলা হইলে মাঠের মধ্যে ও ঘরের কোণে কৃষক নরনারীরদের দেখিতে পাইলাম। তাহাদের অদ্ভুত বেশভূষা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। পুরুষদের পরনে নেংটি, আর মেয়েদের পরনে দেশী তাঁতের একখানি মাত্র মোটা শাড়ী। তাহাদের এই দৈন্যের মধ্যেও এক নূতন সৌন্দর্য দেখিলাম। মনে হইল, ইহাদের বেশ-ভূষা খুব স্বাভাবিকই হইয়াছে। কচি ধান ও পাটের কারুকার্য-করা শ্যামল আঁচল-দোলানো দিগন্তবিস্তৃত মাঠ; সর্বত্র মাটি মায়ের শ্যামল স্নেহে আচ্ছন্ন, কোথাও কৃত্রিমতার লেশমাত্র নাই; এ হেন মাঠের মধ্যে বিলাসব্যসনানুরক্ত সভ্যতাভিমানী কৃত্রিম নরনারীর অবস্থান কি নিতান্তই অস্বাভাবিক ও অশোভন হইত না? মাটির বুকের শ্যামল স্নেহ ভোগ করিবার যোগ্য বেশভূষাই উহাদের।

উভয় পার্শ্বের শোভা দেখিতে দেখিতে বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময় শিলিগুড়ি পৌঁছিলাম।

শিলিগুড়ি হইতে যখন দার্জিলিং-এর গাড়ীতে উঠিলাম, তখন হইতেই মন আমার বাহিরের রূপ ও আনন্দ গ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া

উঠিল। প্রকৃতি আমার চোখের সামনে যে অপরূপ গ্রন্থ খুলিয়া ধরিল, তাহা পড়িবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল।

দুই-তিনটি ষ্টেশন অতিক্রম করিতেই প্রকৃত পাহাড়-অঞ্চল আরম্ভ হইল। তখন বুঝা গেল, গাড়ী ক্রমশঃই ঊর্ধ্বদিকে উঠিতেছে। দুই পার্শ্বে গভীর নিস্তব্ধ অরণ্য; তাহার মধ্যে শাল, শিশু ও অন্যান্য প্রকাণ্ড বৃক্ষসমূহ সগর্বে দণ্ডায়মান। মাঝখান দিয়া পাহাড় কাটিয়া রেলপথ বসানো।

এই রেলপথটি এক অতি আশ্চর্য কীর্তি। পাহাড়ের ধার দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া ঘুরিয়া-ফিরিয়া কি সুন্দর ভাবেই না রেল-লাইন চলিয়া গিয়াছে! স্থানে স্থানে লাইন পাহাড়ের এত কিনারায় স্থাপিত যে, গাড়ি হইতে নীচের দিকে তাকাইতেই ভয় হয়। কি গভীর খাত! পাতাল-পুরীর ধারণা এইখানে যেন মনের মধ্যে দানা বাঁধিয়া উঠে। এই খান দিয়া যাইবার সময় প্রকৃতির কোনো দুষ্ট মেয়ে যদি পাশে দাঁড়াইয়া গাড়িখানাকে একটু ধাক্কা দেয়, তবে একটা কী বিরাট কৌতুকই না সেই গভীর অরণ্যের মধ্যে সংঘটিত হইয়া যায়! যাত্রিপূর্ণ গাড়িখানার কী দশা হয় তখন! পত-নোন্মুখ নরনারীর মিলিত কন্ঠে কী করুণ আর্তনাদই না ফুটিয়া উঠে! মনের ভিতর এরূপ দুষ্ট খেয়াল যে না হইতেছিল, এমন নয়। ভাবিতে-ছিলাম, গাড়িখানা যায় পড়িয়া যাক্! সেই সময়ে প্রকৃতির কৌতুক-লীলা আমিও খানিক উপভোগ করিয়া লইব। এতবড় একটা দুর্ঘটনাতেও কি চিরমৌনা প্রকৃতি তাহার স্বভাব ভুলিয়া অজ্ঞাতসারে একটা আর্তনাদ করিয়া উঠিবে না?

গাড়ি যতো অগ্রসর হইতে লাগিল, ততোই মনে হইতে লাগিল, প্রকৃতির গুপ্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেছি। পাষাণ-প্রাকারের মধ্যে প্রকৃতির এ কী গম্ভীর সৌন্দর্য্যের লীলাখেলা! কী মধুর শ্যামলিমা! সত্যই এ যেন প্রকৃতির মর্মর-প্রাসাদ! বাহিরে পাষাণ-প্রাচীর, কিন্তু অন্তঃপুরের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে নব নব সৌন্দর্য্যের অপূর্ব বিলাস। মাঝে মাঝে ঝরণাগুলি বহু ঊর্ধ্ব হইতে অবলীলাক্রমে উপল-বীথির উপর দিয়া মর্মর-ধ্বনিতে কী সহজ নৃত্যেই না নিম্নপথে নামিয়া যাইতেছে! যেরূপ বেগে ঝরণা-ধারা নিম্নদিকে ছুটিয়া চলিতেছিল,

তাহার চেয়েও দ্রুততর বেগে আমার মন ঐ ঝরণা-পথ বাহিয়া ঊর্ধ্ব দিকে উহার উৎস-মুখে ধাবিত হইতেছিল। কোন্ গোপন গহনে প্রকৃতির সেই স্নেহ-ধারার উৎসব চলিয়াছে? কোথায় বসিয়া সে এত শোভা আর এত করুণা দিকে দিকে ছড়াইয়া দিতেছে?

সমস্ত পথ মনে হইতেছিল কোন্ এক জাগ্রত স্বপ্নপুরীর মধ্য দিয়া চলিয়াছি। যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই দেখি সবুজের কাজল-মায়া তরু-পল্লবে পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। কোথাও বা শুভ্র মেঘের ঘনিমা, কোথাও বা আলো-ছায়ার লুকোচুরি খেলা। তাহারা কি জীবন্ত স্বপ্ন, না অপর কিছু,—ভাবিয়াই পাই না। যে রহস্যময়ীর রূপের আভাস প্রতিনিয়ত নয়ন-সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার স্বরূপ কিছুতেই যেন ধরিতে পারি না। সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া মনে করি, হয়তো ঐখানে পৌঁছিলে তাহার দেখা ভালো করিয়া মিলিবে, কিন্তু যখন সেখানে পৌঁছি, তখন মনে হয়—যেন পিছন দিকে তাহার অনেকটা ছাড়িয়া আসিলাম, আবার সম্মুখে খানিকটা বাড়িয়াও গেল। দৃশ্যের বিশালতার তুলনায় দুই চক্ষুর দৃষ্টি-সংকীর্ণতা যে কতো বেশি, তাহা সেইদিন বেশ বুঝা গেল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে দার্জিলিং পৌঁছিলাম।

পরদিন ভোর বেলা আকাশ খুব পরিষ্কার ছিল। চিরতুষারাবৃত কাঞ্চনজংঘার শিখরে শিখরে অরুণ কিরণ পতিত হওয়ায় কী অলৌকিক দৃশ্যই না ফুটিয়া উঠিল। ঐখানেই কি প্রকৃতির গুপ্ত ভবন? ঐ যে নানা রঙের বৈচিত্র্য, উহা কি সেই মর্মর-সৌধেরই শিল্প-প্রহেলিকা? কতো সুরক্ষিত ঐ ভবন। বৈদেশিক আক্রমণের ভয় নাই; এরোপ্লেন, ডিনামাইট, সবই সেখানে হার মানিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

বার্চহিল, অবজারভেটরি হিল, জালা পাহাড়, ভিক্টোরিয়া জল-প্রপাত ইত্যাদি স্থানসমূহ একে একে বেড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। সবই যেন মায়াপুরীর এক খানি স্বপ্নচ্ছবি! ঐ যে কাঞ্চনজংঘা, ঐ যে ধবলগিরি, ঐ যে এভারেষ্ট, ঐ যে তিব্বত, ঐ যে চীন, ঐ যে নেপাল—সমস্তই যেন এক স্বপ্নের রাজ্য। সন্ধ্যার প্রাক্কালে অস্তমিত সূর্যের

ম্লান আভায় যে দৃশ্য ফুটিয়া উঠে, তাহা প্রাণের মধ্যে আনন্দ, ভয় ও বিস্ময় উৎপাদন করে। এই সময় অবজারভেটরি হিলের উপর হইতে কাঞ্চনজংঘার দিকে চাহিয়া থাকিলে মনে এক অব্যক্ত ভাবের উদয় হয়। নেপাল এবং সিকিম অঞ্চল হইতে সন্ধ্যাপূজার ঘন্টাধ্বনি অস্পষ্ট হইয়া ভাসিয়া আসে, সেই সঙ্গে কোথাও বা নাম-না-জানা বনপাখীর করুণ তান মিশিয়া যায়। প্রকৃতির এই গোধূলিবেলার ম্লান পাণ্ডুর ছবি দেখিলে প্রাণের মধ্যে কিসের যেন গোপন ব্যথা ঘনাইয়া আসে।

দার্জিলিং-এর আবহাওয়ার প্রধান বিশেষত্ব—ইহার কুয়াসা। সব সময়েই কোনো না কোনো স্থানে ইহার উৎপত্তি হইতেছে। দূর পাহাড়ের বৃক্ষ ও তরুলতার মাথার উপর দিয়া যখন শুভ্র পুঞ্জীভূত কুয়াসা ধীরে ধীরে উত্থিত হইতে থাকে, তখন কি সুন্দরই না দেখায়। মনে হয় যেন প্রকৃতির গুপ্ত অন্তঃপুরে মহা ধুমধামে রান্না চড়িয়াছে; তাহারই ধূম্ররাশি তরুশিরের উপর দিয়া আকাশে উঠিতেছে। আহা, সেই মহাভোজের আনন্দ-উৎসবে যদি আমার দাওয়াৎ আসিত।

অবজারভেটরি হিলের উপরে মহাকাল-মন্দির একটি দর্শনীয় বস্তু। এখানে আসিলে প্রাচীন বৌদ্ধ-যুগের কথা মনে পড়ে। উহার কিঞ্চিৎ নিম্নে একটি সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইলাম। সুড়ঙ্গের মুখ সুস্পষ্টরূপে দেখা যায় বটে, কিন্তু ভিতরে অধিক দূর দৃষ্টি চলে না; ঘন অন্ধকারে সমস্ত পথ সমাচ্ছন্ন। এই সুড়ঙ্গ-পথ কোথায় শেষ হইয়াছে, কেহ বলিতে পারে না। শুনা যায়, একবার এক সাহেব না-কি এই সুড়ঙ্গ-পথ আবিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যে উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু আর ফিরিয়া আসেন নাই। মানুষের মৃত্যু-দ্বারও অবিকল এইরূপ। এপারে জীবনের চঞ্চল নৃত্য, ওপারে ঘন অন্ধকার। সেই পথের যাত্রীদল কোনো দিনই ফিরিয়া আসে না; সেই পথের শেষ কোথায়, তাহাও কেহ বলিতে পারে না।

দুই-তিন দিন পরে এক দিন এক বন্ধুর সহিত টাইগার হিলে বেড়াইতে গেলাম। এইখান হইতেই সূর্যোদয়ের অপূর্ব দৃশ্য এবং হিমালয়ের সর্বোচচ শিখর এভারেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। টাইগার

ছিল 'ঘুম' ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে। আমরা 'ঘুম' পর্যন্ত ট্রেণে গিয়া সেখান হইতে ঘোড়া লইলাম। কি ভীষণ জঙ্গলের মধ্য দিয়া সেই পথ। বাঘ-ভালুকের ভয় অপেক্ষা জঙ্গলের ভয়ই যে প্রথম আমাকে পাইয়া বসিল। সৌন্দর্যও কি এত ভয়ংকর হয়।

টাইগার হিলে পৌঁছিলাম, কিন্তু পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্দিকে কুয়াসা এরূপ নিবিড়ভাবে ঘনীভূত হইয়া আকাশ-পৃথিবী আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল যে, মনে হইল যেন সমস্ত প্রকৃতি একটা ধবল অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল। কোথাও আর দৃষ্টি চলিল না,—সমস্ত একাকার। শুধু তাই নয়, মুষলধারে বৃষ্টিও আরম্ভ হইল। কি করি, মনের দুঃখে সেই বৃষ্টির মধ্যেই নিরাশ প্রাণে ফিরিয়া আসিলাম। সেখানকার অবজারভেটরি ঘরটার এক স্থানে লিখিয়া রাখিয়া আসিলাম —

"হায় কুহকী, শুধুই ফাঁকি।
তোমার দেখাই রইল বাকি।"

[illegible]ীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা
১৯২৭

কাব্য-সমালোচনা

সমালোচক হওয়া সোজা কথা নয়। এর মতো দায়িত্বপূর্ণ কাজ আর নাই বলিলেই চলে। এ কাজের যোগ্যতা অর্জন করিতে হইলে গভীর জ্ঞান, ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন। কবি যাহা লিখিবেন, কবি যাহা আঁকিবেন, সমালোচক আপন প্রাণের মধ্যে সে সব তো আয়ত্ব করিবেনই, তা ছাড়া সে সম্বন্ধে মতামত দিবার উপযোগী আরও বেশী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাহাকে অর্জন করিতে হইবে। কবি যেখান হইতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, যেখান হইতে কথা বলিবেন, সমালোচক তারও উর্ধ্বে উঠিবেন; নতুবা কবির সৃষ্টির স্বরূপ তিনি সম্যকরূপে বুঝিতে পারিবেন না। কাব্য-সমালোচনার জন্য তাই কবি-প্রাণের নিতান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় যার তার হাত দিয়া সমালোচনা বাহির হইলে ফলে যাহা হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। বস্তুতঃ খুব কম লোকেই সাহিত্য সম্বন্ধে কথা বলিবার যোগ্যতা রাখে। বিখ্যাত ইংরাজ সমালোচক John Moulton ঠিকই বলিয়াছেন—

> "One who takes up Physiology or History can hardly escape learning something of these Sciences. But of those who understand themselves to be engaged in the study of literature, I believe that the great majority never reach it, but remain stranded in what are its outskirts."

জ্ঞান এবং যোগ্যতা অর্জন ছাড়াও সমালোচককে ধীর-স্থির এবং পঠন-সহিষ্ণু হইতে হইবে। নিরপেক্ষ মন লইয়া আলোচ্য বিষয় একাধিক বার তাঁহাকে পাঠ করিতে হইবে। অন্ততঃ তিনবারের কম কোনো পুস্তক পড়িয়া সে সম্বন্ধে মতামত দিতে যাওয়া নিতান্তই অসঙ্গত। কোনো বিখ্যাত সমালোচকও এই কথাই বলেন—

"Always read a book three times, the first time to see what it is all about, the second time to see what it says, the third time in an attitude of friendly hostility."

কিন্তু বড়ই লজ্জার বিষয়, আমাদের আজকালকার অনেক সমালোচকই কোনো বই ভালো করিয়া না পড়িয়াই, এমন কি একবারও না পড়িয়া সমালোচনা লিখিতে বসেন। তার ফল এই হয় যে, কোনো কবির কাব্য সমালোচনা করিতে গিয়া হয়তো তাহার মধ্যে কোনো কিছুই প্রশংসার মতো পান না, নয়তো এমন এক এক স্থান উদ্ধৃত করিয়া 'কি সুন্দর।' ইত্যাদি বিশেষণ লাগাইয়া দেন—যাহা প্রকৃতপক্ষে সেরূপ বাহবা পাইবার যোগ্যই নয়।

এতক্ষণ সমালোচক ও তাঁহার দায়িত্ব সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিলাম। এইবার সমালোচনা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কিন্তু তাহা করিতে হইলে, কাব্য কি এবং কাব্য-সমালোচনার আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে আমাদিগকে সজাগ হইতে হইবে। নিতান্ত দুঃখের সঙ্গেই বলিতে হইতেছে যে, আমাদের কাব্য-সমালোচকদের অনেকেই এ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ রূপে সজাগ আছেন বলিয়া মনে হয় না। কাব্য সম্বন্ধে তাঁহাদের যে-ধারণা তাহা অনেক স্থলেই ভ্রান্ত। এতদ্ব্যতীত একদেশদর্শিতা ও পক্ষপাত দোষ-দুষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের সমালোচনা নিতান্তই অপাঠ্য হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহাদের লেখায় "বিশ্ব সাহিত্য" "সৌন্দর্য-তত্ত্ব" "যুগপ্রবর্তক প্রতিভা" "সত্য-শিব-সুন্দর" প্রভৃতি বহু বড় বড় কথার চটক থাকে বটে, কিন্তু উহার ভিতরে সারবত্তা নাই।

কাব্য কি? আমাদের সমালোচকদের মতে "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং" —অর্থাৎ যে বাক্যে রস বা আনন্দ আছে তাহাই কাব্য। কাব্য সম্বন্ধে ইহাই

তাহাদের ধারণা। আনন্দ এবং সৌন্দর্যকে মাপকাঠি করিয়াই তাঁহারা কাব্য-যাচাই করেন। এইখানেই করা হয় প্রথম ভুল। প্রকৃত কাব্যে আনন্দ রস বা সৌন্দর্য যে থাকিবে, তাহাতে কোনো সন্দেহই নাই, কিন্তু তাই বলিয়া যাহাই আনন্দ দান করিবে তাহাই হইবে কাব্য—ইহা অতি মারাত্মক ভুল।

কয়েকটি কারণে শুধু আনন্দ (pleasure) কাব্যবিচারের মানদণ্ড হইতে পারে না। প্রথমতঃ কাহার আনন্দকে মাপকাঠি ধরিয়া বিচার করিতে হইবে? সমালোচকের? না লেখকের? না পাঠকের? না জাতির? —না অন্য কাহারো? আর সে আনন্দ কোন্ শ্রেণীরই বা আনন্দ? ইন্দ্রিয়ের আনন্দ (Sensual pleasure), না নীতি বা জ্ঞানের আনন্দ (moral or intellectual satisfaction)? আনন্দ দ্বারা কাব্যবিচার করিতে গেলে কাব্যের কোনো standard বা আদর্শ থাকে কি? একজন বলিবেন,—"এটা কোনো কবিতাই হয় নাই, কারণ ইহার মধ্যে আনন্দের সন্ধান পাইলাম না।" আর এক জন বলিবেন,—"কবিতাটি চমৎকার হইয়াছে, আমার খুব ভালো লাগিয়াছে।" এ ক্ষেত্র কাহার সমালোচনা ঠিক বলিয়া গ্রহণ করিব? কাজেই দেখা যাইতেছে—শুধু আনন্দ বা রস কাব্য-বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হইতে পারেনা।

সুখের বিষয়, পাশ্চাত্য মনীষী ও সমালোচকবৃন্দ কবি ও কাব্য সম্বন্ধে এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন:

Plato কবিকে "Interpreter of Divinity" এবং কাব্যকে "Divine phantoms and shadows of Reality" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

Aristotle কাব্যকে "Authentic tidings of invisible things" বলিয়াছেন এবং যদিও আনন্দদানই কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তবুও যে-সে আনন্দের কথা তিনি বলেন নাই; নৈতিক আনন্দের (Moral satisfaction) কথাই বলিয়াছেন।

Kant বলেন "True poetry must strive to present virtue and intellectual truth in sensible form."

Collins বলেন "The chief office of poetry is not merely to give amusement......but that, if it includes this mission,

it includes also a mission far higher—the revelation, namely of ideal truth."

বস্তুতঃ বিশ্বের সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই এই কথা বলিবেন। শুধু আনন্দ (**pleasure**) বা বাহিরের সৌন্দর্যকে কেহই বড় করিয়া দেখেন নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজকাল এক শ্রেণীর সাহিত্যিক সাহিত্যে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতেছেন। তাহাদের মত এই যে, "আর্ট ধর্মের নির্দেশ, সমাজের বিধি-নিষেধ বা সভ্যতার ক্রম-বিকাশের কোনো তোয়াক্কা রাখে না।" এই শ্রেণীর কবি ও সমালোচক আর্টকে যে রঙীন মূর্তিতে দেখিয়া থাকেন, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আর্ট তাহা নহে। আর্ট যে ধর্ম এবং নীতিজ্ঞান বর্জিত আনন্দ-বিলাসের সামগ্রী, কোনো মনীষীই সে কথা বলেন নাই। মাইকেল এঞ্জেলো (**Michael Angelo**) র‍্যাফেল (**Raphel**) প্রভৃতি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণও তাঁহাদের আর্টের সীমানা হইতে নীতি ও ধর্মকে বাহির করিয়া দেন নাই। **Ruskin, Tolstoy** প্রভৃতি আর্টের শ্রেষ্ঠ সমালোচকগণও সেরূপ মত প্রকাশ করেন নাই।

সমালোচনা চারি প্রকার:—(১) **Inductive Criticism** অর্থাৎ কবি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া; (২) **Speculative Criticism** অর্থাৎ কবি যাহা বলিয়াছেন, তাহাকেই ভিত্তি করিয়া নানা দার্শনিক তত্ত্বের দ্বারা সেই ভাবটিকে পরিবর্ধন করিয়া বলা; (৩) **Judicial Criticism** অর্থাৎ যে সব বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুন আছে, তদনুসারে কবিদের উপর এবং তাহাদের কাব্যের উপর রায় প্রকাশ করা এবং (৪) **Subjective criticism** অর্থাৎ স্বাধীন সমালোচনা। কবি এবং কাব্যকে কেন্দ্র করিয়া এই সমালোচনা নিজেই একটি স্বতন্ত্র সাহিত্য-সৃষ্টি।

দুঃখের বিষয়, আমাদের অধিকাংশ সমালোচনাই তৃতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ **Judicial criticism**-এর অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণীর সমালোচনা খুব নিকৃষ্ট ধরনের। উহাতে কোনো উন্নত চিন্তাশালতার পরিচয় থাকে না। কোন্ কবি ভালো বা মন্দ এবং কোন্ কবির কি করা উচিত ছিল, এই সব কথা নিজের যুক্তি-তর্ক দিয়া বুঝাইয়া দেওয়াই উক্ত সমালোচনার প্রধান

কাজ। বিচারকের মন যেমন জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, একপক্ষে না একপক্ষে ঝুঁকিয়া পড়ে, এই শ্রেণীর সমালোচকের মনও বিচার করিতে বসিয়া সেইরূপ কাহারও না কাহারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিয়া বসে; কাজেই তাঁহার সমালোচনায় প্রকৃত কাব্যের আলোচনা ও বিশ্লেষণ যতোটা থাকুক বা না থাকুক, তাহার নিজের মানসিকতার আলোচনা বেশ ভালো করিয়াই ফুটিয়া উঠে। তাই এই শ্রেণীর সমালোচনা পড়িলে লেখককে রাখিয়া সমালোচকের সম্বন্ধেই বেশী ওয়াকিফ্‌হাল হওয়া যায়। কোনো বিখ্যাত ইংরাজ সমালোচক সত্যই বলিয়াছেন---

"Judicial criticism is a revelation of the critic much more than of the literature."

অর্থাৎ: বিচার-মূলক সমালোচনায় কবি বা তাঁর কাব্যের পরিচয় অপেক্ষা সমালোচকের নিজের পরিচয়ই বেশি থাকে।

এই শ্রেণীর সমালোচনা দ্বারা সাহিত্যের কোনো উন্নতি সাধিত হয় না; বরং অনেক সময় ক্ষতিই হইয়া থাকে। তাহার কারণ সমালোচক তাঁহার ব্যক্তিগত রুচি এবং মতের অনুযায়ী করিয়া কবিকে গড়িতে চান; কবির সৃষ্টির সহিত নিজের বা পাঠকের মনের যোগ স্থাপনা করেন না। নিজের রুচিকে বড় করিয়া তোলেন বলিয়া কবির সৃষ্টি আড়ালে পড়িয়া যায়। কবির প্রতিভার প্রতি এ এক নিষ্ঠুর আঘাত। ইংরাজ কবি **Keats** এই ধরনের সমালোচনা সহ্য করিতে না পারিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন; অথচ বর্তমান যুগে তিনি শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত। এরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা যদি বাহির না হইত, তবে হয়তো **Keats** আরো কতো সুন্দর সৃষ্টি জগতকে উপহার দিয়া যাইতে পারিতেন।

যাহারা সমালোচনা করিতে বসিয়া লেখনীকে তরবারিতে পরিণত করেন, তাহারা **Keats**-এর এই শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া লজ্জিত হইবেন। কোন্‌টি ভালো, কোন্‌টি মন্দ, এ সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামতের যে কতোটুকু মূল্য, **Keats** জগতের সম্মুখে স্পষ্টরূপে তাহা দেখাইবার জন্যই যেন এমন-ভাবে আত্মদান করিয়া গিয়াছেন।

যাক্, আমাদের কথা হইতেছে **Judicial criticism** সম্বন্ধে। অবশ্য

সমালোচনায় যে ভালো-মন্দের বিচার মোটেই থাকিতে পারিবে না, তাহা নহে; কিন্তু সেই বিচার করিতে হইলেও Inductive criticism -এর উপরেই তাহার ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে; অর্থাৎ লেখক কি বলিতে চাহিয়াছেন, অগ্রে তাহাই সুস্পষ্ট করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের সমালোচকেরা তাহার আবশ্যকতা মোটেই অনুভব করেন না।

প্রত্যেক কবিতারই দুইটি করিয়া অঙ্গ আছে; এক তাহার বহিরঙ্গ, আর এক তাহার অন্তরঙ্গ বা প্রাণবস্তু। কবিতায় ছন্দ এবং মাধুর্য অপরিহার্য বটে, কিন্তু উহাই কবিতার প্রাণ নহে। যে-সমস্ত বিশ্বকবি জগতে অমর হইয়া আছেন, তাঁহারা শুধু ছন্দের জন্য নয়—বাণী বা message-এর জন্যই আছেন। বাণীর আপন মাধুর্যে ছন্দের শোভা নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। বিখ্যাত ইংরাজ সমালোচক Symond ঠিকই বলিয়াছেন—

> "Though style is an indispensable condition of success in poetry, it is by matter and not by form that a poet has to take his final rank."

অর্থাৎ: ষ্টাইল যদিও কাব্যের অপরিহার্য অঙ্গ, তবু শেষ পর্যন্ত বিষয়বস্তু দিয়াই কবির বিচার হইয়া থাকে।

কবি এবং সমালোচকদের একথা মনে রাখা দরকার।

ইসলাম-দর্শন
১৯২৭

শক্তি-পরীক্ষায় মুসলমান

শক্তি-পরীক্ষায় মুসলমান জাতি যে-অপূর্ব নিপুণতা দেখাইয়াছে, জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। বর্তমান যুগের যুদ্ধ-প্রণালীর কথা বলিতেছি না, কারণ এ যুগে বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্র এবং ছল-চাতুরীর উপরেই যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ভর করে। প্রকৃত বীরত্বের স্থান আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে নাই বলিলেই চলে। কিন্তু অতীত কালে যে সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহে সত্যিকার শক্তি-পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, সেখানে মুসলমানেরা অমানুষিক শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করিয়াছে। কেবলমাত্র সংখ্যাধিক্যের মধ্যেই যে শক্তি নিহিত থাকে না, শক্তি যে অন্তরের জীবনের, আর এই অন্তরেব শক্তি লইয়া অতি অল্প-সংখ্যক হইয়াও যে বিপক্ষ দলের বহুগুণ সেনাকে অবলীলাক্রমে পরাস্ত করা যায়, মুসলমান জাতিই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল।

মুসলমান জাতির দিগ্বিজয়ের ইতিহাস পাঠ করিলে এই কথাই সর্বাপেক্ষা বড় হইয়া মনে জাগে যে, সত্য যদি শক্তির ভিত্তি হয় আর ভিতর হইতে যদি প্রেরণা জাগে, তবে পৃথিবীর কোনো শক্তিই সে শক্তির সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না। দুর্নিবার স্রোতের মুখে তৃণস্তূপের মতো তাহা কোথায় ভাসিয়া যায়। মহাপুরুষ হজরত মুহম্মদের জীবন-সাধনার প্রতি লক্ষ্য করিলে এ কথার সত্যতা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। একটা মানুষের পদতলে সমগ্র বিশ্বের সমবেত শক্তি কেমন করিয়া মাথা নোয়াইল? কোন্ ভয়ে কোন্ অস্ত্রাঘাতে শত্রুপক্ষ অমনভাবে হার মানিল? শত চেষ্টা সত্ত্বেও কেন তাহারা হজরতের গতিপথে বাধা দিতে সমর্থ হইল না? কোথায় ছিল হজরতের তরবারি, কোথায় ছিল তাঁর সেনাবাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র বা

রসদপত্র? একান্তরূপে একা---নিঃসহায়, দুর্বল, অস্ত্রহীন শত্রুপরিবেষ্টিত একটি মানুষ জগত জোড়া মিথ্যার বিরুদ্ধে অভিযান করিতেছেন। শত প্রকারের অত্যাচার চলিতেছে, প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র চলিতেছে, ভ্রূক্ষেপ নাই; মহাপুরুষ তবুও আপন লক্ষ্যে অবিচল। তিনি যে সত্য-সাধক, সত্য যে জয়-যুক্ত হইবেই, মিথ্যা যে কিছুতেই জয়ী হইতে পারিবে না---এই দৃঢ় আত্ম-বিশ্বাস শত নিরাশার মধ্যেও তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিতেছে।

হজরতের যে সাধনা, প্রকৃত মুসলমানেরও সেই সাধনা। তাই দেখিতে পাই, হজরতের অনুসরণে বহু মুসলিম বীর জীবনে বহু সফলতা অর্জন করিয়া গিয়াছেন। জগতের ইতিহাসে মুষ্টিমেয় আরব সেনা এশিয়া ইউরোপ ও আফ্রিকার মতো তিনটি মহাদেশে যুদ্ধ করিয়া সর্বত্র বিজয় লাভ করিতেছে, এ দৃশ্য দেখিবার মতো। একদিকে তিনটি মহাদেশের লক্ষ লক্ষ সুশিক্ষিত সেনা-বাহিনী এবং বিপুল রণ-সম্ভার অপর দিকে নগণ্য মুষ্টিমেয় আরব সন্তান! অথচ আশ্চর্যের বিষয়, এই নগণ্য মুসলিম বীরদলই প্রায় সমভাবে বিজয়ী। এ কোন্ শক্তি, যাহা সংখ্যার মধ্যে, অস্ত্রের মধ্যে বা দুর্গপ্রাকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়! ঈমানের দুর্জয়শক্তি এ! এর কাছে অন্য সব শক্তিই নতশির।

নিম্নে আমরা কতিপয় ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা এই কথা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইব। মুসলিম বীরপুরুষগণ যে কিরূপ অসম অনুপাতে যুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, অথচ তাঁহাদের বিজয়-লাভের অনুপাত যে সেই তুলনায় কতো বেশী, পাঠক তাহা লক্ষ্য করিবেন:

বদর যুদ্ধ

বদর যুদ্ধই বিধর্মীদিগের সহিত ইসলামের সর্বপ্রথম যুদ্ধ। হজরত মুহম্মদ স্বয়ং এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। এই যুদ্ধে কোরেশ সেনার সংখ্যা ছিল সহস্রাধিক; তাহাদের সকলেই নানা অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। পক্ষান্তরে নবদীক্ষিত মুসলিম সৈন্যের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন। তাহাদের বেশভূষা ও অস্ত্রপাতিও বিশেষ কিছু ছিল না। কিন্তু এই যুদ্ধে কোরেশরাই ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে এবং অনেকে মুসলমানদের হস্তে বন্দী হয়। কোরেশদের নিহত সংখ্যা ৭০ আর মুসলিমদের মাত্র ১৬।

খৃষ্টানদিগের সহিত যুদ্ধ

দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া মুসলমানদিগকে যে সমস্ত ভীষণ যুদ্ধের সম্মুখীন হইতে হয়, তাহার মধ্যে এয়ারমুকের যুদ্ধ অন্যতম। এই যুদ্ধে রোমক সৈন্যের সংখ্যা ছিল ২,৪০,০০০ এবং মুসলিম সৈন্যের সংখ্যা মাত্র ৪০,০০০। কিন্তু এই ভীষণ যুদ্ধে রোমানগণই সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। তাঁহাদের নিহতদের সংখ্যা ১,৪০,০০০, অথচ মুসলমানদের নিহতদের সংখ্যা মাত্র ৩০০০। ---(History of the Saracens)

কিন্তু গীবন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ---"Decline and Fall of the Roman Empire" নামক গ্রন্থে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার খৃষ্টান সৈন্যের হিসাব দেওয়া হইয়াছে। আবার Ockly লিখিয়াছেন :—

"সেনাপতি আবু ওবায়দা খলিফা ওমরের নিকট যুদ্ধ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন---আমরা এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার খৃষ্টান সৈন্য নিহত করি এবং চল্লিশ হাজার বন্দী করি।"

আজনাদিনের যুদ্ধে রোমক শাসনকর্তা ওয়ার্দানের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৭০,০০০ এবং মুসলমানদিগের সংখ্যা ছিল ৪৫,০০০। এই যুদ্ধেও রোমকগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। প্রায় ৫০,০০০ খৃষ্টান সৈন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত হয়। কিন্তু মুসলমানদিগের নিহতের সংখ্যা মাত্র ৪৭০ জন। (Gibon : Decline and Fall of Roman Empire)

মিঃ আমীর আলি এই যুদ্ধ সম্বন্ধে বলেন---"Their (Roman) army was entirely destroyed; only a few escaped with their chief." —অর্থাৎ রোমান সৈন্যদল প্রায় সম্পূর্ণরূপেই ধ্বংস হইয়াছিল; তাঁহাদের সেনাপতি সহ অল্পসংখ্যকই রক্ষা পাইয়াছিল।

ত্রিপলি যুদ্ধ

হজরত ওসমানের শাসনকালে মিসরের শাসনকর্তা আবদুল্লাহ ৪০,০০০ আরব সেনাকে উত্তর আফ্রিকার মরুভূমির মধ্যে পরিচালিত করেন। যথা-সময় রোমান শাসনকর্তা গ্রেগরিয়াস ১,২০,০০০ হাজার সৈন্য লইয়া বাধা প্রদান করিতে আসেন। ত্রিপলির যুদ্ধে রোমকগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। (Decline and Fall of the Roman Empire)। খলিফা প্রথম অলিদের সময়

শাসনকর্তার অনুমতি লইয়া মহাবীর তারেক মাত্র ৭000 সৈন্য লইয়া জিব্রাল্টারে অবতরণ করেন। শত্রুগণ বাধা প্রদান করিতে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়। অতঃপর তারেক টলেডো অভিমুখে অগ্রসর হন। স্পেন-সম্রাট রডারিক ১,00,000 লক্ষ সৈন্য লইয়া বাধা দান করেন। মেডিনা সিডোনিয়ার যুদ্ধে গথগণ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয় এবং রডারিক পলায়ন করিতে যাইয়া গোয়াডেলেট নদীগর্ভে নিমজ্জিত হন।

স্পেন বিজয়

রোমান সম্রাট ডাইওজেনিস দুই লক্ষ সৈন্য লইয়া এশিয়া আক্রমণ করিতে আসিতেছেন শুনিয়া তুর্ক সুলতান আল্প আরসলান মাত্র চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত সীমান্ত অভিমুখে ধাবিত হন। এই যুদ্ধে ডাইওজেনিস সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া কতিপয় অপমানজনক সর্ত্তে সন্ধি করিতে বাধ্য হন। (ইসলামের ইতিহাস)।

তুর্ক-সীমান্তে যুদ্ধ

পারসিকদিগের সহিত যুদ্ধ

কাদেসিয়ার চিরস্মরণীয় যুদ্ধে পারসিক সৈন্যসংখ্যা ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার এবং আরব সৈন্যের সংখ্যা ছিল ১২ হইতে ৩0 হাজারের মধ্যে। এই যুদ্ধে পারসিকগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে। ত্রিশ হাজার পারসিক নিহত হয়, পক্ষান্তরে মুসলমান-দিগের নিহতের সংখ্যা মাত্র সাত হাজার।

কাদেসিয়ার যুদ্ধ

—Historians' History of the World, also Decline and Fall of the Roman Empire.

ভারতবাসীর সহিত যুদ্ধ

ভারতের সর্বপ্রথম মুসলমান আক্রমণকারী মহাবীর মোহাম্মদ বিন্ কাসিম বস্রার শাসনকর্তা হাজ্জাজের অনুমতিক্রমে মাত্র ৬000 সৈন্য লইয়া সিন্ধু-প্রদেশ আক্রমণ করেন। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ২0 বৎসর মাত্র। সিন্ধুরাজ দাহিরের সহিত 'আলোরে'

সিন্ধু বিজয়

বিন-কাসিমের সাক্ষাৎ হয়, দাহিরের সৈন্য-সংখ্যা ছিল ৫০,০০০। কিন্তু যুদ্ধে দাহির সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হন। (Elphinstone's History of India)

মুহম্মদ ঘোরীর সহিত যখন দ্বিতীয়বার পৃথ্বিরাজের যুদ্ধ হয়, তখন পৃথ্বিরাজের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩,০০,০০০ অশ্বারোহী, ৩০০০ হস্তী সৈন্য এবং

পৃথ্বিরাজের সহিত যুদ্ধ

অসংখ্য পদাতিক। অথচ মুহম্মদ ঘোরীর সৈন্য সংখ্যা সর্বশুদ্ধ ১,২০,০০০ মাত্র। এই যুদ্ধে ভারতের হিন্দু কুল-সূর্য শেষবারের মতো অস্তমিত হয়। ভারতের মুসলমান রাজত্বের ইহাই সূত্রপাত।

১১৯৮ খৃষ্টাব্দে বীরকেশরী মুহম্মদ বখতিয়ার খিল্‌জী যেরূপভাবে বঙ্গবিজয় করেন, জগতের ইতিহাসে তাহা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। মাত্র

বঙ্গ-বিজয়

১৭ জন সৈন্য লইয়া কোনো বীর কোনোকালে কোনো দেশ জয় করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।*

সম্রাট আকবর মাত্র ৫০০০ সৈন্য লইয়া চিতোর অবরোধ করেন। চিতোরের রাণা ৮০০০ সৈন্য চিতোর দূর্গে নিয়োজিত রাখিয়া সপরিবারে অন্য একটি সুরক্ষিত স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। একদিন রাত্রিযোগে

চিতোর-বিজয়

দুর্গাধিপতি জয়মলকে আকবর কৌশল পূর্বক গুলী করিয়া নিহত করেন। ইহাতেই রাজপুতগণ ভীত হইয়া 'জহর ব্রত' পালন করে। আকবর তাহা বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ দুর্গ আক্রমণ করেন। সমস্ত রাজপুত সৈন্য নিহত হয়, অথচ মোগল সৈন্য মাত্র একজন মারা যায়। এইরূপে মাত্র একজন সৈন্যের প্রাণ বিনিময়ে চিতোর বিজিত হয়।

দাক্ষিণাত্যের সুলতান মোহাম্মদ শাহ্ ৯০০০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বিজয়নগরের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যান। তিনি

---

* বখতিয়ারের বিহার-বিজয়ও এইরূপ বিস্ময়কর ছিল :—

"It is said by credible persons that he (Bakhtier) went to the gate of the fort of Behar with only two hundred horses and began the war by taking the enemy unawares."

—Eliot

এত ক্ষিপ্রতার সহিত অগ্রসর হন যে, রাজা ভয় পাইয়া পালাইয়া যান। মোহাম্মদ শাহ্ পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ৭০,০০০ হাজার হিন্দু সৈন্যকে নিহত করেন এবং বহু হস্তী ও রত্নসম্ভার লাভ করেন—Ferista

পানিপথের যুদ্ধ

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ

চিরস্মরণীয় পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে আহমদ শাহ্ আবদালীর সৈন্য সংখ্যা ছিল মোট ৫৩,০০০। পক্ষান্তরে মারাঠাদিগের সৈন্য সংখ্যার পরিমাণ---৩,০০,০০০ লক্ষেরও অধিক। এই যুদ্ধে মারাঠা জাতির যে শোচনীয় পরিণাম সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা ভারতের ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। এই যুদ্ধক্ষেত্রে মারাঠাদিগের ২,০০,০০০ সৈন্য নিহত হয়। —Elphinstone's History of India.

উপরে যে সমস্ত যুদ্ধের বিবরণ দেওয়া হইল, তাহাদের সবগুলিই গুরুতর ও ভাগ্য-নিয়ামক। এতদ্ব্যতীত ছোট-খাটো কতো যে যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হইয়াছে, তাহার তো ইয়ত্তাই নাই। এই সমস্ত যুদ্ধের কেবল মাত্র ফলাফলের মধ্যেই যে মুসলমানদিগের জাতীয় গৌরব নিহিত রহিয়াছে, তাহা নহে; প্রত্যেক যুদ্ধক্ষেত্রেই মুসলমানগণ যে অপূর্ব বীরমনোভাবের ও আত্মনির্ভরতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাও নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয়। এইখানেই মুসলিম জাতির শৌর্য-বীর্যের মূল উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়।

মাসিক মোহাম্মদী

১৯২৮

ইকবালের বাণী

আজকার দিনে যে সকল মনীষীকে লইয়া আমরা গৌরব করিয়া থাকি, তাঁহাদের মধ্যে বিশ্ব-বিশ্রুত কবি ডাঃ শেখ মোহাম্মদ ইকবাল, বি-এ (ক্যাণ্টাব), এম-এ (পাঞ্জাব), পি, এইচ্, ডি, (মিউনিক) অন্যতম। পাশ্চাত্য শিক্ষায় এমন সুশিক্ষিত পণ্ডিত-কবি প্রাচ্য জগতে আর দ্বিতীয়টি নাই। কবি ও দার্শনিকের এমন অপূর্ব সমন্বয় বড় একটা দেখা যায় না। দার্শনিক তত্ত্বের অভিনবত্ব ও নূতন দৃষ্টির জন্য তাঁহার কবিতা যেমন সম্পদশালিনী, অনুভূতি আবেগ ও কাব্য-রসের দিক দিয়াও তাহা তেমনই মর্ম্মস্পর্শী পেলব ও সুন্দর। মুসলিমের এই জাতীয় অধঃপতনের দিনে তিনি তাহাদের সুপ্তপ্রাণে যে বিপুল স্পন্দন জাগাইয়া তুলিয়াছেন, মরণ-অন্ধকারে যে জীবনের সন্ধান দিয়াছেন, চোক্ষে যে সত্যদৃষ্টি দান করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিতে গেলে ইকবালকে সত্যই "Messiah" বলিয়া আমাদের মনে হয়।

কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয়, ইকবালকে আমরা খুব কম লোকেই চিনি। যিনি তাঁহার বাঁশীর সুরে সাহানার করুণ মূর্চ্ছনা না জাগাইয়া দীপক-রাগে জাতির মুক্তি গান গাহিয়া ফিরিতেছেন, যিনি জাতিকে এক অপূর্ব মহিমা দান করিয়া যাইতেছেন, তাঁহাকে আমরা সমাদর করিতে শিখিলাম না! এই বেদনা কবির প্রাণেও আঘাত দিয়াছে; তাই অভিমানের সুরে নিজেই বলিতেছেন:—

"I have no need of the ear of to-day.
I am the voice of the poet of to-morrow."

হয়তো তাই। যে সুরে তিনি তাঁহার বীণা বাজাইয়া গেলেন, যে আকুল আহ্বান আকাশে বাতাসে রাখিয়া গেলেন, তাহা শুনিবার মতো কান এবং বুঝিবার মতো প্রাণ হয়তো আমাদের মধ্যে নাই। তাই অনাগত দিনের প্রতীক্ষায় তিনি বসিয়া আছেন।

ইকবাল সত্য সত্যই আমাদের জন্য এক 'জ্যোতির্ময়ী বাণী' বহন করিয়া আনিয়াছেন। সে বাণীর চুম্বক হইতেছে —"**Back to the Quran**" অর্থাৎ কোরআনের দিকে প্রত্যাবর্তন। কোরআনকে অবলম্বন না করিলে আমাদের মুক্তি নাই, ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি তাঁহার মানস-চোক্ষে এক বিরাট জগৎব্যাপী অখণ্ড ইসলামী রাজ্যের স্বপ্ন দেখিয়াছেন—যেখানে দেশ ও জাতির বাধা-বন্ধন নাই, সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তার বালাই নাই,—মানবতার সহজ অধিকারে সকলেই সেখানে সমান। "**Pan-Islam**" বা বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রতিই তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ এবং তিনি জাতিকে সেই দিকেই অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়াছেন।

ইকবালের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক কাব্য-গ্রন্থ "আস্‌রারে খুদী"র অনুবাদক Dr. Nicholson-ও তাঁহার ভূমিকায় এই কথাই বলিয়াছেন:—

"The cry 'Back to the Koran, Back to Muhammad' has been heard before ; and the responses have hitherto been somewhat discouraging. But on this occasion it is allied with the revolutionary force of western philosophy, which Iqbal hopes and believes, will vitalise the movement and ensure its triumph."

অন্যত্র বলিতেছেন:—

"He is a religious enthusiast, inspired by the vision of a New Mecca, a worldwide, theocratic utopian State in which all Moslems, no longer divided by the barriers of race and country shall be one. A free and independent Moslem fraternity having the Kaba as its centre and knit together by the love of Allah and devotion to the prophet—such is Iqbal's ideal."

কিন্তু এ শুধু কবি ইকবালের সোনালী স্বপ্ন নয়। এ স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য দার্শনিক ইকবাল তাঁহার নূতন দৃষ্টি ও নূতন যুক্তিবাদ লইয়া পিছনে উপস্থিত। তিনি বলেন —আত্ম-প্রতিষ্ঠা (self-affirmation) ও আত্ম-উন্নয়ন (Self--improvement) দ্বারাই আমরা ইস্‌লামের এই বিশ্বব্যাপী গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে পারি।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইকবালের বাণী প্রকৃত পক্ষে আত্ম-গঠনেরই বাণী। তিনি বলিতে চান উন্নতি-অবনতি আমাদের নিজেদেরই আয়ত্বাধীন। আমরা যতোখানি নিজদিগকে গঠন করিতে পারিব ততোখানি জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিব। উন্নতির মূলীভূত কারণ বা উপাদান বাহিরে নাই, অন্তরেই ইহা লুকাইয়া আছে। তাই আমাদের বিক্ষিপ্ত দৃষ্টিকে বাহির হইতে ফিরাইয়া নিজের প্রতি নিবদ্ধ করিতে হইবে; নিজের মধ্যে আমাদিগকে ফিরিয়া আসিতে হইবে। হৃদয়ের এই নিভৃত কক্ষে বসিয়াই আমাদের জীবন-শিল্প রচনা করিতে হইবে।

সর্ববিধ উন্নতির জন্য ব্যক্তিত্বের বা 'খুদীর' (self) উপর ইক্‌বাল যে এতখানি জোর দিয়াছেন, তাহার যথেষ্ট দার্শনিক কারণ আছে। তিনি বলেন---ব্যক্তিত্বই বিশ্ব-জগতের সর্বাপেক্ষা বড় কথা; ব্যক্তিত্বের উপরেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড দাঁড়াইয়া আছে। নিখিল সৃষ্টি এই ব্যক্তিত্বেরই সমষ্টি। জগতে এই যে ছোট-বড়র বৈষম্য, ইহা ব্যক্তিত্বেরই তারতম্যের ফল। যাহার ব্যক্তিত্ব যতো বড় সে ততোই শক্তিশালী এবং ততোই টিকিয়া থাকিবার অধিকারী। সূর্যের ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত প্রবল বলিয়া সে এই জড়জগৎ ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহকে তাহার অধীন করিয়া রাখিয়াছে। পর্বতের ব্যক্তিত্ব বেশী বলিয়া সে বিপুল দর্পে গম্ভীর হইয়া জগতের বুকের উপর দাঁড়াইয়া আছে। ব্যক্তিত্ব না থাকিলে সে ধূলা হইয়া মাটিতে মিশিয়া যাইত—

> "When the mountain loses its self,
> it turns into sands
> And complains that the sea
> surges over it."

"পর্বত যখন নিজের ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ফেলে তখন সে ধূলা হইয়া যায়

এবং অনুযোগ করিয়া বলে যে, সাগর তাহার বুকের উপর দিয়া যাইতেছে।"

আবার জীবন-নদী যখন ব্যক্তিত্বের শক্তিতে শক্তিমান হইয়া উঠে, তখন তাহা প্রসারিত হইয়া সাগরে পরিণত হয়—

"When life gathers strength from the self
The river of life expands into an ocean."

ব্যক্তিত্বের এই যে বিপুল শক্তি, ইহার মূল উৎস হইতেছে —স্বয়ং খোদাতালা। তিনিও ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন, কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ একক ও অনন্য (unique) ; আল্লার ব্যক্তিত্ব সর্বাপেক্ষা পরিপূর্ণ (perfect) বলিয়া তিনি সর্বাপেক্ষা শক্তিমান। খোদাতালা হইতে যে যতো দূরে, তাহার ব্যক্তিত্ব ততো দুর্বল। পক্ষান্তরে যে খোদার যতো নিকটবর্তী, সে ততো ব্যক্তিত্ব ও শক্তি-সম্পন্ন। সুতরাং শক্তি সঞ্চয় করিতে হইলে আমাদিগকে আমাদের ব্যক্তিত্বকে সবল করিয়া তুলিতে হইবে, আর ব্যক্তিত্বকে সবল করিতে হইলেই আমাদিগকে খোদাতালার নৈকট্য লাভ করিতে হইবে, অর্থাৎ খোদাতালার মধ্যে যে সমস্ত গুণাবলী নিহিত আছে, তাহাই আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হইবে। হজরত মুহম্মদও (দঃ) এই কথাই বলিয়াছেন—"তাখাল্লাকু বি আখলাক আল্লা"— "অর্থাৎ তোমরা নিজেদের মধ্যে খোদাতালার গুণাবলী সৃষ্টি করো।"

এইখানে ইকবাল একটি নূতন কথা বলিয়াছেন। শক্তি-সঞ্চয় করিবার জন্য আমাদিগকে খোদাতালার নিকটবর্তী হইতে হইবে বটে ; কিন্তু তাই বলিয়া সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহার মধ্যে নিজেকে বিলীন করিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইলে চলিবে না। খোদাতালাকে জীবনের মধ্যে শোষণ (absorb) করিয়া লইয়া, অর্থাৎ তাঁহার গুণাবলীকে আপন জীবনে আয়ত্ব করিয়া নিজের ব্যক্তিত্বকে বলিষ্ঠ করিতে হইবে এবং খোদাতালার ক্রমবিকাশমান সৃজন-লীলার সহায়ক হইতে হইবে। হজরত মুহম্মদ যেমন 'শবে মেরাজে' খোদাতালার নৈকট্য লাভ করিয়াও পুনরায় জগতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, খোদার নিকট হইতে শক্তি লাভ করিয়া আমাদিগকেও তেমনি জগতের দিকে মুখ ফিরাইতে হইবে।

ইকবাল বলিতেছেন—

"Abandon self and flee to God,
Strengthened by God, return to theyself."

"নিজেকে ছাড়িয়া খোদার নিকট ছুটিয়া যাও এবং তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া পুনরায় নিজের মধ্যে ফিরিয়া আইস।"

এই স্থলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ইকবাল হাফিজের সুরে তাঁহার বীণা বাঁধেন নাই। হাফিজের মধ্যে একটা অলস করুণ তান আছে, সেখানে শুধুই বিরহের ক্রন্দন আর মিলনের ব্যাকুলতা। জীবনের উদ্দাম গতিভঙ্গি ও অশ্রান্ত চঞ্চলতা তাঁহার মধ্যে নাই। নিজকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিবার জন্যই তিনি ব্যাকুল। ইকবাল কিন্তু এই সুফী ভাবকে জীবনের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তিনি মাওলানা রুমীর আদর্শে অনুপ্রাণিত। জীবনকে তিনি গঠন করিয়া উপভোগ করিবার পক্ষপাতী মৃত্যু অপেক্ষা জীবনকেই তিনি মূল্যবান মনে করেন। তিনি বলেন, এহেন আত্ম-বিলোপ (self-annihilation) মানুষের স্বভাব-ধর্ম নহে, কারণ সে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবারই অভিলাষী। নিষ্ক্রিয় উদাসী হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার নাম জীবন নহে, উহা মৃত্যুরই নামান্তর মাত্র। মানুষ এরূপ নিস্পন্দ মৃত জীবন যাপন করিবার জন্য দুনিয়ায় আসে নাই। তাহার জীবনের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। খোদাতালার প্রতিনিধি বা খলিফা রূপেই মানুষ এই দুনিয়ায় আসিয়াছে। সুতরাং এই নিখিল বিশ্বে খোদার প্রতিনিধিত্ব করাই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য। সসাগরা পৃথিবীর বুকের উপরে আমরা বাঁচিয়া থাকিব, স্থলে জলে ব্যোমপথে বিচরণ করিব, আর সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় সৃষ্ট জীবের ও প্রকৃতির উপর শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিব। যতো দুঃখ যতো বিপদ যতো বাধা যতো বিঘ্নই আসুক না কেন, আমরা হেলায় তাহাদিগকে জয় করিয়া তাহাদের উর্ধ্বে উঠিব। কোনো পার্থিব শক্তিই আমাদের শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিবেনা, কারণ আমরা স্বয়ং খোদাতালার প্রতিনিধি। শয়তান বলো, ফেরেশতা বলো, দেবদেবী বলো, দৈত-দানব বলো—আমরা সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সকলেই সসম্ভ্রমে আমাদের পায়ে প্রণতি জানাইবে। ইকবাল তাই উৎফুল্ল হইয়া বলিতেছেন—

"It is sweet to be God's vicegerent in the world,
And exercise sway' over the elements."

কিন্তু কেবল মাত্র পূর্ণ-বিকশিত মানবাত্মাই খোদার প্রতিনিধি হইবার যোগ্য পাত্র। সহজে নিজেকে এই গৌরবান্বিত অবস্থায় উন্নীত করা যায় না। ইহার জন্য সাধনা চাই। এ অবস্থায় পৌঁছিতে হইলে নিয়মানুবর্তিতা ও আত্ম-সংযমের মধ্য দিয়া আমাদিগকে যাইতে হইবে। আইন ভাঙিয়া বিদ্রোহী সাজিয়া খোদার প্রতিনিধিত্ব করা যায় না। এত বড় মুক্তির আনন্দ উপভোগ করিতে হইলে নিজেকে বন্ধনের মধ্যে ধরা দিতে হইবে। ইকবাল তাই এই নিয়মানুবর্তিতার উপর বেশী রকম জোর দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

Endeavour to obey, O heedless one !
Liberty is the fruit of compulsion.

*　　　*　　　*

Who so would master the sun and stars
Let him make himself a prisoner of Law !
The wind is enthralled by the fragrant rose
The perfume is confined in the navel of the
musk-deer,
The star moves towards its goal
With head bowed in surrender to a law.

*　　　*　　　*

O thou that art emancipated from old custom
Adorn thy feet once more with the same
silver chain,
Do not complain of the hardness of the Law
Do not transgress the statutes of Mohammad !

"ওগো অমনোযোগী, বাধ্য হইতে শিখ। মুক্তি বাধ্যতারই ফল।

"যে কেহ সূর্যতারকার উপর প্রভুত্ব করিতে চায়, তাহাকে নিয়ম-নিগড়ে বন্দী হইতে বলো! সুরভি পবন গোলাপের পাপড়ির মধ্যে আবদ্ধ

হইয়া আছে, কস্তুরীগন্ধ মৃগের নাভি-কন্দরে বদ্ধ হইয়া আছে। তারকারাজি তাহাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে চলিয়াছে বটে, কিন্তু নিয়মের অধীন হইয়া মাথা নত করিয়া চলিয়াছে।

"ওগো অতীতের সংস্কারমুক্ত! আবার সেই অতীতের রূপালী শৃঙ্খলে তোমার পদদ্বয় আবদ্ধ করো। আইন কঠোর বলিয়া অনুযোগ করিওনা, হজরত মুহম্মদের বিধি-নিষেধকে লঙ্ঘন করিওনা।"

ইহাই ইকবালের মতে ব্যক্তিত্বের শিক্ষা ও সাধনা। তিনি মনে করেন, হজরত মুহম্মদ জীবনের যে আদর্শ আমাদিগের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন, যে পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন এবং যে সমাজ-বিধি প্রবর্তিত করিয়াছেন তাহাই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে একথা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে---ইকবাল জীবনের কবি। জীবন-শতদলের পরিপূর্ণ বিকশিত মূর্তিই তিনি দেখিতে চান। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি জড়-জীবনের গান গাহেন নাই। সুফী মতবাদ জড়-জীবনের দিকে মানুষকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে,---অন্য দিকে পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞান মানুষকে জড়বাদী করিয়া তুলিয়াছে। ইকবাল এই দুই বিভিন্নমুখীন ভাবধারাকে কাব্যরসের মধ্যে আনিয়া একত্র মিলাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন ঘটিয়াছে। সেই মিলনের—সেই সমন্বয়ের বাণী এতই কবিত্বপূর্ণ যে, তাহা মস্তকে পৌঁছিবার পূর্বেই হৃদয় জয় করিয়া লয়।

ইকবালের বাণী সত্যসত্যই আশার বাণী। সে বাণী শ্রবণ করিলে অসাড় প্রাণেও পুলক-কম্পন লাগে; হতাশজীবনেও বাঁচিবার সাধ জাগে। জীবনের এমন অব্যর্থ সন্ধান আর কোনো কবিই আমাদিগকে দিতে পারেন নাই। নিরাশার অন্ধকারে দিশাহারা হইয়া আমরা প্রতিদিন মরণের পথে চলিয়াছি। আমাদের প্রাণে আশা নাই, আকাঙ্খা নাই, বাঁচিবার আগ্রহ (will to live) নাই, অভাবের তীব্র অনুভূতি নাই; আমরা যেন একটা উদ্দেশ্যহীন জীবন যাপন করিয়া চলিয়াছি। ইকবাল ইহা বুঝিতে পারিয়াই উদাত্ত স্বরে গাহিয়া উঠিয়াছেন:—

"Life is preserved by purpose,
Because of the goal its caravan bell tinkles"

Life is latent in seeking
Its origin is hidden in Desire
Keep Desire alive in thy heart
Lest thy little dust become a tomb."

"উদ্দেশ্যই জীবনকে বাঁচাইয়া রাখে। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিবার জন্যই সরাইখানায় যাত্রীদলের ঘণ্টাধ্বনি শুনা যায়। অনুধাবন বা অনুসন্ধানের মধ্যেই জীবন নিহিত। জীবনের মূলমন্ত্র আকাঙ্খার মধ্যে লুক্কায়িত। হৃদয়ে আশা-আকাঙ্খাকে জাগাইয়া রাখো, নতুবা তোমার ওই মাটির দেহ একটা কবরে পরিণত হইবে।"

সত্যই তো তাই! যাহাদের জীবনে কোনো আশা নাই, সাধ নাই, নির্জিব জড়পিণ্ডের ন্যায় যাহারা দিন অতিবাহিত করিয়া চলে, তাহাদের দেহ বাস্তবিকই তো তাহাদের আত্মার সমাধি! তাহারা তো সত্যই মরিয়া বাঁচিয়া আছে! ইকবাল তাই পরিষ্কার করিয়া তাহাদিগকে শুনাইয়া দিতেছেন—

"Negation of desire is death to the living."

বাস্তবিকই তাই! আশা-আকাঙ্খার নিবৃত্তির নামই তো মরণ। আশা-আকাঙ্খা না থাকিলে কিসের জীবন? আর জীবন না থাকিলে কিসের ধর্ম? কিসের লক্ষ্য? কিসের আদর্শ? জীবনকে বাদ দিলে সকলই যে ব্যর্থ। তাই ইকবাল জীবনের দিকে আমাদের দৃষ্টি এমন করিয়া আকর্ষণ করিয়াছেন।

এইখানে স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত—কবি নিছক আনন্দবাদীও নন। "Eat, drink and be merry"—'খাও দাও, স্ফুর্তি করো'—এই অর্থে তিনি জীবনকে ব্যাখ্যা করেন নাই। জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে,—সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্যই তিনি জীবনকে চান। সে জীবন পরিপূর্ণ, সুন্দর ও সতেজ। সাহিত্য, আর্ট, বিজ্ঞান প্রভৃতি মানবের যাবতীয় ক্রিয়া-কলাপ এই জীবন-বিকাশের জন্যই নিয়োজিত হওয়া উচিত। জীবন-বিকাশই ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচার করিবার একমাত্র মাপকাঠি। যে-সাহিত্য, যে-আর্ট, যে-বিজ্ঞান এই জীবন-বিকাশের যতোখানি সহায়ক, তাহা ততোখানি সুন্দর। আর যাহা এই উদ্দেশ্য সাধনে যতোখানি বিঘ্নউৎপাদক তাহা ততোখানি মন্দ।

এ সম্বন্ধে ইকবাল একস্থানে বলিয়াছেন—

"The ultimate end of all human activity is life—glorious, powerful, exuberent. All human art must he subordinated to this final purpose, and the value of everything must be determined in reference to its life-yielding capacity. The highest art is that which awakens our dormant will-force and nerves us to face trials of life manfully. All that brings drowsiness and makes us shut our eyes to Reality around, on the mystery of which alone life depends, is a message of decay and death. There should be no opium-eating in Art. The dogma of 'Art for the sake of Art' is a clever invention of decadence to cheat us out of life and power."

অর্থাৎ—"মানবের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপের চরম লক্ষ্য হইতেছে—সুন্দর স্বাস্থ্যপূর্ণ গৌরবোজ্জ্বল জীবনের বিকাশ। মানুষের সমস্ত শিল্পকে এই চরম উদ্দেশ্যের বশবর্তী হওয়া উচিত এবং কোন্‌টি কতোখানি জীবন প্রদায়িনী শক্তি রাখে তাহাই দেখিয়া সমস্ত বিষয়ের ভালোমন্দ বিচার করা উচিত। সে আর্টই শ্রেষ্ঠ—যাহা জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইবার জন্য আমাদের মধ্যে আমাদের সুপ্ত ইচ্ছাশক্তিকে জাগ্রত করিয়া দেয়। যাহা জীবনের মধ্যে অবসাদ আনে এবং বাহিরের বাস্তব সত্যের প্রতি আমাদিগকে অন্ধ করিয়া রাখে—তাহা ধ্বংস এবং মৃত্যুরই বাণী। আর্টে আফিম-খাওয়া বা নেশা-উৎপাদনের স্থান নাই। আর্টের খাতিরে আর্ট—এই যে নীতি—ইহা আমাদিগকে জীবন এবং শক্তি হইতে বঞ্চিত করিবারই একটা সুন্দর কৌশল মাত্র।"

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা আশা করি একথা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে যে, ব্যক্তিত্বের শক্তি ও বিকাশের উপরেই আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে। ব্যক্তিত্বকে সবল করিয়া তুলিতে হইবে, তাহা হইলেই আমরা জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিব।

মাসিক মোহাম্মদী

১৯২৯

খুলনার স্মৃতি

বন্ধুগণ,

আপনাদের সাদর নিমন্ত্রণের জন্য আমার সশ্রদ্ধ আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। খুলনা আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়। আজ এখানে দাঁড়িয়ে সুদীর্ঘ ১৫।১৬ বছরকার পূর্বস্মৃতি আমার মনে পড়ছে। ১৯১৪-১৬ খৃষ্টাব্দে দৌলতপুর কলেজে আমি আই-এ পড়ি। তখন আমার খুলনাবাসী বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে অনেকবার আমি খুলনায় এসেছি। খুলনার আকাশে বাতাসে অতীত দিনের সেই স্মৃতির খোশ্‌বু আজও যেন ভেসে বেড়াচ্ছে, আজও যেন তার রেশ আমি অন্তর তলে অনুভব করছি।

কিন্তু এই পরিচয়ের চেয়েও আর একটা নিবিড়তর মধুরতর ও সত্যতর পরিচয় আমার সাথে তার আছে। সে হচ্ছে এই: যশোর যখন আমার মাতৃভূমি তখব খুলনাকে অনায়াসে খালার বাড়ি বলা যায়। কোন্ আদিকাল হ'তে দুটি পাশাপাশি গ্রামে যেন এই দুই বোনের বিয়ে হয়েছিল, সেই থেকে দুইবোন সন্তান-সন্ততি নিয়ে এখানে চিরদিন বাস করে আসছে। কী অচ্ছেদ্য প্রীতির বন্ধন এদের! পরস্পরের প্রতি কতো দরদ! যশোরে যখন খেজুর রস ও পাটালি গুড় হয়, তখন সে তার বোনের বাড়িতে কিছুকিছু পাঠিয়ে দেয়। আবার খুলনার মাঠে যখন সরু সরু ধান হয়, গাছে গাছে রাশিরাশি নারিকেল ফলে, তখন খুলনাও তার আপাকে কিছুকিছু উপহার পাঠায়। শুধু ধানচাল নারিকেলই পাঠায় না, পান-সুপারিও পাঠায়। এমনি করে সুখে দুঃখে দু'বোনের দিন কাটে। যখন এপথ দিয়ে ঝড় বা সাইক্লোন বয়ে যায়, তখন দু'বোনেরই বাড়িঘর ও গাছপালা আহত হয়, দুজনেই কেঁদে ওঠে নিজেদের সন্তান-সন্ততির অমঙ্গল আশঙ্কায়। আবার যখন নীল আকাশে চাঁদ ওঠে, তারা ফোটে, বনে বনে কোয়েল পাপিয়া ডাকে, তখন দুবোনের অন্তরই আনন্দে নেচে ওঠে। যশোরের খেজুর গাছ, খুলনার নারিকেল সুপারির গাছ—এরা যেন Wireless-Telegraph-এর post। এদের সাহায্যেই দুই বোনে গোপনে গোপনে মনের কথা আদান-প্রদান করে।

গভীর নিশীথে কান পেতে আমি সেই মৌন সংকেত-বাণী শুনতে পাই।

বন্ধুগণ,

আপনারা যে আজ Muslim Literary Club ও Library-র একটা বার্ষিক অধিবেশন করতে পেরেছেন, এ অত্যন্ত আনন্দের কথা। আজকার উৎসব দেখে মনে হচ্ছে আপনারা জীবন্ত। জীবন সার্থক ও সুন্দর হয় তখনই—যখন আমরা আমাদের পরিপার্শ্বের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজেকে উপলব্ধি করতে পারি। পারিপার্শ্বিকতার বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে ফুটিয়ে তুলতে পারলেই সেই জীবন সার্থক ও সুন্দর হয়ে ওঠে। নতুবা সবাইকে অস্বীকার করে একা একা ঘরের কোণে বেঁচে থাকার মধ্যে কোনো গৌরবও নাই—চমৎকারিত্বও নাই। আপনারা নিজেদেরকে এই আলোকে দেখতে শিখেছেন দেখে খুবই উৎসাহিত হলাম। এ হেন আত্মদর্শনের প্রয়োজন আছে। প্রতিদিনের যে পরিচয়, তাতে তৃপ্তি আসে না। সে পরিচয় বিক্ষিপ্ত ও পরিব্যাপ্ত। এক একটা বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য তাই এক একটা বিশেষ দিনকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে হয়। ঈদের দিনে বড় হয়ে জাগে শুধু ভ্রাতৃপ্রেম ও মিলন-মাধুর্য। মহররমের দিনে জাগে শুধু সত্য ও আদর্শের জন্য ত্যাগ ও আত্মদানের মহিমা। লাইব্রেরী, ক্লাব বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য তেমনি এক একটা বিশেষ দিন নির্দিষ্ট করে উৎসব করলে তাতে কল্যাণ হয়। বিশেষ বিশেষ দিনে বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘনিষ্ট হয়; আমাদের বিক্ষিপ্ত দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হয়। আপনাদের ক্লাব ও লাইব্রেরীরও আজ সেইরূপ একটা দিন। বিক্ষিপ্ত সূর্যরশ্মি যখন কেন্দ্রীভূত হয়ে আতশী কাচের মধ্য দিয়ে কোনো দাহ্য পদার্থের উপর গিয়ে পড়ে, তখন তাতে আগুন ধরে যায়। আপনারাও আজ তেমনি করে আপনাদের ক্লাব ও লাইব্রেরীটিকে দেখবার সুযোগ পাচ্ছেন। আশা করি আপনারা আপনাদের এই প্রতিষ্ঠানকে আজ সত্য করে চিনবেন এবং এর উৎকর্ষ সাধনের জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে আত্মনিয়োগ করবেন।

খুলনা, ১৯৩১

মোল্লা ও তরুণ

কিছুদিন হইতে আমাদের সমাজে প্রবীণ ও তরুণের মধ্যে বেশ একটা দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিতেছে। সমগ্র মুসলিম সমাজ মোটামুটি ভাবে দুই দলে বিভক্ত। একদল প্রাচীনপন্থী, আর একদল নূতন বা প্রগতিপন্থী। অন্য কথায় : একদল 'মোল্লা', আর একদল 'তরুণ'। মোল্লাদল তরুণ-দলকে দেখিতে পারেনা। তরুণ-দলও মোল্লাদলকে দেখিতে পারেনা। উভয়ের মধ্যে যেন আদায়-কাঁচকলায় সম্বন্ধ।

বস্তুত দুইটি বিভিন্ন মানসিকতা বর্তমান মুসলিম সমাজে ক্রিয়া করিতেছে। প্রগতিশীল তরুণ দল বলিতেছে---ইসলামের কিছু কিছু সংস্কারের প্রয়োজন, নতুবা বর্তমান যুগধর্মের সহিত পা মিলাইয়া চলা অসম্ভব। তাই তাহারা একটা 'New Islam'-কে গড়িয়া তুলিতে চায়। পক্ষান্তরে মোল্লাদল বলিতেছে---ইসলাম সনাতন; তাহার বাণী সর্বযুগে ও সর্বদেশে শাশ্বত ও চিরন্তন, তাহার কোনো পরিবর্তন নাই।

ইহাই বোধ হয় বর্তমান মুসলিম সমাজ-মনের দুই বিশিষ্ট রূপ। দুই দলের দুই মত ও দুই পথ। কোন্‌টি সত্য?

আমার মনে হয়, কারো মতই অভ্রান্ত নয়। দুই দিকেই সত্য আছে; দুই দিকেই গলৎ আছে। প্রাচীন দল যখন তরুণ-দলের কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করিয়া বসে এবং দিকে দিকে তাহাদের নব নব অভিযানের পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়, তখন তাহারা যেমন ভুল করে, তরুণ দলও যখন তাহাদের মূল দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আপন পথে চলিতে চায়, তখনও ঠিক তেমনি ভুল করে। তরুণ দলের মতকে সহ্য করিতে না পারা যদি গোঁড়ামি হয়, পুরাতন দলের মতকেও সহ্য করিতে না পারা ঠিক তেমনি গোঁড়ামি। বস্তুত দুই দল দুই বিপরীত দিকের শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া পরস্পর পরস্পরকে গোঁড়া বলিয়া গালাগালি দিতেছে। পুরাতন দল নব যুগের নব আলোককে কিছুতেই ইসলামের ত্রিসীমানায় ঢুকিতে দিবেনা,

আর একটি নূতনতর নূতনকে দেখিলেই তাহারা যে তৎক্ষণাৎ সেই পুরাতন-নূতনকেও বর্জন করিবে, একথা অনায়াসেই বলা যায়। ইসলামের সহিত বাহিরের জিনিসের কোনো আপাতবৈষম্য দেখিলেই অতটা অধীর হইয়া পড়া চঞ্চলমতিত্ব ও অদূরদর্শিতারই পরিচায়ক। নূতন প্রবাহের সহিত এমন করিয়া ভাসিয়া বেড়াইলে চলিবে না। নূতনেরও তারতম্য আছে। সব নূতনই কালের বুকে দাগ কাটিয়া বসে না, মেঘের মতো ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়া ক্ষণিকেই উড়িয়া যায়। যুগধর্মের সহিত আমাদিগকে পা মিলাইয়া চলিতে হইবে কিন্তু তাহার নিকট অমন করিয়া আত্মসমর্পণ করিলে চলিবে না। আমাদের বুঝিতে হইবে---যাহাকে আমরা যুগধর্ম বলি, তাহার অনেকখানিই হুজুগ-ধর্ম। এই হুজুগ-ধর্মের তাড়নায় ভাসিয়া না গিয়া তাহাকে রোধ করিতে পারিলেই আমাদের মঙ্গল। যাহারা চিন্তাশীল, যাহারা মহাপুরুষ, তাঁহারা আপন চিন্তা পৌরুষ ও মহিমা দ্বারা যুগ-প্রবাহকে ফিরাইয়া দেন---যুগধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাঁহারা যুদ্ধ করেন; আর যাহারা দুর্বল ও অপরিণামদর্শী, তাহারাই নূতনের প্রথম আঘাতেই পরাজয় স্বীকার করে।

অতএব দেখা যাইতেছে তরুণ-দলের এই উৎকট নূতন-প্রীতি সর্বথা সমর্থনযোগ্য নয়। একটা শোচনীয় Inferiority Complex তাহাদের মনে ক্রিয়া করিতেছে। আজ পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে পড়িয়া মুসলিম তরুণ ভাবিতে শিখিয়াছে---তাহারা অপরের চেয়ে হীন ও দুর্বল। ইসলামের সহিত বহির্জগতে যেখানেই তাহারা বৈষম্য দেখিতেছে, সেখানেই ইসলামকেই ইহার জন্য দায়ী করিতেছে। বিশ্বের সম্মুখে উন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া নিজদিগকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতে আজ তাহারা কুণ্ঠিত---সঙ্কুচিত। সমগ্র জগত জুড়িয়া আজ ইসলামের নব জাগরণ সূচিত হইতেছে, কিন্তু বাংলার মুসলমান আজ তাহার খবর রাখে না। জগতের চিন্তাধারা আজ ইসলাম-মুখীন। ইসলামের আদর্শেই আজ সারা বিশ্ব অনুপ্রাণিত; অথচ বাংলার মুসলিম তরুণ পরের দ্বারে আদর্শ খুঁজিয়া ফিরিতেছে। যে যুগে **Bernard Shaw**-র মতো-মনীষী বলিতেছেন: **"Within one century the western countries in general and England in**

particular will have to to embrace Islam or any other religion similar to Islam",—সে যুগে বাংলার মুসলমান আত্ম-অবিশ্বাসে মুহ্যমান।

প্রতিভা ও মনীষার দিক দিয়া দেখিতে গেলেই বা আমরা কম কিসে? এই অধঃপতনের যুগেও কামাল পাশা, রেজা শাহ পেহলবী, এবনে সৌদ, আবদুল করিম প্রভৃতি ক্ষণজন্মা পুরুষদের জন্ম হইয়াছে। মহাকবি ইকবালের কাব্য-প্রতিভায় আজ বিশ্ব-জগৎ মুগ্ধ। সঙ্গীত-জগতে আবদুল করিম খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, বাদল খাঁ, জমীর উদ্দীন খাঁ, এনায়েত খাঁ প্রভৃতি মুসলিম শিল্পীরা আমাদের এক একটি উজ্জ্বল রত্ন। ক্রীড়া-জগতে "মহামেডান স্পোর্টিং"-এর তুলনা নাই। বস্তুতঃ কোনো বিষয়েই মুসলমান কাহারও নিকট হারিবার পাত্র নহে। অথচ এক শ্রেণীর অদূরদর্শী লেখক প্রতিনিয়ত শুধু ইসলামের "ব্যর্থতার" বাণীই শুনাইয়া আসিতেছে। এই আত্ম-অবিশ্বাস ও নিজের ঘরের প্রতি মমত্ববোধের অভাবই হইতেছে তরুণ-দলের এক মস্তবড় দুর্বলতা।

অতএব দেখা যাইতেছে, ইসলামের প্রতি তরুণদলের যেসব অভিযোগ তাহা অনেক ক্ষেত্রেই অমূলক। প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে স্থিতিশীলতারও প্রয়োজন আছে। যে জিনিস আজ মন্দ বা অচল বলিয়া মনে হইতেছে অথচ কালই তাহা ভালো বা সচল হইয়া যাইতেছে, তাহাকে ক্ষণিক উত্তেজনায় বিসর্জন দেওয়া সুবুদ্ধির পরিচয় নহে। মূল্যবোধেরই এ বিকৃতির লক্ষণ।

তরুণ ও পুরাতনের মধ্যে দ্বন্দ্বই বা কোথায়? কে তরুণ? কে পুরাতন? তরুণ-পুরাতনের definition কী? কোথায় উহাদের সীমা-রেখা? কোথায় উহাদের line of demarkation? তরুণ-পুরাতনের শ্রেণী-বিভাগ করিবার মাপকাঠিই বা কি? সে মাপকাঠি কি শুধু বয়সের? আমি জানিনা, বুঝিনা ইহাদের ভেদাভেদ। নির্ঝরিণী যখন কুলুকুলু নাদে বহিয়া যায়, তখন তার মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা থাকে। যে জলধারা চলিয়া গিয়াছে, যেটুকু যাইতেছে আর যেটুকু আসিতেছে, তাহাদের মধ্যে কোনো গণ্ডী কাটা নাই। কালস্রোতও সেইরূপ। একটা

অখণ্ড প্রবাহ যুগ যুগ ধরিয়া বহিয়া চলিয়াছে; অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তাহার বাহিরের রূপ, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে অবিভাজ্য রূপে এক; সেখানে কোনো ভুত-ভবিষ্যত নাই; সেখানে সমস্তই চিরবর্তমান। কাজেই এই কাল-প্রবাহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিতে যাওয়া আমাদের মস্তবড় ভুল। কেহ যে একটি যায়গায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া নূতনের স্বরূপ দেখিয়া লইবে, সে সাধ্য নাই। হেরাক্লিটাস বলিয়াছেন: "**I cannot bathe in the same river twice.**" অর্থাৎ এক-নদীতে আমি দুইবার স্নান করিতে পারি না। কথাটি খুবই ঠিক; কেননা যে-মুহূর্তে একটি লোক কোনো-নদীতে ডুব দিল, তার পরমুহূর্তে সেই লোক সেই লোকও নয়, সেই নদী সেই নদীও নয়। মুহূর্তে জীবন ও জগতের এমনই বিচিত্র পরিবর্তন। এই একটানা জীবন-স্রোতের কোন্‌খানিকে আধুনিক, আর কোন্‌খানিকে প্রাচীন বলিব।? এই মুহূর্তে যে নূতন, পরমুহূর্তেই সে যখন পূরাতন, তখন পূরাতনকে গালাগালি দেওয়া কি নূতনের শোভা পায়? নূতন যদি আজ তাহার পূর্ববর্তীদিগকে 'পচা', 'বাসি' বলিয়া গালাগালি দেয় বা নাক সিটকায়, তবে অনাগত নবীনদের হাতে সেই গালাগালি তাহাদের জন্যও সঞ্চিত হইয়া আছে, ইহা যেন তাহারা ভুলিয়া না যায়। প্রবাদ আছে: 'ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে।' গোবরও যে দুদিন পরে ঘুঁটে হইয়া অমনি করিয়া পুড়িবে, সে কথা যেন গোবরের মনে থাকে।

বস্তুত: মানব-সভ্যতার কোনো স্বতন্ত্র স্তর নাই। এক অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্রে গাঁথা এই সভ্যতা; এর কোনো নূতন-পূরাতন নাই; প্রত্যেকের দানেই এ মহাসভ্যতা পরিপুষ্ট; সুতরাং ইহার কোনো অংশকেই ঘৃণা করিয়া প্রত্যাখান করিবার উপায় নাই। গাছে যখন ফুল ফোটে, সে তখন পুরাতন সঞ্চয়কে অস্বীকার করে না; করিলে আর সে নাই। প্রতিদিন প্রতি আলোক-কণিকায়, প্রতি রস-ধারায়, প্রতি বর্ণে, প্রতি গন্ধে পূরাতন বৃক্ষটি ফুলের জীবনকে রচনা করিয়াছে; ফুল তাহার কোন্‌টুকুকে অস্বীকার করিবে? বস্তুত: তরুণ পুরাতনেরই সৃষ্টি। আগা আকাশে উঠিয়া যতোই আস্ফালন করুক না কেন, গোড়াকে সে কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারে না।

বিশ্ব-প্রকৃতির দিকে তাকাইলেও তরুণ-পুরাতনের এই অদ্ভুত দ্বন্দ্বের কোনো সমর্থন পাইনা। একই চন্দ্র-সূর্য প্রতিদিন নব মাধুর্যে হাসিয়া উঠিতেছে; একই ঋতুচক্র তালে তালে নৃত্য করিয়া প্রতিবারে নূতন হইয়া দেখা দিতেছে; একই পুরাতন বৃক্ষে নব নব পুষ্প শোভা পাইতেছে; পুরাতন পৃথিবীর বুকের উপরে এমনি করিয়া নূতনের অভিনয় চলিয়াছে। এমন কি সেই অতি পুরাতন আল্লাহ্—যিনি সমস্ত বৈচিত্র্য ও নূতনত্বের মূলাধার, তিনিও সেই মামুলী চন্দ্র-সূর্য ও আকাশ-পৃথিবী লইয়া সৃষ্টি-লীলা চালাইতেছেন। এই সব পুরাতন যন্ত্রপাতি লইয়া কাজ করিতে সর্বশক্তিমান আল্লার কিন্তু কোনো লজ্জা হয় না; অথচ প্রাচীনদের সাথে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে বা তাহাদের দানকে স্বীকার করিয়া লইতে তরুণদের ভারী লজ্জা। এ এক উপভোগ্য ব্যাপার বটে।

অতএব হে তরুণ, হে পুরাতন। এসো, আজ একসঙ্গে মিলিত হও। সমস্ত গ্লানি ভোলো; সমস্ত বিরোধ ভোলো। আজ উভয়েই মনে-প্রাণে উপলব্ধি করো তোমরা এক; তোমাদের লক্ষ্য এক, তোমাদের উদ্দেশ্য এক। এই যে নিখিল জগৎ শত বর্ণে, শত সুষমায় প্রকাশ পাইতেছে; এই বৈচিত্র্যের মূলে যেমন কোনো বিরোধ নাই—এক গভীর ঐক্যসূত্রে যেমন ইহারা পরস্পর আবদ্ধ এবং সকলেই যেমন তাহাদের স্রষ্টাকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তন করে, তোমরাও তেমনি একই লক্ষ্যে একই কেন্দ্রে সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আপন বৈচিত্র্যে বিকশিত হও। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে রেমন **Unity in diversity**-র সন্ধান পাওয়া যায়, তোমাদের বৈচিত্র্যের মধ্যে তেমনি একটা গভীর যোগ-সূত্র থাক্। আজ কেহই বিচ্ছিন্ন হইও না, মিলিত হও। আজকার দিনে তোমাদের সংহতি ও মিলনের নিতান্ত প্রয়োজন।

ওগো পুরাতন, ওগো 'মোল্লা', এসো; তোমাকে আজ আলিঙ্গন করি। তুমি ঘৃণ্য নও, তুচ্ছ নও; শ্রদ্ধানত মস্তকে তোমার দানকে আজ আমরা স্বীকার করি। জাতির জীবন-যুদ্ধে তুমিও একজন বীর মুজাহিদ। তোমার প্রয়োজন ছিল, এখনও আছে। এসো, আজ হাতে হাত মিলাও। কাহাকে তুমি 'তরুণ' বলিয়া দূরে ঠেলিয়া দিতেছো? সে যে তোমার নিতান্ত আপন। একটু উদার হও, মনকে একটু সহজ ও সরল করো—তরুণকে স্নেহ-আশীর্বাদ

দাও। ওরা তরুণ, ওদের যৌবন-ধর্মকে আঘাত করিও না ; কল্যাণের পথে এই শক্তিকে নিয়োজিত করো। তরুণদের দোষ থাকিতে পারে ; কিন্তু এমন গুণও তো অনেক আছে---যা তোমাদের মধ্যে নাই। সেগুলিকে কেন স্বীকার করো না ? এই যে 'মহামেডান স্পোর্টিং' আজ মুসলমান জাতির জন্য নবগৌরব ও নব মহিমা বহন করিয়া আনিল, সমগ্র জাতির শিরায় শিরায় এক অপূর্ব উন্মাদনা ও কর্মপ্রেরণা জাগাইয়া দিল, সে কাহারা? সে ঐ তরুণ দল। কেন তবে তরুণকে ঘৃণা করিবে?

আর তরুণ! এই কি তোমার তারুণ্য! প্রাচীনকে অবজ্ঞা করা কি তোমার শোভা পায়? তরুণের ধর্মই হইতেছে প্রাচীনের বুকের উপরে দাঁড়াইয়া সে তার বিজয়-নিশান উড়াইবে। পুরাতনের সকল দৈন্য ও অক্ষমতাকে স্বীকার করিয়াই তরুণকে আসিতে হইবে। তরুণের এত প্রাণ আছে---এত সম্পদ আছে যে, প্রাচীনের দৈন্য ঘুচাইয়াও তার হাতে ঢের প্রাণ অবশিষ্ট থাকে। এই জন্যই তো তার জয়! তোমরা তরুণ, তোমাদের সেই অফুরন্ত প্রাণ-প্রাচুর্য কই? তোমরা কি রিক্তহস্তে আসিয়াছো? তোমরা কি তবে শক্তিহীন? যে তরুণ পুরাতনের সহিত নিজকে খাপ খাওয়াইতে পারে না, সে তরুণ জঈফ্---দুর্বল। পুরাতনকে অস্বীকার করাই হইতেছে পুরাতনকে স্বীকার করা। এই পরাজয়ের গ্লানি কি তোমরা বহন করিবে? না। তাহাদিগকে জয় করো। তাহাদের আস্থা অর্জন করো। তোমরা ফুলের মতো তরুণ হও। ফুল যখন ফুটে, তখন তাহারা পুরাতন কাণ্ডকে নীরব ভাষায় এই আশ্বাসই দেয় যে, তোমার কোনো ভয় নাই ; আমরা দক্ষিণ সমীরণে হাসিয়া খেলিয়া নাচিয়া গাহিয়া ঝরিয়া যাইব বটে ; কিন্তু যাবার বেলায় রাখিয়া যাইব তোমার শাখায় শাখায় অজস্র ফলের বিপুল সম্ভাবনাকে, আর বাড়াইয়া যাইব তোমার দেহের পরিপুষ্টি ও রূপশ্রীকে।

হে তরুণ! মনে রাখিও---দুরন্ত চপলতা তোমার বাহিরের প্রকৃতি ; কিন্তু তাপসের কৃচ্ছ্র সাধনা তোমার অন্তরের মূর্তি। তোমার পথ কুসুমাস্তৃত নহে, সে পথ অতি বন্ধুর। কঠোর ত্যাগ, সাধনা ও সংযমের পথ দিয়া

তোমাকে চলিতে হইবে। যে পথ দিয়া অষ্টাদশ বর্ষীয় তরুণ যুবক মোহাম্মদ বিন্‌-কাসেম মরু-দরী পার হইয়া সিন্ধু-বিজয়ে আসিয়াছিল, যে পথ দিয়া কিশোর বাবর ভারত জয় করিয়াছিল, যে পথ দিয়া আজিও বিশ্বের তরুণ কাফেলা এভারেষ্ট-বিজয়ে চলিয়াছে, সে-ই তোমাদের চলার পথ। সুন্দর, স্বাস্থ্যপূর্ণ, গৌরবোজ্জ্বল জীবনের বিকাশই হইবে তরুণের পরম সাধনা।

সত্যবার্তা

১৯৩৮

লুৎফর রহমান

মরহুম ডাঃ লুৎফর রহমান সাহেবের সহিত আমার প্রথম পরিচয় ঘটে সম্ভবতঃ ১৯১৬।১৭ সালে—যখন তিনি কলিকাতায় টেলার হোষ্টেলে থাকিয়া আই-এ পড়িতেন। আমিও সেই সময়ে টেলার হোষ্টেলে ভর্তি হইবার জন্য আসি। তখন হোষ্টেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ছিলেন তাঁহারই স্বগ্রাম (হাজিপুর) নিবাসী মৌলভী সিরাজুল ইসলাম এম-এ। তাঁহারই মধ্যস্থতায় আমরা উভয়ে উভয়ের সহিত প্রথম পরিচিত হই। তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। আমার বেশ মনে পড়ে—আমি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহারি মুখে তাঁহারি রচিত একটি কবিতা শুনিতেছিলাম। বলা বাহুল্য—প্রথম জীবনে তিনি কবিতাই লিখিতেন; এবং সে কবিতা-গুলির মধ্যে নবচিন্তা ও নবভাবের সমাবেশ থাকিত। তাঁহার কয়েকটি কবিতা বোধ হয় "আল্-এসলাম"-এ প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯২২।২৩ সালে পুনরায় কলিকাতায় তাঁহার সহিত সংস্পর্শ ঘটে। একদিন হঠাৎ তিনি আমার বাসায় আসিয়া জানান—তিনি 'নারীতীর্থ' খুলিয়াছেন, সে জন্য আমাদের সাহায্য ও সহানুভূতি চান। দুস্থ মানবতার জন্য মুখে তখন তাঁহার কী অপরিসীম বেদনা! 'নারীতীর্থে'র উদ্দেশ্য ও কর্ম্মপদ্ধতি কি হইবে, জিজ্ঞাসা করায় তিনি ব্যাখ্যা করিলেন—"পতিতা নারীদিগকে লইয়াই প্রথম আমি কাজ আরম্ভ করিব।—পাপের পথ হইতে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিব এবং তাহারা যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে, তজ্জন্য একটা নারীশিল্প-শিক্ষালয় খুলিব।" দেখিলাম একটা সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া তিনি এসব কথা বলিতেছেন না; লাঞ্ছিতা নারী-জাতির জন্য সত্য সত্যই তিনি বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের মুক্তির জন্য সত্যই তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। অল্প কয়েক দিনের [illegible] তিনি ৫১ নং

মির্যাপুর ষ্ট্রীটে একটি নারীশিল্পবিদ্যালয় খুলিলেন এবং সেখানে চরকায় সূতা কাটা ও বই-বাঁধাই প্রভৃতি কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা করিলেন। ৭।৮ জন পতিতা ও দুস্থা নারী নিয়মিতভাবে সেখানে আসিয়া কাজ শিক্ষা করিতে লাগিল। কলিকাতার ও মফঃস্বলের অনেক কাগজেও এই নব আন্দোলনের কথা প্রচারিত হইল এবং হিন্দু-মুসলমান সকলেই ডাক্তার সাহেবের এই প্রচেষ্টার প্রতি আর্থিক ও নৈতিক সহযোগিতা দেখাইতে লাগিলেন।

একদিনকার একটি ঘটনার কথা বলি। ডাক্তার সাহেব আসিয়া আমাকে বলিলেন: "চলুন, আজ আপনাদিগকে 'হাড়কাটা' গলির একটা বাড়িতে লইয়া যাইব; সেখানে আমার কয়েকজন শিষ্যা আছে।" আমাদেরও খুব কৌতূহল জন্মিল। আমরা ২।৩ জন ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে চলিলাম। জীবনে এ এক নব অভিজ্ঞতা। অতি সংকোচের সহিত আমরা 'হাড়কাটার' একটা বাড়ীতে ঢুকিলাম। একটি বেশ্যা লুৎফর রহমান সাহেবকে দেখিয়াই অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত আসিয়া গড় হইয়া তাঁহাকে 'প্রণাম' করিল। তারপর একে একে আরও ৩।৪ জন মেয়ে সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাঃ সাহেব তখন তাহাদিগকে বহু উপদেশ দিতে লাগিলেন। সে উপদেশ যে মেয়েরা প্রাণ দিয়া গ্রহণ করিল, তাহা বেশ বুঝা গেল।

ক্ষণকাল পরে একটি স্ত্রীলোক কয়েকটি পান সাজিয়া আনিয়া আমাদের সম্মুখে রাখিল। ডাক্তার সাহেব এবং আমার বন্ধুরা সে পান গ্রহণ করিলেন, কিন্তু আমি খাইলাম না। তাহা দেখিয়া ডাঃ সাহেব বলিলেন, "খান না? কোনো দোষ নাই। ওরা যখন পাপ-পথ ছেড়ে দিয়ে পুণ্যের পথে আসছে, তখন ওদেরকে ঘৃণা করবেন না। পথহারাদের পথে ফিরে আসতে [illegible] করুন।" আমি একটি পান মুখে দিলাম বটে, কিন্তু সংস্কারের বশে গা ঘিন্‌ঘিন্ করিতে লাগিল।

এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ সাহেব 'নারীশক্তি' নামক একটি পত্রিকাও প্রকাশ করিতে থাকেন। সে কাগজে প্রধানতঃ নারী-জাতির [illegible] অভিযোগের [illegible] আলোচিত হইত। আমিও মাঝে মাঝে ঐ কাগজে কবিতা [illegible]

কিন্তু মানুষ সব সময়েই অবস্থার দাস। অন্তরে প্রেরণা জাগিলে কী হয়। অনুকূল অবস্থা ও সুযোগ না জুটিলে বহু সৎপ্রতিষ্ঠানও ধ্বংস হইয়া যায়। ডাঃ লুৎফর রহমানের এই অভিনব প্রচেষ্টাও এই কারণে বেশীদিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। একে তো দেশবাসী আশানুরূপ সাহায্য করে নাই, তার উপর তিনি দৈন্য ও অভাবের তাড়নায় দিশেহারা হইয়া পড়িলেন। ইহার উপরে তিনি আবার মারাত্মক ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইলেন। স্ত্রী ও পুত্রকন্যা লইয়া কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

অবস্থার চাপে পড়িয়া বাধ্য হইয়া তিনি কলিকাতা ছাড়িয়া দেশে গেলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার পিতার সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল না। পুত্রের সব অদ্ভুত খেয়াল হয়তো পিতার ভালো লাগে নাই; তাই তিনি লুৎফর সাহেবকে কোনোরূপ সাহায্য করেন নাই। ডাঃ সাহেবও ত্যাজ্য পুত্রের মতো পিতার কোনো সাহায্য না লইয়াই স্বাধীন ভাবে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। ডাঃ লুৎফর রহমানের চরিত্রের এও একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁহাদের বাড়ীতে মস্ত বড় দালান; তাঁহার পিতার অবস্থা খুবই ভালো; জমাজমি, টাকাকড়ি যথেষ্টই তাঁহাদের ছিল; কিন্তু নিজের principle-কে বিসর্জন দিয়া তিনি ঐ অগাধ সম্পত্তি ভোগ করিবার জন্য লালায়িত ছিলেন না। তিনি পিতাকে ত্যাগ করিলেন, কিন্তু স্বীয় মত ও পথকে ত্যাগ করিলেন না। স্বগ্রাম হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্তী মাগুরায় আসিয়া তিনি এক কুটির বাঁধিলেন এবং কতিপয় পেটেন্ট ঔষধ আবিষ্কার করিয়া---তাহারি উপর নির্ভর করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। এই অবস্থায় একদিন তাঁহার মাগুরার বাসায় গিয়াছিলাম। তখন তিনি রোগে শয্যাগত। তাঁহার স্ত্রীর এবং ছেলে মেয়ের তখন কী কষ্ট। অথচ লুৎফর রহমান সাহেব তখনও অচল অটল।

ডাঃ লুৎফর রহমানের জীবন একটা ত্যাগ ও সংগ্রামের জীবন। সত্যের সন্ধানে তাঁহার ব্যথিত আত্মা সারাজীবন সংগ্রাম করিয়া ফিরিয়াছে। হয়তো তাঁহার মত ও পথ সর্বদাই অভ্রান্ত হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার সাধনার মধ্যে কোনোরূপ কৃত্রিমতা ছিল না। তিনি যাহা বলিতেন,

তাহা অন্তর দিয়া অনুভব করিতেন। সত্যদৃষ্টি ও গভীর অনুভূতি না থাকিলে তাঁহার বাণী কখনও আমাদের প্রাণে এমন করিয়া দাগ কাটিয়া বসিত না।

একটা সত্যকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে কতোখানি ত্যাগ ও সাধনা করিতে হয় এবং কিরূপ ভাবে প্রতিনিয়ত প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হয়, ডাঃ লুৎফর রহমান তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই সুমহান ত্যাগ, এই একনিষ্ঠ সাধনা এবং এই গভীর সত্যানুভূতিই ডাঃ সাহেবের চরিত্রের বিশেষত্ব। এই দিক দিয়া তিনি বাংলার মুসলিম সাহিত্যিক-দিগের মধ্যে অগ্রগণ্য। এতবড় সাধক-সাহিত্যিক আমাদের মধ্যে বোধ হয় আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই।

তাঁহার এই ত্যাগ, এই সত্য-সাধনা---ব্যথিত নিপাড়িত মানবতার প্রতি তাঁহার এই গভীর সহানুভূতি আমাদের মধ্যে নব রূপ লাভ করুক এবং তাঁহার পুণ্যস্মৃতি আমাদের জীবনে চির-জাগ্রত থাকুক, তাই প্রার্থনা করি।

মোয়াজ্জিন
১৯৩৮

ইসলাম ও সঙ্গীত

বন্ধুগণ,

সুরের পিয়ালা হাতে নিয়ে সুরসাকী আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আপনারাও সেই সুর-শারাবের রঙিন নেশায় আজ মশগুল্। কাজেই উভয়ের মাঝখানে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমি রসভঙ্গ করতে চাইনা। শুধু একটি প্রশ্ন আমি করতে চাই: সঙ্গীত মুসলমানদের জন্য জায়েজ তো ?

এই বিতর্ক-মূলক সমস্যার আমি কোনো সুদীর্ঘ আলোচনা করতে ইচ্ছুক নই। আমি প্রথমেই স্বীকার করে নিচ্ছি যে, এ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে দুইটি বিশিষ্ট মত আছে। একদল সঙ্গীতকে স্বীকার করেন, অন্যদল করেন না। উভয়েরই স্বপক্ষে-বিপক্ষে অনেক যুক্তিতর্ক আছে। তবে এই সংঘর্ষের মধ্য থেকে একটা অবিসম্বাদিত সত্য এই বেরিয়ে এসেছে যে, আলেম-সমাজ সঙ্গীতের উপর ১৪৪ ধারা জারী করা সত্বেও যুগে যুগে দেশে দেশে মুসলমানেরাই কিন্তু সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ সাধক রূপে পরিগণিত হয়ে আসছে।

হজরত মুহম্মদের পূর্ববর্তী পয়গম্বরদিগের সময় থেকেই সঙ্গীতের ধারা ব'য়ে আসছে—একটানা স্রোতে। হজরত দাউদ তাঁর সুললিত কণ্ঠসঙ্গীতের জন্য (লেহানে দাউদী) চিরপ্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। হজরত মুসা যখন বনি-ইসরাইলদেরকে নিয়ে নীল নদ পার হয়ে যান, তখন বনি-ইসরাইল রমণীরা আনন্দে অধীর হয়ে দফ্ বাজিয়ে গান করতে থাকে। হজরত মুহম্মদের সময়েও আরব দেশে সঙ্গীতের অবাধ প্রচলন ছিল। নির্দোষ ও পবিত্র সঙ্গীতে আমাদের প্রিয় নবীর যে কোনোই আপত্তি ছিল না, কয়েকটি হাদিস থেকে তা আমরা জানতে পারি। বস্তুতঃ পবিত্র কুরআন এবং হাদিসে এমন কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ নাই যে সঙ্গীত মুসলমানের জন্য বিলকুল্ হারাম। তা যদি থাকতো, তবে হজরতের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই খলিফাশ্রেষ্ঠ হজরত ওমর নিজেই সঙ্গীত রচনা করতেন না। তিনি সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ 'ইবনে-সুরঈদের' উৎসাহদাতা ছিলেন। খলিফা হজরত

আলী ও হজরত মাবিয়া উভয়েই সঙ্গীতের আলোচনা করেছেন। খলিফা অলিদ একজন প্রসিদ্ধ বীণাবাদক ছিলেন। খলিফা আবু আব্বাস এবং মনসুর সঙ্গীত ও অন্যান্য ললিত-কলার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। খলিফা হারুন-অল্-রশিদের নাম না করলেও চলে। বস্তুতঃ খলিফাদের সময়ে বাগদাদ, পারস্য, কর্ডোভা ও গ্রানাডাতে সঙ্গীতের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। ইতিহাস তার সাক্ষী।

অন্য পরের তো কথাই নাই, স্বয়ং খলিফাতুল-মু'মিনিনদিগের সম্বন্ধেই এই কথা!

তারপর ভারতবর্ষ। সুদীর্ঘ মুসলিম শাসনে ভারতীয় সঙ্গীত মুসলমান-দিগের হাতে এক নবজীবন লাভ করেছে। ভারতীয় সঙ্গীতের চারটি বড় বিভাগ আছে : (১) ধ্রুপদ (২) খেয়াল (৩) টপ্পা (৪) ঠুংরি। আপনারা শুনে হয়তো বিস্মিত হবেন যে, একমাত্র ধ্রুপদ ছাড়া অন্য তিনটি বিভাগই মুসলমানদিগের সৃষ্টি। হিন্দু-সাধকেরা সঙ্গীতকে ধ্রুপদের কারা-প্রাচীরে বদ্ধ ক'রে রেখেছিলেন। মুসলমান এসে তাকে মুক্তি দিয়েছে; অন্তহীন সম্ভাবনার আলোকে এনে তাকে দাঁড় করিয়েছে। প্রবাদ আছে যে, সম্রাট আলাউদ্দীনের সভাকবি ও সভাগায়ক আমির খসরুই খেয়াল গানের স্রষ্টা। খেয়াল গানের উৎকর্ষ যখন চরমে পৌঁছায়, তখন পাঞ্জাবের শোরী মিঞা টপ্পা গানের প্রচলন করেন। কিছুকাল পরে লাক্ষ্ণৌ-এর সনদ ও কদরের প্রতিভায় ঠুংরি গানের জন্ম হয়।

মুসলমান আমলে আমির খসরু, তানসেন, ধোঁধি খাঁ, সুরয খাঁ, চাঁদ খাঁ, শোভন খাঁ, শোরী, হমদম, মৌলাদাদ, ইলিয়াস, গোলাম নবী, সনদ, কদর, সদারঙ্গ, অদারঙ্গ, খুশাল খাঁ, নবাব ওয়াজেদ আলি প্রভৃতি অসংখ্য ক্ষণজন্মা সঙ্গীত-প্রতিভা জন্মলাভ করেছে। ভারতীয় মুসলমানের এই অধঃপতনের যুগেও আর-কিছুতে না হোক—অন্ততঃ সঙ্গীতে মুসলমান সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। আলাবন্দে খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, নাসিরুদ্দীন খাঁ, আব্দুল করিম খাঁ, হাফিজ আলী খাঁ, আলাউদ্দীন খাঁ, এনায়েৎ খাঁ, জমিরুদ্দীন খাঁ প্রভৃতি অসংখ্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুরশিল্পীর নাম এখনও আমরা সগৌরবে উচ্চারণ করতে পারি।

শুধু গায়ক হিসাবে নয়,—রাগ-রাগিণীর দিক দিয়েও সঙ্গীতে মুসলমানের দান অপরিসীম। বহু নূতন রাগ-রাগিণী মুসলমান সুরশিল্পীরা স্বষ্টি করে গেছেন। আড়ানা, মিয়াঁ-মল্লার, মিয়াঁ সারঙ্গ, মিয়াঁকি জয়জয়ন্তী, হোসেনী কানাড়া, দরবাড়ী কানাড়া, দরবারী তোড়ী, বাহার ইত্যাদি বহু রাগ-রাগিণী মুসলমানদের দান।

এইবার সাধারণ ভাবে একটু আলোচনা করা যাক। সঙ্গীত মানুষের এত প্রিয় কেন? হাজার হাজার ফতোয়াও মানুষকে সঙ্গীত থেকে বিরত রাখতে পারে না কেন? তার কারণ—সঙ্গীতের সঙ্গে মানব-মনের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। এই নিখিল স্বষ্টির মূলে আমি শুধু দুইটি উপাদানই লক্ষ্য করি : এক হচ্ছে সুর, আর হচ্ছে নূর। সুর আর নূরের ভিতরেই স্বষ্টি ডুবে আছে। আকাশে তাকাও, পাতালে তাকাও—সর্বত্র রূপের লীলা-খেলা। পথে-প্রান্তরে অন্তরে-বাহিরে—যেদিকে যখনি কান দাও,—সর্বত্র সুরের লীলা-তরঙ্গ। বিশ্ব-বীণাব তারে তারে নিশিদিন অবিশ্রান্ত সুর ধ্বনিত হচ্ছে। কান পাতলেই তা শুনা যায়।

এই সুর আর নূরের উপাদান মানুষের মনের মধ্যেও লুকিয়ে আছে। সুর আর নূরে তাই মানব-মন এমন ক'রে সাড়া দেয়। এ সম্বন্ধে একটা সুন্দর প্রবাদ-বাক্যও আছে। কথিত আছে যে, আদিমানব হজরত আদমের দেহ-স্বষ্টির পর তাঁর দেহাভ্যন্তরে (কল্‌বের মধ্যে) যখন খোদা তা'লা রুহ্ (আত্মা) প্রবিষ্ট করান, তখন রুহ্ সেখানে থাকতে চাইলো না,—ছট্‌ফট্ করে বেরিয়ে এলো। তখন খোদা তা'লা ফেরেশ্‌তাদিগকে সেই কল্‌বের কুঠ্‌রিতে আলো দিতে বললেন। অপূর্ব রূপচ্ছটায় কল্‌ব আলোকিত হয়ে গেল। তখন রুহ্‌কে পুনঃপ্রবিষ্ট করান হলো। এবারও রুহ্ থাকতে চাইলো না। তখন খোদাতালার হুকুম হলো—কল্‌বের চারিদিকে সুমধুর বাদ্যধ্বনি করো। এইবার রুহ্ শান্ত হয়ে আদমের দেহে রয়ে গেল।

এই উপাখ্যানের মূলে গভীর সত্য নিহিত আছে। বাস্তবিকই সুর আর নূরই হচ্ছে নিখিল স্বষ্টির দুই মৌল উপাদান। এই যে বিশ্ব-প্রকৃতি নিতি নব ভাবে এমন রূপ-সুষমায় প্রকাশ পাচ্ছে; এই যে ফুল ফুটছে, চাঁদ হাসছে; দিকে দিকে লোকে লোকে এই যে সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি

উত্থিত হচ্ছে, এ একেবারে নিরর্থক নয়। বিরাট বিশ্বের সমবেত আত্মাকে মশগুল করে রাখবার জন্যই খোদা তা'লার এই বিপুল আয়োজন। বিশ্বের বিরহী আত্মা এই পরের ঘরে থাকতে চায়না; ছুটে যেতে চায় তার পরম প্রিয়জনের খোঁজে, তাই খোদা তা'লা তাঁর রূপ ও তাঁর সুরের পরশ দিয়ে তাকে শান্ত ক'রে রেখেছেন। প্রিয়জনের দেখা সে পায় না বটে, কিন্তু পায় তার একটু আভাস---একটু মৃদু-গুঞ্জন। বস্তুত সেই অজানা অচেনা প্রিয়তমকে খুঁজতে হলে আমাদের কাছে তাঁর শুধু এই দুইটি নিদর্শনই আছে---সুর আর নূর। যে-মানুষের অন্তর এই দুটি পথের ইঙ্গিতকেই অস্বীকার করে, তার কোনো আশা-ভরসা নাই। **Shakespeare** এই রকম লোক সম্বন্ধেই বলেছেন---তারা ''fit for treason and murder'.

মানুষের জীবনে ললিত-কলার প্রয়োজন আছে। যে জাতীয়-উন্নতির দোহাই দিয়ে সঙ্গীত ও অন্যান্য কলাবিদ্যাকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়, সেই জাতীয় উন্নতির জন্যও এর অপরিহার্য প্রয়োজন। সুন্দরের সাধনা মানুষের মনকে সুন্দর করে, অসুন্দরকে ঘৃণা করতে শিখায়। যার মনে সৌন্দর্যবোধ জন্মেছে, সে ভিতরে বাহিরে কোনো দিক দিয়েই অসুন্দরের সঙ্গে মিতালি করতে পারে না। তাজমহলের সৌন্দর্য যদি আমায় পাগল করে তোলে, তবে কুঁড়ে ঘরে নোংরা জীবন যাপন করতে আমার সাধ যায় না। একটা অভাবের তীব্র অনুভূতি আমার সারা চিত্তকে চঞ্চল করে তোলে। আজ ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে প্রতি কার্যে আমরা অসুন্দরকে নিয়ে ঘর করছি। আমাদের যা আছে, তাতেই আমরা সন্তুষ্ট হতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের চোখের সামনে আজ কোনো সুন্দরের আদর্শ নেই; অসুন্দরকে জয় করে আমরা সুন্দর হবো, পূর্ণ হবো---এই সাধনাও নেই। এর প্রধান কারণ---আমাদের জীবনে সৌন্দর্য ও সুর নেই---উচ্ছৃঙ্খল এলোমেলো জীবন আমরা যাপন করছি; তার মধ্যে কোনো নিয়ম-শৃঙ্খলা বা তাল নেই। তালকে আমরা হারাম বলে দূরে সরিয়ে রেখেছি; কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না যে, তালই হচ্ছে নিখিল সৃষ্টির গূঢ় রহস্য। বিশ্ব-প্রকৃতি ছন্দতালে পরিপূর্ণ। ঋতুচক্রের আবর্তনের নৃত্যে কোনোদিন তাল কাটে না। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্ত---সবাই তালে

তালে নেচে যায়, কেউ কারো আগে-পাছে আসে না। গাছে গাছে ফুল ফোটে, ফল ধরে---সবই তালে তালে। চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-নক্ষত্র তালে-তালেই আসে, তালে তালেই চলে যায়। আমাদের শিরায়-শিরায় ধমনীতে-ধমনীতে যে রক্ত-প্রবাহ বয়ে চলেছে, তার মধ্যেও রয়েছে তাল। কী সুন্দর তালে তালেই না নাড়ী আমাদের স্পন্দিত হচ্ছে। মানুষ যে স্বাভাবিক ভাবে হেঁটে যায়, তার মধ্যেও দেখা যায় তাল। একটা পা বেতালে ফেলেছে কি দড়াম করে পড়ে যাবে। বস্তুতঃ তাল কেটে গেলে সৃষ্টির সব কিছুই অচল হয়ে যায়। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, মুসলমানের চলার ছন্দে তালের কোনো স্থান নেই। সুর, তাল বা রূপ আমাদের জীবনে নিষিদ্ধ।

অবশ্য একটা কথা আছে। আমাদের আলেম-সমাজ সঙ্গীতকে যে না-জায়েজ বলে ফতোয়া দিয়েছেন, তারও কি কোনো সঙ্গত কারণ নেই? নিশ্চয়ই আছে। সঙ্গীত বলেই যে সঙ্গীত হারাম, তাও যেমন নয়, আবার সঙ্গীত বলেই যে সঙ্গীত হালাল, তাও তেমনি নয়। প্রত্যেক জিনিসেরই ভালো-মন্দ আছে। সঙ্গীত একটি তলোয়ার বিশেষ। যার হাতে যখন থাকে তার ইঙ্গিতেই চলে। ভালো লোকের হাতে থাকলে ভালো ফল হয়, মন্দ লোকের হাতে থাকলে মন্দ ফল হয়। এমন যে হালাল জিনিস ভাত, তাকেও পচিয়ে খেলে হারাম হয়ে যায়। কাজেই সর্বত্র আমাদের বিচার-বুদ্ধির প্রয়োজন। সঙ্গীত মানুষকে উন্নতির দিকেও তুলে নিতে পারে, আবার ধ্বংসের মুখেও ঠেলে দিতে পারে। সঙ্গীতের আসক্তি কতো জাতির পতনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এটাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। অবশ্য এটা সঙ্গীতের দোষ নয়; ব্যবহারকারীর দোষ।

কোন্ পথে চলবে তবে? মুসলমানের সঙ্গীত সাধনা করা উচিত, না অনুচিত? অন্য কথায় আবার সেই পুরাতন প্রশ্ন : ইসলামে সঙ্গীত জায়েজ, না না-জায়েজ?

আমার মতে ইসলামে সঙ্গীত জায়েজও বটে, না-জায়েজও বটে। ইসলামে সঙ্গীত নিষিদ্ধও বটে, আবার ইসলামই সঙ্গীতের প্রকৃষ্ট বিকাশ-ক্ষেত্রও বটে। কেমন করে, বলছি :

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কেমন করে তৈরী হয়, তা বোধ হয় সকলেই আপনারা জানেন। এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক উভয় ঔষধের উপাদান একই ; তবে এলোপ্যাথিক স্থূল, আর হোমিওপ্যাথিক সূক্ষ্ম। হোমিওপ্যাথিক মতে যে ঔষধ স্থূলকে এড়িয়ে যতোই উর্দ্ধে উঠে যায়, ততোই তার শক্তি বেড়ে যায়।

সঙ্গীতেরও এমনি দুই রূপ। একটি এলোপ্যাথিক সঙ্গীত, আর একটি হোমিওপ্যাথিক সঙ্গীত। যে সঙ্গীত স্থূলকে এড়িয়ে যতো উর্দ্ধে উঠবে, সেই সঙ্গীত ততো সুন্দর ও সার্থক হবে। এই কারণেই নারী-কণ্ঠের গান আমাদের এত ভালো লাগে। তার মধ্যে সুর অপেক্ষা সুরের ইঙ্গিতই থাকে বেশী। বলা বাহুল্য, এই ইঙ্গিতই হচ্ছে সঙ্গীতের প্রাণ। সঙ্গীতের চরম সার্থকতা সেইখানে—যেখানে সে অনির্বচনীয়কে রূপ দিতে পারে। যে সঙ্গীত সান্তের মধ্যে অনন্তকে রূপায়িত করে তোলে---সসীমের বুকে অসীমের ছায়া ফেল্‌তে পারে---সেই সঙ্গীতই শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত। বলা বাহুল্য মুসলমানের কণ্ঠেই এই উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত বেশী করে ধরা পড়ে : তার কারণ—মুসলমান অসীমের ধোয়ানী ; জড়ের পূজা সে করে না, সে করে নিরাকারের উপাসনা। তাই তার কণ্ঠে ফুটে ওঠে সেই অনির্বচনীয়—অব্যক্তের ইঙ্গিত, আর তাতে করেই সে হয়ে ওঠে উচ্চ শ্রেণীর সুরশিল্পী। মুসলমানদের মধ্যে এত যে ওস্তাদ, তার প্রধান কারণই হচ্ছে এই।

ইসলাম এই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পক্ষপাতী। যে কারণে সে পৌত্তলি-কতার বিরোধী, সেই কারণে সে স্থূল সঙ্গীতেরও বিরোধী। স্থূল সঙ্গীত যেন সঙ্গীতের সাকার মূর্তি ; মুসলমানেরা সে সঙ্গীতের পূজারী নয় ; সে সঙ্গীত তাদের জীবনে খাঁপও খায় না। সে চায় অশরীরী সঙ্গীত ---বেতার যন্ত্রে তার যাওয়া আসা, আর তাকে শুনতে হলে মনের গোপন গহনে বসে অন্তরের **Receiver** দিয়ে শুনতে হয়। যাঁরা অলী-আল্লা, সাধক বা দরবেশ, তাঁরা এই অশরীরী সঙ্গীতই শুনে থাকেন। বাণী যেখানে স্তব্ধ হয়ে যায়, সেখান থেকে তাঁরা যাত্রা শুরু করেন।

বন্ধুগণ!

বর্তমান যুগে বাঙালী মুসলমানের সঙ্গীত-সাধনা সম্বন্ধে দু'চার কথা না বললে আমার এই আলোচনা নিতান্তই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আজ মনে পড়ে দীর্ঘ পঁচিশ বছর আগের কথা। বাংলার মুসলিম যুবকদের মধ্যে তখন সঙ্গীতের অনুরাগ জন্মেছে। ভিতরে ভিতরে তারা গান গাইবার জন্য খুবই আগ্রহান্বিত ছিলেন, কিন্তু সমাজের কঠোর শাসনের ভয়ে প্রকাশ্যে কেউই গান করতে সাহস করতেন না। সে যুগে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক কে, মল্লিক পর্যন্ত নিজের নাম প্রকাশ করতে সাহস করেন নি। তখন যারা গান গাইতেন, তাদের বাধ্য হয়ে অনৈসলামিক গানই গাইতে হতো; জাতীয় আশা-আকাঙ্খা বা ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সে সব গানের তেমন কোনো সঙ্গতি বা সংযোগ ছিল না। পরের গান গেয়ে গেয়ে শুধু তারা সুরের নেশা মেটাতেন। এই অভাব মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলাম বলে প্রথম থেকেই আমি জাতীয় ভাবধারার অনুসারী সঙ্গীত রচনা করে সমাজে প্রচার করেত প্রয়াস পাই। "জাগরে সুপ্ত স্বজাতি আমার," "রুদ্ধ দ্বার আজ মুক্ত কর্ তোর, ওঠ্ জেগে ভাই মুসলেমিন," ইত্যাদি আমার কতিপয় জাতীয়-সঙ্গীত সেই যুগের রচিত। উর্দু-গজল ও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের চমকপ্রদ সুর বাংলা ভাষায় আমদানি করা যায় কি না, সে খেয়ালও আমার মনে জেগেছিল। সৌভাগ্যক্রমে তখন মুসলিম বাংলার খ্যাতনামা সুরস্রষ্টা 'খসরু' সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। তৎকালে তিনি কলিকাতায় এবং মফঃস্বলে একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী গায়ক রূপে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁরি ইঙ্গিতে আমি সর্বপ্রথম গজলের সুর "যাও প্রভাত সমীর যাও, মোর দিল্-দরদীর কাছে যাও" এই গানটি রচনা করি। এটি খসরু সাহেবের প্রিয় সঙ্গীত "আয় বাদে সবাহ্ কর্না, ইত্নি তু খবর যা কর্" গজলেরই সুরের অনুকরণ। "কবে যে আস্বে তুমি মোর আঙিনাতে" এই গজলটিও আমি ওস্তাদ জমীর উদ্দীন খানের একটি উর্দু গজলের অনুকরণে লিখি। উপরোক্ত দুইটি গজলই ১৯২০ সালের "সঙ্গীত-বিজ্ঞানে" স্বরলিপিসহ প্রকাশিত হয়। এর কিছুদিন পরেই কবি নজরুলের "কে বিদেশী বন উদাসী"

ও ''আসে বসন্ত ফুলবনে''' শীর্ষক দুইটি বাংলা গজল প্রকাশিত হয়। এই দুইটি গানের অপূর্ব সুর ও গীত-ভঙ্গী তখন সারা বাংলার আকাশ-বাতাসকে আচ্ছন্ন করে ফেল্‌লো ; সারা বাংলা দেশ যেন এক নূতন সম্পদ লাভ করলো। ঘুমন্ত সুরসাকী বাংলায় নূতন বেশে নূতন মূর্তিতে দেখা দিল। ডি, এল, রায় ও রবীন্দ্রনাথ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা খাতে তিনি যে বাংলার সঙ্গীতকে প্রবাহিত করতে পেরেছেন, এ তাঁর মস্ত বড় কৃতিত্ব। এখানেই নজরুলের আসল মৌলিকত্ব। নজরুল একটা বিশিষ্ট সঙ্গীত-ভঙ্গীর প্রবর্তক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

নজরুলের আর একটি বিশিষ্ট দান---ইসলামী বাংলা গজল। আমি যখন ইসলামী গান রচনা করতাম, তখন অতি-আধুনিক কোনো কোনো সাহিত্যিক বন্ধু আমাকে ''মিশনারী কবি'' বলে বিদ্রূপ করতেন। কিন্তু নজরুলের প্রথম ইসলামী গান ''ও মন রমজানের ওই রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ'' যখন রেকর্ডে প্রকাশিত হলো, তখন বন্ধুগণ নীরব হলেন। ইসলামী ভাবধারা বজায় রেখেও যে বাংলায় সঙ্গীত রচনা করা চলে, এ বিশ্বাস তখন তাঁদের এলো। সেই থেকেই বাংলায় ইসলামী গানের প্রচলন আরম্ভ হয়। মুসলিম বাংলা-সাহিত্যে নজরুলের এও এক নূতন দান।

কিন্তু নজরুলের এই দান---যা সমগ্র সমাজ আজ শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করেছে---তা হয় তো সার্থক হতো না---যদি না আর একজন সুরের দুলাল তাঁর পাশে এসে দাঁড়াতো---আমি সুধাকণ্ঠ আব্বাসউদ্দীনের কথাই বলছি। নজরুল ও আব্বাসের মিলনে আজ মুসলিম বঙ্গ এই অপরূপ সম্পদ ভোগ করবার সৌভাগ্য লাভ করেছে। আব্বাসের অপূর্ব কণ্ঠ মুসলিম-বঙ্গের ঘরে ঘরে, মাঠে-মাঠে, পথে-প্রান্তরে ইসলামী ধ্যান-ধারণাকে মূর্ত করে তুলেছে। মুসলিম বাংলার জাগরণের ইতিহাসে সেইজন্যই আব্বাসের নাম অমর হয়ে থাক্‌বে। জাতির জীবন-তরুর মূলে মালীর মতো সে রস-ধারা সিঞ্চন করেছে। নজরুলের সমসময়ে তার আবির্ভাব তাই একটা আশীর্বাদের মতোই মনে হয়।

বাংলা সঙ্গীতে কবি জসীমউদ্দীনের দানও তুচ্ছ নয়। মডার্ণ

ভাটিয়ালী নয়—যে ভাটিয়ালীতে বাংলার অন্তরের রূপ প্রকাশ পেয়েছে, সেই খাঁটি ভাটিয়ালী গানকে তিনিই সর্বপ্রথম জনসাধারণে প্রকাশ করেছেন।

এইখানে **His Master's Voice** গ্রামোফোন কোম্পানীকেও ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না। আজ যে মুসলিম বঙ্গের ঘরে ঘরে ইসলামী সঙ্গীতের সুর ধ্বনিত হচ্ছে—তা মোটেই সম্ভব হতো না, যদি না তারা এই সব সঙ্গীতকে রেকর্ড করতেন।

রাজনৈতিক দৃষ্টিতেও সঙ্গীতের বিশিষ্ট মূল্য আছে। সঙ্গীত মানুষের মনকে প্রশস্ত করে—সব ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে এক প্রেম-সুন্দর আনন্দ-লোকে নিয়ে যায়। বিবদমান দুই জাতির দেশ-নেতাদের জন্য এখানে বেশ খানিক চিন্তার খোরাক মিলবে।

বন্ধুগণ!

আমার বক্তব্য শেষ হয়েছে। সঙ্গীত আমাদের জীবনে অনির্বচনীয়ের স্পর্শ আনুক, সমস্ত ক্ষুদ্রতার গণ্ডী কেটে ঊর্ধ্বে উঠবার শক্তি দিক; মনের দিকচক্রবালকে সম্প্রসারিত করুক, আমাদের সকল কাজে সৌন্দর্য সঙ্গতি ও শৃঙ্খলা আনুক—সকল মলিনতাকে ধুয়ে দিয়ে সে আমাদেরকে সুন্দর, সরস ও পবিত্র করুক,—এই কামনা করি।

*বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশনে (কলিকাতা, ১৯৩৯) সঙ্গীত-শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয়বাদ

অধিকাংশ পাঠকই বলেন : রবীন্দ্রনাথকে বুঝিনা, তাঁর কাব্য দুর্বোধ্য ও হেঁয়ালিপূর্ণ। 'অত্যন্ত রাবীন্দ্রিক' বলে অনেক অনুকরণ-প্রয়াসী তরুণ কবিকে আমরা উপহাসও করি। কিন্তু আমার মতে রবীন্দ্র-কাব্যের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তাঁর এই অস্পষ্টতা। অন্য কথায় যেটা তার নিন্দার সেইটেই তাঁর শ্রেষ্ঠগুণ। অন্যান্য কবিদের কাব্যে ভাবের সূক্ষ্ম অনুরণন নাই, অনির্বচনীয়তার স্পর্শ নাই; অসীমের ইংগিত নাই, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সুকুমার ব্যঞ্জনা নাই; কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যে এই সব বৈশিষ্ট্য পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান।

এখন কথা উঠবে: শ্রেষ্ঠ কাব্যের এই কি লক্ষণ? এই ভাবালুতা, এই দুর্বোধ্যতা, এই অনির্বচনীয়তা—এই কি তার মাপকাঠি? তা হলে প্রাক্-রবীন্দ্র যুগের অথবা রবীন্দ্রোত্তর যুগের বস্তুবাদী কবিদের সম্বন্ধে কী বলা যাবে? হেম-নবীন-মাইকেল এবং পরবর্তী যুগের অনেক কবিই তো স্থূল এবং বস্তুতান্ত্রিক। তাঁদের কাব্য কি অপাংতেয়? ভাবের স্বচ্ছতা বা ঋজুতা কি কাব্যের ক্রটির লক্ষণ? কোন্ কাব্য তা হলে শ্রেষ্ঠ কাব্য?

এক কথায় এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। এক একটা যুগে কাব্য শিল্প ও সাহিত্য এক একটা বিশেষ রূপে প্রকাশ পায়। কোনো একটা বিশেষ রূপকে তাই শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। হেলেন, শকুন্তলা, ক্লিওপেট্রা, নূরজাহাজ, বা অতি আধুনিকা যে কোনো চিত্রতারকা —প্রত্যেকের রূপসজ্জা পৃথক এবং স্বতন্ত্র, কিন্তু তা সত্বেও তারা যে সবাই সুন্দরী একথা কেউ অস্বীকার করবে না। কাব্যেও তাই। কাব্য-সুন্দরী নিরাভরণা হয়ে আসলেও যেমন মধুর লাগে, রতনে-ভূষণে সজ্জিতা হয়ে লীলাভরে আসলেও তেমনি মধুর লাগে। আসল বস্তু রূপ। রূপের অভাব

হলে সাজ-সজ্জা কোনোই কাজে লাগে না। অবশ্য রূপ ও রসের প্রকার-ভেদ আছে। সব রূপ বা সব রসই সবাইকে সমান আনন্দ দেয় না। এক এক জনের এক এক বিশেষ রূপ বা রস ভালো লাগে। খাদ্য বস্তুকে যে রুচি-বোধে আমরা গ্রহণ বা বর্জন করি, কাব্য ও রসবস্তুর বিচারেও আছে সেই রুচি-বোধ। ব্যক্তিগত রুচির তারতম্যে কোনো কোনো বিশেষ বস্তু আমাদের হয়তো বিশেষ ক্ষণে ভালো লাগে, কিন্তু তাই বলে একথা বলা যাবে না যে, অপরগুলি নিকৃষ্ট। একটা খাবার দোকানে গেলে এ তত্ত্বের মীমাংসা সহজ হয়। মনে করুন এমন একটা ময়রার দোকানে আমারা কয়েকজন বন্ধুবান্ধব উপস্থিত যেখানে সন্দেশ, রসগোল্লা, পানতোয়া, রাজভোগ ইত্যাদি থরে থরে সাজানো আছে। এখন যদি প্রশ্ন জাগে যে কোন্ বস্তুটি সবচেয়ে সেরা, সেইটিই আমরা খাবো, তা হলে সে প্রশ্নের সুমীমাংসা কিছুতেই হবে না। ফলে কিছু না-খেয়েই হয়তো আমাদের ফিরতে হবে, আর না হয়তো এমন জিনিস খেতে হবে যা সবাই তুল্যরূপে উপভোগ করবে না। সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে—যে যা খেতে চায় সেই মতো অর্ডার দেওয়া, অথবা নির্বাচিত কয়েক প্রকারের খাবার একসঙ্গে ভাগাভাগি করে খাওয়া।

এখানে তুলনাটা হয়তো সর্বাঙ্গসুন্দর হলো না। কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, একই ময়রার দোকানে যখন বিভিন্ন মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়, তখন একই কবির রসুইখানায় কেন বিভিন্ন ধরনের কাব্য সৃষ্টি হবে না?

তুলনাটা একটু ব্যাপক ভাবে নিলে আর এ প্রশ্নের অবসর থাকবে না। একই ময়রার দোকানে বসে ছানার তৈরী বিভিন্ন ধরনের মিষ্টান্ন খাওয়া সম্ভব। কিন্তু এমন যদি হয় যে, গ্রাহকদের কেউ কেউ সন্দেশ, রসগোল্লা খেতে চায়, কেউ বা চায় কোর্মা-পোলাও, আবার কেউবা চপ-কাটলেট, তখন কেমন হবে? ময়রার দোকানে কোর্মা-পোলাও পাওয়া যাবে না, কোর্মা-পোলাও-এর দোকানেও সন্দেশ-রসগোল্লা পাওয়া যাবে না। প্রত্যেক জিনিসটির জন্য তখন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দোকানে যেতে হবে।

কাব্য-বিচারেও এই নীতি মানতে হবে। একই কবির কাছে সব জিনিস পাওয়া যাবে না। এক একটা বিশেষ বস্তুই এক একজন দিতে

পারেন। পাঠকের উচিত বিশেষ বিশেষ স্থান থেকে বিশেষ বিশেষ বস্তু সংগ্রহ করা।

বিশ্ব-সৃষ্টির মূলে রয়েছে তাই রূপ-বৈচিত্র্য। একই বস্তু রূপে রসে বর্ণে গন্ধে বহু হয়ে প্রকাশ পায়। গোলাব, যুঁই, চামেলি, বকুল প্রত্যেকেই সুন্দর। আম, জাম, লিচু, আঙুর, আপেল প্রত্যেকেই সুমিষ্ট। এই বৈচিত্র্য না থাকলে কোনো বস্তুই পূর্ণ হতো না। বিশ্ব-প্রকৃতিতে তাই একই বস্তুর বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। এদের মধ্যে ফার্স্ট, সেকেণ্ড, থার্ড, ফোর্থ নেই;—এক সুন্দর মিলনধর্মী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আপন মহিমায় মধুর হয়ে আছে।

কাব্য-বিচারে তাই কার চেয়ে কে বড়, এ প্রশ্ন অচল। হাফিজ বড় না রুমী বড়, শেলী বড় না মিলটন বড়, মাইকেল বড় না রবীন্দ্রনাথ বড়, এ প্রশ্ন অগ্রাহ্য। প্রত্যেকের দানেই নতুন রূপ ও নতুন রসের আস্বাদ আছে এবং প্রত্যেকেরই প্রয়োজন আছে, মূল্য আছে। মাইকেলের গম্ভীর তেজো-দৃপ্ত ভঙ্গীরও যেরূপ প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথের সুকুমার অনুভূতির মৃদু গুঞ্জনও তেমনি প্রয়োজন। কাজেই এদের মধ্যে স্থান বা মান নির্ণয়ের কোনোই প্রশ্ন জাগে না। এখানে প্রকৃতপক্ষে কাব্যের প্রশ্ন নয়, আঙ্গিকের বা প্রকাশ-ভঙ্গীর প্রশ্ন। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব-সুরীরা সহজবোধ্যতা ও স্বচ্ছতাকেই কাব্যের প্রাণ বলে মেনে নিয়েছিলেন, তাই সহজ ও স্থূল মূর্তিতেই তাঁরা তাঁদের ভাবকে প্রকাশ করেছেন। ভাবের মৌলিকতা, গভীরতা, সহজবোধ্যতা, উপমার মাধুর্য, অনুপ্রাস, শব্দ-সঙ্গীত—এই সবই ছিল পূর্ববর্তী কবিদের কাব্য বৈশিষ্ট্য। শুধু বাংলা কাব্যে নয়, ইংরাজী ফার্সী ইত্যাদি ভাষার কবিতাতেও এই সব গুণই লক্ষ্য করা গেছে। যার যা বক্তব্য প্রাঞ্জল ভাষায় তা তিনি বলেছেন। হেঁয়ালীকে তাঁরা বরং বর্জন করেছেন। সহজ প্রকাশ-গুণের মধ্যে যে সৌন্দর্য আছে, সেই সৌন্দর্যই ছিল তাঁদের কাব্যের প্রাণ। ভাবের অভিনবত্বে ও প্রকাশের চমৎকারিত্বে তাঁরা পাঠকের চিত্ত জয় করেছেন। কাজেই, একথা বলা যাবে না যে, ভাবের বক্রতা, অস্বচ্ছতা বা সূক্ষ্মতা না থাকলে কাব্য হয় না। আর্টিষ্টিক হলে সরলতাই হয় সৌন্দর্যের বাহন।

কাব্যে, সাহিত্যে বা আর্টে সরলতা (**Simplicity**) বা সহজবোধ্যতা (**Expressiveness**) তাই এক বিশেষ সৌন্দর্য-লক্ষণ।

এই দৃষ্টিভংগীতে দেখলে রবীন্দ্র-কাব্য যে আভিজাত্যপূর্ণ, সহজবোধ্যতা বা সরলতা-গুণ যে তাতে অপ্রচুর—সে কথা না বলে উপায় নেই। রবীন্দ্র কাব্য পড়তে গেলে বিশেষ এক মন, বিশেষ এক রুচি এবং বিশেষ এক ভংগী নিয়ে পড়তে হয়। অবিশ্যি তাঁর বর্ণনামূলক কবিতা সম্বন্ধে এ কথা খাটবে না ; তাঁর উচ্চাংগের দার্শনিক কবিতার কথাই বলছি। গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, বলাকা, সোনার তরী, নৈবেদ্য ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে যেখানে তিনি মরমপন্থী (**Mystic**) সেখানে সাধারণ পাঠকের একরূপ প্রবেশ নিষেধ। সাধারণ পাঠকের নিকট রবীন্দ্রনাথ সত্যই দুর্বোধ্য।

কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যের এই বিচারই যে সঙ্গত হলো, তাই বা কি করে, বলা যায়। পাঁচালি বা ছড়া তো খুব সহজবোধ্য। তাই বলে কি তাকে শ্রেষ্ঠ কাব্য বলা হবে? কখনোই না। কাব্য উচ্চাংগের হতে গেলে তার ভাব ভাষা ও আংগিকও মার্জিত হবে। সে কাব্য সর্বসাধারণের উপভোগ্য নাও হতে পারে। প্রকৃতি যে নিয়মে তার অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট চালাচ্ছে, কাব্যেও সে নিয়মের একটুও ব্যতিক্রম হচ্ছে না। ধরুন ধান-চাল, পোষাক-পরিচ্ছদ, ট্রেন-ষ্টিমার ইত্যাদি। কোথায় না তারতম্য আছে? চালের ভিতরে মোটা চাল, মাঝারি চাল ও সরু চাল আছে। সরুচালের ভাত ভদ্রলোকদের উপভোগ্য বটে, কিন্তু কৃষক-মজুরেরা তা আদৌ পছন্দ করে না। মিহিন ফুরফুরে রেশমী কাপড় আপ-টু-ডেট মেয়েরা পছন্দ করে, কিন্তু সাধারণ গাঁয়ের মেয়েরা তা পরতেই চাইবে না। ট্রেনে থার্ড ক্লাশও আছে, ফার্ষ্ট ক্লাশও আছে। শিল্প, সাহিত্য, সমাজ—সর্বত্রই এই নীতিতে কাজ চলছে। মুড়ি-মিছরী সব একদরে বিকায় না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্র-কাব্যের দুর্বোধ্যতা যতো দোষের বলে মনে হয়, আসলে ততো নয়। এটা কোনো একটা অস্বাভাবিক ব্যাপারও নয়। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ এক টাইপের কবি। দুর্বোধ্যতার যুক্তি দিয়ে সে টাইপকে অবজ্ঞা করা চলে না। এ টাইপ বাংলা কাব্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধই করেছে। রবীন্দ্রকাব্য বুঝিনা—একথা বলার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নেই, বরং অগৌরবই

রয়েছে। কোনো কাব্যের দুর্বোধ্যতার জন্য সর্বত্র কাব্যই দোষী নয়, পাঠকেরও দোষ থাকতে পারে। অযোগ্য পাঠক কি নেই? কবির কাব্য বুঝবার অক্ষমতার জন্য লজ্জিত না হয়ে অথবা সে অক্ষমতাকে দূর করবার কোশেশ না করে উল্টে আরো কবিকে চোখ রাঙাবো, এ এক মজার যুক্তি। তা ছাড়া সব কিছু বুঝতে চাওয়াও তো নির্বুদ্ধিতা। জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে সব কিছু বুঝা সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের অতীতে এক অব্যক্ত রহস্য-লোক আছে, সে লোকের স্বরূপ জ্ঞান দিয়ে বুঝা যায়না, অতীন্দ্রিয়-অনুভূতি দিয়ে বুঝতে হয়। সে উপলব্ধি হয়তো অস্পষ্ট, কিন্তু উপায় নেই। সব জিনিস পূর্ণভাবে পাওয়া যায়না। আভাসে ইংগিতেই তাকে বুঝে নিতে হয়! যা স্থূল তা ওজন দরে পাওয়া যায়; কিন্তু বিদ্যুৎকে তো ওজন দরে পাওয়া যায় না। তার একটু স্পর্শই যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন:

> "এতটুকু ছোঁয়া লাগে
> এতটুকু কথা শুনি
> তাই দিয়ে মনে মনে
> রচি মম ফাল্গুনী;"

কবি যদি পাঠকের মনে 'এতটুকু ছোঁয়া' দিতে পারেন, তাই যথেষ্ট। অবশ্য এই যুক্তির কদর্থ করলে অতি-আধুনিক কবিরাও রবীন্দ্রনাথের সম-মর্যাদা, এমন কি তার চেয়েও উচ্চ মর্যাদা দাবী করবেন। দুর্বোধ্যতাই যদি শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণ হয়, তবে অতি-আধুনিক কবিরাই শ্রেষ্ঠ কবি। কথাটির গলৎ এইখানে যে শ্রেষ্ঠ কাব্য দুর্বোধ্য হতে পারে, কিন্তু দুর্বোধ্য হলেই শ্রেষ্ঠ কাব্য হয় না।

এই অতীন্দ্রিয়বাদ বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রনাথই প্রবর্তন করেছেন। এটা অবশ্য রবীন্দ্রনাথের মৌলিক দান নয়; হাফিজ, রুমী, ওমর খৈয়াম প্রভৃতি মরমী কবিরা এ পথের সন্ধান আগেই আমাদের দিয়েছেন। রবীন্দ্র-নাথ সেই পথেরই উত্তরসাধক। মাইকেল যেমন ভার্জিল, মিলটন, দান্তে ইত্যাদি ইউরোপীয় কবিদের মহাকাব্যের ভংগী বাংলা কাব্যে প্রবর্তন করে বাংলা সাহিত্যের মর্যাদা বাড়িয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ তেমনি ফার্সি কাব্য-ভংগীকে বাংলায় রূপ দিয়েছেন।

সূক্ষ্ম কাব্যানুভূতি শুধু যে মনের স্বপ্ন-বিলাসের জন্যই প্রয়োজন তা নয়। সমাজ ও রাষ্ট্র-জীবনেও এর প্রভাব প্রচুর। বস্তুধর্মী স্থূল কবিতা মানুষের মন ও চিন্তাকে জড়বাদের দিকে টেনে নামায়, জীবনের দিক-চক্রবালকে সংকীর্ণ করে আনে। আমাদের মনে বহু জড়মূর্তি ভিড় করে আছে। অসীমের দিব্য জ্যোতিকে তারা আমাদের চিত্তমুকুরে প্রতিফলিত হতে দেয় না। রবীন্দ্রনাথ তাই মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন:

"মুগ্ধ ওরে স্বপ্নঘোরে যদি প্রাণের আসন কোণে
ধূলায় গড়া দেবতারে লুকিয়ে রাখিস সংগোপনে
চিরদিনের প্রভু তবে তোদের প্রাণে বিফল হবে
বাহিরে সে দাঁড়িয়ে রবে কতনা যুগযুগান্তরে।"

'প্রাণের আসন' থেকে 'ধূলায় গড়া দেবতা' গুলিকে দূর করতে হলে অশরীরী ভাবের কাব্যপাঠ যথেষ্ট সহায়তা করে। অসীমের স্পর্শ দিয়ে ইংগিত দিয়ে সংগীত দিয়ে---মনকে সে উর্ধ্বলোকে টেনে নেয়। ফলে মানুষ জড়জীবনের পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত হয়ে এক উদার দ্বন্দ্বাতীত সাম্যলোকে উন্নীত হয়। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, ছোট-বড়র প্রভেদ তখন সে ভুলে যায়। তার চোখে ঘনায় মহামানবতার স্বপ্ন, অন্তরে জাগে বিশ্বনিখিলের প্রতি আত্মীয়তার মনোভাব। কাজেই আজকার যুগে রবীন্দ্র-কাব্য মানব-কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারে। এই সংঘাত ও দ্বন্দ্বমুখর জীবন ও জগতে আমাদের মন ও চিন্তাকে কিছুটা মুক্তি দেওয়া দরকার। রবীন্দ্রকাব্য এ কাজের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে।

বাঁকুড়া, ১৯৪৩

পাকিস্তানের পরে

পাকিস্তান

১৪ই আগষ্ট। ১৯৪৭ সাল।

মধ্যরাত্রির শূন্যমুহূর্তে শুনতে পেলাম মুহুর্মুহু কামান-গর্জন। সঙ্গে সঙ্গে নিখিলে নিখিলে ধ্বনিত হলো 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'।

গগনে গগনে উড়লো হিলালী চাঁদের নিশান। রাজপথে আজ অগণিত মানুষের কলকোলাহল। মিছিল করে গান গেয়ে এগিয়ে যায় তারা। তরুণ-তরুণী, ছাত্র-ছাত্রী, বালক-বৃদ্ধ---সবাই আজ নূতন আনন্দে বিভোর।

আজ আমাদের আনন্দের দিন। জাতীয় মুক্তির দিন। দীর্ঘদিনের গোলামীর পর আজ আমরা আবার স্বাধীন জাতির মর্যাদা পেয়েছি; এই আনন্দে সবাই আজ আত্মহারা। আযাদীর সঙ্গে সঙ্গে আনন্দও যেন আজ মুক্তি পেল। বাধাবন্ধনহীন এমন উচ্ছল আনন্দ বহুদিন ভোগ করিনি। এ যেন এক তিস্‌রা কোন্ ঈদ এলো আমাদের জাতির জীবনে। ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় আজ শুরু হলো। নূতন আশার, নূতন আকাঙ্খার, নূতন সম্ভাবনার দুয়ার আজ খুলে গেল।

নূতন শপথ নিয়ে আজ আমরা পথে এসে দাঁড়ালাম। আমরা ইতিহাস সৃষ্টি করবো। ঈমান দিয়ে, শৃঙ্খলা দিয়ে, ত্যাগ দিয়ে, অধ্যবসায় দিয়ে আমরা পাকিস্তান গড়ে তুলবো। অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য নিয়ে নূতন ভবিষ্যৎ রচনা করবো।

পাকিস্তানের জন্মমুহূর্তে তাই জানাই তাকে আমাদের লক্ষ কণ্ঠের খুশ-আমদিদ ও মুবারকবাদ।

ফরিদপুর
১৯৪৭

২৫শে ডিসেম্বরের বাণী

২৫শে ডিসেম্বর জগতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এই দিনে যিশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। আশ্চর্যের বিষয়, এই দিনটি আমাদের প্রিয় নেতা কায়েদে-আযমেরও জন্মদিন। কায়েদে-আযমের জন্মদিন যিশুখৃষ্টের জন্মদিনের সঙ্গে এমন চমৎকার সংগতি রক্ষা করিল কেন, ভাবিবার কথা। প্রবাদ আছে যে, যিশুখৃষ্ট বিনাপিতায় কুমারী মেরীর গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। প্রাকৃতিক নিয়মের ইহা একটা বিরাট ব্যতিক্রম, সন্দেহ নাই। প্রত্যেক কার্যেরই পশ্চাতে থাকে তার একটা কিছু কারণ। কার্য-কারণ সম্বন্ধ দ্বারাই জগতের সব ঘটনার ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু এই কার্য-কারণ সম্বন্ধ এক জায়গায় গিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়ায়। সেখানে আর কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ; সেখানে হইতে বিনা কারণেই সৃষ্টি-প্রবাহ উৎসারিত হয়। কার্য-কারণ পরম্পরার উৎসমূলে আছে তাই একটা আবেগ—সৃজনী শক্তির শুধু মাত্র একটা দুর্জয় কৌতূহল। সৃষ্টি-প্রবাহের অন্তিমেও আছে এমনই একটা আকস্মিক স্তব্ধতা, যেখানে কোনো কারণ নাই, যুক্তি নাই—আছে শুধু অদৃশ্য শক্তির মাত্র একটা খাম-খেয়ালি। সৃষ্টির আদি ও অন্তে তাই কারণ খুঁজিতে চাওয়া বাতুলতা মাত্র। মানুষের সৃষ্টির কার্য-কারণ সম্বন্ধ থাকে, কিন্তু আল্লার সৃষ্টিতে তার কোনো প্রয়োজন হয় না। সেখানে শুধুই 'কুন্'—'ফায়াকুন্'। অর্থাৎ আল্লাহ যদি কোনো কিছুকে বলেন ''হও'', অমনি তাহা হইয়া যায়। এই মহাসত্যই পূর্ণ-প্রকটিত হইয়াছে আদমের জন্ম-রহস্যের মধ্যে। তাঁহার জন্মের কোনো বাহ্য কারণ নাই ; আল্লার অনুগ্রহেই তিনি অস্তিত্বের মর্যাদা পাইয়াছেন। এই জন্যই আল্লাহতা'লা কুরআন-শরীফে যিশুখৃষ্টের জন্মের তুলনা দিয়াছেন হযরত আদমের জন্মের সঙ্গে। আল্লাহ বলিতেছেন ''নিশ্চয়ই আল্লার নিকট ঈসার জন্ম

আদমের জন্মের মতো। তিনি তাহাকে (আদমকে) মাটি হইতে পয়দা করিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন 'হও', অমনি সে হইয়া গিয়াছিল।"—(৩ঃ ৫৮)

অতএব দেখা যাইতেছে, পিতা ছাড়া (অর্থাৎ কারণ ছাড়া) কোনো কিছুই হইতে পারে না—এ ধারণা আমাদের ভুল। আল্লার কুদ্‌রতে এবং তাঁর সর্বময় ক্ষমতায় মানুষ যাহাতে বিশ্বাস না হারায় এবং অদৃশ্য শক্তিতে যাহাতে সে ঈমান রাখে, তারই জন্য যিশুর জন্মকে তিনি এরূপ অলৌকিক করিয়াছেন। সৃষ্টির ইতিহাসে যিশুখৃষ্ট তাই এক মূর্তিমান বিস্ময়।

পাকিস্তানও এমনই একটা বিস্ময়কর সৃষ্টি। প্রচলিত সমস্ত রাজনৈতিক দর্শন ও মতবাদের এ একটা বিরাট ব্যতিক্রম। এর জন্ম তাই খানিকটা অলৌকিক। হিন্দুস্তানের বুকের তলায় যে পাকিস্তান ঘুমাইয়া ছিল, কে তাহা জানিত? বারো তের শত মাইল দূরবর্তী দুইটি প্রদেশ লইয়া যে একটি রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে, তাহাই বা কে আগে বিশ্বাস করিত? কাজেই পাকিস্তানের সৃষ্টির সঙ্গে একটা গভীর বিস্ময় জড়াইয়া আছে। তা যদি হয়, তবে সেই পাকিস্তানের দ্রষ্টা ও স্রষ্টা কায়েদে-আযমের জন্মের সঙ্গেও কিছুটা বিস্ময় জড়িত থাকা স্বাভাবিক। হযরত ঈসার জন্ম হইয়াছিল ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে। কায়েদে-আযমের জন্মও হইল এই বিস্ময়-জড়ানো দিনটিতে। কাজেই কায়েদে-আযমের মধ্যেও যে কিছুটা অতিমানবিক উপাদান থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? কায়েদে-আযম ছিলেন সত্যই একজন অতিমানব। ইসলামের পরিভাষায় এরূপ মানবকেই বলা হয় 'মরদ্-ই-মুমিন' অথবা 'ইনসান্-ই-কামিল্'। মরদ্-ই-মুমিনের জন্ম আছে, মৃত্যু নাই। অসাধ্য সাধনের জন্যেই তাঁরা দুনিয়ায় আসেন। এই অসাধ্য সাধনের সম্ভাবনাই ২৫শে ডিসেম্বরের বৈশিষ্ট্য। বিশ্ব-প্রকৃতিতে এই দিনে সত্যই বিপ্লব আসে। 'ছোট দিন' 'বড় দিন' হইতে শুরু করে। জড়প্রকৃতিতেও এই দিনটি ঋতুচক্রের মোড় ঘুরাইয়া দেয়। এই দিন হইতে নববসন্তের সূচনা হয়। শীতের তুহিন-শীতল মৃত্যুস্পর্শ স্তব্ধ হয়; ঘুমন্ত প্রকৃতির শিরায় শিরায় আবার নবজীবনের পুলক-স্পন্দন অনুভূত হয়। এই দিন হইতেই সে আবার পুনর্জীবিত হইতে থাকে। কোথায় যেন

অলক্ষ্যে প্রচণ্ড একটা যুদ্ধ সংঘটিত হইয়া যায়। সমস্ত প্রকৃতি আড়ষ্ট, জরাগ্রস্ত, নিষ্প্রভ, মলিন। উত্তরী বাতাসে থরথর কম্পিত তার দেহ; স্তিমিত তার জীবন-প্রদীপ; বনে বনে শুধু ঝরা পাতার ঝরঝরানি গান, খসে যাবার ঝরে যাবার হাহাকার। এই চরম দুর্দিনে কে যেন অজানা বীরের সাজে দূরদেশ থেকে আসে এই বনে। জরামৃত্যুর সমস্ত সৈন্যকে সে করে পরাজিত; ফিরাইয়া দেয় সে হাওয়ার গতি, শুষ্ক তরুর শাখায় শাখায় সে আনে নবপল্লব নবমুকুলের সমারোহ, সে আনে নিরাশার মাঝে আশার বাণী, সে শোনায় মৃত্যুর দুয়ারে নবজীবনের আহ্বান। কায়েদে-আযমের জীবনেও ছিল না কি এই বৈশিষ্ট্য? ১৯৩৪ সালের কথা স্মরণ করুন। ভারতীয় মুসলমানের তখন চরম দুর্দিন। তার জাতীয় জীবন সম্পূর্ণ আড়ষ্ট ও জরাগ্রস্ত। তরুণ ব্যারিষ্টার মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ তখন ইংলণ্ডে। এমন সময় মুসলিম লীগের তরফ হইতে দুস্থ জাতির মৃত্যু-কাতর আহ্বান গেল তাঁর কাছে। মুসলিম লীগের অবস্থা তখন শোচনীয়। না ছিল তার শৃঙ্খলা, না ছিল তার সংহতি। তবু লিয়াকত আলী খান জাতির প্রয়োজনের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া জিন্নাকে ভারতে ফিবিয়া আসিবার আহ্বান দিলেন। সে ডাকে জিন্নাহ্ সাড়া না দিয়া পারিলেন না। সকল অভিমান ভুলিয়া গিয়া তিনি পুনরায় ভারতে ফিরিয়া আসিয়া মুসলিম লীগের কর্ণধার হইলেন। বিক্ষিপ্ত শক্তিকে সংঘবদ্ধ করিয়া মুসলিম লীগের অন্তরে তিনি করিলেন নবজীবনের সঞ্চার। তার পর মাত্র ১৩ বৎসরের সাধনাতেই তিনি আনিলেন মুসলিম জাতির আযাদী। ১৯৪৭ সালে হিন্দুস্থানের বুকে জন্মলাভ করিল পাকিস্তান। বালক-বীরের বেশে নববসন্ত যেমন করিয়া আনে জড়-প্রকৃতিতে বিপ্লব ও নবসৃষ্টির উল্লাস, মুসলমানের জাতীয় জীবনে তরুণ বীর জিন্নাও আনিলেন তেমনি এক বিস্ময়কর বিপ্লব, তেমনি এক অভূতপূর্ব নূতন সৃষ্টির উন্মাদনা।

২৫শে ডিসেম্বর তাই নবজীবন লাভের দিন, তরুণের জয়যাত্রার দিন, সমস্ত জড়ত্ব ও অবসাদকে জয় করিয়া জীবনের বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশের দিন, ছোট থেকে বড় হবার দুর্জয় সাধনার দিন।

কায়েদে-আযমের জন্মদিন হইতে আমাদের তরুণদের তাই নৈতিক

পাঠ গ্রহণের যথেষ্ট উপাদান আছে। অনস্তিত্বের মধ্য হইতে নূতন কিছু বাস্তব সৃষ্টি করিবার প্রেরণায় এই দিনটি সমুজ্জ্বল। তরুণ জিন্নাহ্ যেমন মুসলিম লীগের জড়ত্ব স্থবিরত্ব ও পংগুতাকে স্বীকার করিয়া লইয়া ইহার পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, অফুরন্ত প্রাণের প্রাচুর্য দিয়া যেমন জাতির সমস্ত অভাব, দৈন্য ও মলিনতাকে দূর করিবার দুর্জয় সাধনা করিয়াছিলেন, আমাদের তরুণরাও আজকার দিনে আত্মপ্রতিষ্ঠার সেই শপথ গ্রহণ করুক---ইহাই আমি কামনা করি।

ফরিদপুর
১৯৪৭

পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য-সম্মেলন

খুশ্-আমদিদ্!

পূর্ব-পাকিস্তানের নব-জাগ্রত হে তরুণ কাফেলা, আজিকার এই সুন্দর প্রভাতে তোমাদেরকে অভিনন্দিত করি। ঊষার মিনারে ওই শোনো নয়া ফযরের আযান, ওই শোনে নূতন পৃথিবীর আহ্বান। আজ বেরিয়েছো তোমরা জয়যাত্রায়; তোমাদের চোখে আজ কাঞ্চনজংঘার সোনালী স্বপন, অন্তরে অন্তরে আজ আবেহায়াতের মরুতৃষ্ণা। তোমারা আজ দূর পথের মুসাফির। বন্ধুর পথ বেয়ে দিগন্ত পেরিয়ে যেতে হবে তোমাদের মক্সেদ-মঞ্জিলে। সেই জয়যাত্রার শুভমুহূর্তে তোমাদেরকে দেই আমার অকুণ্ঠ অভিনন্দন ও আন্তরিক মুবারকবাদ।

বন্ধুগণ,

আযাদ পাকিস্তানের এই হলো প্রথম সাহিত্য-সম্মেলন। এর গুরুত্ব পূর্ববর্তী অন্যান্য সম্মেলনের চেয়ে খুব বেশী। আজ আমরা লাভ করেছি আযাদী, টুটেছে আমাদের গোলামীর জিঞ্জির; মুক্ত নীল আকাশের তলে স্বাধীন মানুষের মর্যাদা ও গৌরব লাভ করেছি আমরা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মাথায় চেপেছে এক গুরু দায়িত্ব। কোনো দেশ জয় করার আগের দিন সহজ; কিন্তু পরের দিন অপেক্ষাকৃত কঠিন। আযাদী লাভ করার চেয়ে কঠিন কাজ হলো আযাদীকে রক্ষা করা। মুক্তি-সংগ্রামের সাথে সাথে জড়িয়ে থাকে খানিকটা ক্ষয়ক্ষতি ধ্বংস ও অপচয়। জয়ের পরে সেগুলোর দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। নূতন সৃষ্টির আগে তাই আমাদের সেই সব ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান নিতে হয়; আপন ঘরে কি কি আছে, কি কি নাই, আর কি কি আমাদের চাই—তার হিসাব নিতে হয়; তারপর

নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে হয় সুমুখের পানে। আমাদেরও আজ সেই কাজ করতে হবে।

কায়েদ-ই-আযম বলে গেছেন : পাকিস্তান এনে দিলাম আমি, এখন একে গড়ে তুলবার ভার তোমাদের। সত্যি তাই। আমাদের এখন করতে হবে সেই গড়ে তুলবার সাধনা।

আমাদের পাকিস্তান-সংগ্রামের মূলে ছিল প্রধানতঃ আইডিওলজীর দ্বন্দ্ব। আমরা চেয়েছিলাম স্বতন্ত্র জাতিরূপে জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে এবং আমাদের তাহজিব-তমদ্দুনকে রূপ দিতে। এই স্বাতন্ত্র্য সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আত্মপ্রকাশের অভিলাষ নয়, শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যেরই এ একটা বলিষ্ঠ ইংগিত। কিছু নূতন দিতে হলেই জনস্রোতের মধ্য হতে সরে দাঁড়াতে হয়; গড্ডালিকা স্রোতে ভেসে গেলে কিছুই দেওয়া যায় না। স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেই থাকে নব সৃষ্টির প্রেরণা। কায়েদ-ই-আযম যে বলেছেন, আমরা একটা স্বতন্ত্র জাতি এবং আমাদের তাহজিব-তমদ্দুন স্বতন্ত্র, সে কথার গূঢ় তাৎপর্য এই। নূতন দানে, নূতন সৃষ্টিতে আমাদের স্বকীয়তা ফুটিয়ে তুলতে হবে, এবং তারই গৌরবে আমরা বিশ্ব-সভায় বিশিষ্ট আসন পাবো— এই আমাদের স্বাতন্ত্র্যের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

পাকিস্তান মূলত একটি ইসলামী রাষ্ট্র। কাজেই তার রাজনীতি সমাজনীতি—সব কিছুতেই আমাদের জাতীয় ধ্যান-ধারণা ও ঐতিহ্যের ছাপ থাকবেই। এ একটা স্বাভাবিক ব্যাপার, এর থেকে মুক্তি নেই। জগতের অন্যান্য জাতি সম্বন্ধেও এ কথা সত্য। এতে ভয় করবার কিছু নেই। ইসলামী রাষ্ট্র হলেই যে একটা Theocratic State হতে হবে, তার কোনো মানে নেই। ইসলামের মধ্যে যে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা ও সমন্বয়ের সুর আছে,—মানুষে-মানুষে যে সহজ প্রেম আছে, বিশ্বমানবতার যে আবেদন আছে, সত্য সুন্দর ও কল্যাণের সেই সব চিরন্তন আদর্শই পাকিস্তানে রূপ পাবে।

আমাদের শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধেও একই কথা খাটবে। আমাদের সাহিত্যে থাকবে একটা বিশ্বজনীন উদার মনোভংগী, থাকবে একটা পরিব্যাপ্ত বিশ্ববোধ। 'জগৎ জুড়ে উদার সুরে' যে 'আনন্দ গান' বাজছে,

আমাদের সাহিত্যেও ঝংকৃত হবে তার প্রতিধ্বনি। ইসলামের এই সুন্দর ও কল্যাণ-রূপকে আমাদের সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে হবে। এখানে হীনমন্যতা দেখালে চলবে না। আমরা সবার সাথে হাত মিলাবো, সন্দেহ নেই, কিন্তু নিজেকে পরের হাতে ধরে দেব না। স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই আমরা মিলবো ; তাতেই আসবে কল্যাণ, তাতেই দিতে পারবো আমরা নব-নব অবদান। নব সৃষ্টির জন্য স্বাতন্ত্র্য তাই অনেক সময় কাম্য। স্বাতন্ত্র্য-বোধ বলিষ্ঠ জীবনের লক্ষণ। যার এ বোধ নেই, সে বেশীদিন টিকে না।

এখানে একটা প্রশ্ন জাগবে : পাকিস্তানের সাহিত্যে যদি ইসলামের প্রভাব পড়ে, তাহলে এখানকার হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য অমুসলমানদের সাহিত্য কেমন হবে?

এ প্রশ্নের জবাব অতি সহজ। ইসলামী আদর্শই তাদের রক্ষা-কবচ হবে। যুগে যুগে ইসলাম প্রত্যেককে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে আসছে। 'ধর্মে বল প্রয়োগ নেই', 'যার-যার ধর্ম তার তার কাছে'— এই হলো ইসলামের কথা। হিন্দু বৌদ্ধ বা অন্য যে কেউ তার শিল্প-সংস্কৃতি ও সাহিত্যে নিজেদের আদর্শকে রূপ দেবে, এতে কারো কিছু কথা বলবার নেই। একটা পরিমার্জিত সহনশীলতা ও নীতিবোধের মধ্যে বৈচিত্র্য আনলে তা বরং আমাদের আনন্দেরই কারণ হবে। অতীত যুগে এই বাংলা দেশেই এ-কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। বাংলার মুসলিম সুলতানেরা শিল্পে, সাহিত্যে ও ললিত কলায় কী উদার মনোভাবই না দেখিয়ে গিয়েছেন। রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ তাঁরাই করিয়েছিলেন। মুসলিম শাসিত দেশে ও নীতির কোনোদিন ব্যতিক্রম ঘটেও নি, ঘটবেও না। ভারতে, ইরানে, স্পেনে—সর্বত্র মুসলমানেরা এই নীতির অনুসরণ করেছে। কৃষ্টি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলামের অনুপ্রবেশ তাই অশেষ কল্যাণের কারণ হয়ে উঠেছে।

পাকিস্তানী কবি-সাহিত্যিকদিগের ভবিষ্যৎ তাই অতি-উজ্জ্বল। অতীতের উত্তরাধিকার আমাদের যে নেই, তা তো নয়! আমাদের পুঁথি-সাহিত্য এক বিরাট প্রেরণার উৎস-মূল। তার মধ্যে আমরা বহু উপকরণ পেতে পারি: পুঁথি-সাহিত্যে প্রত্যাবর্তন হয়তো আর সম্ভব হবে না,

এই উন্নত আলোকের যুগে তা বাঞ্ছনীয়ও নয়; কিন্তু সে সব মালমশলা দিয়ে নব নব স্বষ্টি তো সম্ভব হতে পারে। এখন চাই আমাদের স্বষ্টিধর্মী প্রতিভা। প্রতিভার যাদুস্পর্শ ছাড়া কোনো নূতন স্বষ্টি সম্ভব নয়।

এসো কবিরা, এসো শিল্পীরা, তোমাদের কাজ এখনো ফুরায়নি; কোনো-দিনই ফুরাবে না। যেখানে আঘাত আছে, বেদনা আছে, দৈন্য আছে, অভাব আছে, সেখানে হবে তোমাদের কর্মক্ষেত্র। সব মলিনতাকে দূর করে দিয়ে এসো আমরা পাকিস্তানকে সত্যিকার পাকভূমি করে গড়ে তুলি। গতি দিয়ে, শক্তি দিয়ে, ছন্দ দিয়ে, সুর দিয়ে এসো তাকে শক্তিময়ী ছন্দময়ী ও মহিমময়ী করে তুলি।*

*১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে ঢাকায় কার্জন হলে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লার সভাপতিত্বে পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে লেখকের উদ্বোধনী ভাষণ।

আমাদের কওমী নিশান

"উড়াও উড়াও আজি কওমী নিশান।
চাঁদ তারা সাদা আর সবুজ মিশান
আমাদের কওমী নিশান।"

আমাদের কওমী নিশান। কতো সুন্দর! কতো মধুর! অপরূপ এর ভঙ্গিমা। অদ্ভুত এর ব্যঞ্জনা! কতো নিশানই তো আকাশে ওড়ে। কিন্তু এমন পরিচ্ছন্ন রূপ ও স্বপ্নশ্রী আর কোনো নিশানেই তো দেখি না।

পাকিস্তানের অন্তর্মূর্তি, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, ধ্যান-ধারণা ও আশা-আকাঙ্খা ---সমস্তই অলক্ষ্যে ছায়া ফেলেছে এই নিশানের বুকে। নিশান নয়, এ যেন পাকিস্তানের মর্ম-মুকুর। নিশানের দিকে চাইলেই তাই পাকিস্তানের সত্যিকার রূপ এতে দেখা যায়। যে-আদর্শ, লক্ষ্য ও স্বপ্নসাধ পাকিস্তানের বুকে জেগে আছে, আমাদের নিশানে তা প্রতিবিম্বিত হয়েছে। নিশানের ব্যাখ্যা করলে তাই এই নব রাষ্ট্রের লক্ষ্য, আদর্শ ও ধ্যান-ধারণার ব্যাখ্যাই করা হয়। চাঁদ তারা সবুজ ও সাদা---এই চারিটি বস্তুই আমাদের নিশানের উপাদান। এদের প্রত্যেকটির বুকে আছে এক একটি পয়গাম---এক একটি ইঙ্গিত। আমি আজ তাদের পরিচয় দেব।

সবুজ ---সে জীবনের প্রতীক। যেখানেই সবুজ, সেখানেই জীবন। বিশ্ব-প্রকৃতিতে তাই এত সবুজের প্রাচুর্য। তরুলতায় তৃণ-শস্যে---সর্বত্র শ্যামল রূপের সমারোহ। প্রকৃতি যেখানে ধূসর বা পাণ্ডুর, সেখানে প্রাণ নেই, গতি নেই, ছন্দ নেই, সুর নেই; আছে শুধু বৈরাগ্যের বাণী, অবসানের বাণী। কিন্তু সবুজের মধ্যে দেখি জীবনের নৃত্যচঞ্চল রূপ---শুনি তার বলিষ্ঠ কল-সঙ্গীত। বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরতলে যে গোপন সঞ্জীবনী-সুধা

আছে, সবুজ যেন তারি প্রাণোচ্ছল স্নিগ্ধ কান্তি। মাটির বুকের ঐশ্বর্যের ও যেন বহির্বিকাশ। সবুজই তো সৃষ্টির জীবন-রসায়ন।

আমাদের কওমী নিশানে তাই আমরা বেছে নিয়েছি সবুজকে---আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতীক-চিহ্ন রূপে। আমরা পাকিস্তানকে চির-সবুজ, চির-শ্যামল করে রাখবো---কিছুতেই একে গৈরিক হতে দেব না। এই জড়-পৃথিবীর বুকে---আকাশে সাগরে যেখানে যে সম্পদ আছে, ঐশ্বর্য আছে, সব আমরা আহরণ করবো, সবুজ ধানে সবুজ পাটে মাঠ ছেয়ে দেব। ঐশ্বর্যের দীপ্তিতে পাকিস্তান লাভ করবে এক যৌবনদৃপ্ত স্নিগ্ধ শ্যামল রূপ।

কিন্তু তবু জড়-সম্পদই তো আর আমাদের কাম্য নয়। দেহ ও আত্মা, জড় ও চৈতন্য, ইহকাল ও পরকাল---দুই নিয়েই আমাদের কারবার। দেহের ক্ষুধার তৃপ্তিও যেমন আমাদের কাম্য, আত্মার ক্ষুধার তৃপ্তিও ঠিক তেমনি কাম্য। দীন ও দুনিয়া---দুয়ের সম্পদই আমরা চাই। জড়-জীবনে চাই আমরা তাই রুহানি আলোর পরশ। সে আলো জোগায় আমাদের আসমানের ঐ বাঁকা চাঁদ। দ্বিতীয়ার চাঁদ তাই আমাদের নিশানের অন্যতম প্রতীক। এর মধ্যে রূপ ধরেছে আসমান-যমীনের মিলন---জড়-চৈতন্যের সমন্বয়। পাকিস্তান তাই শুধু পূর্ব-পশ্চিমেই সীমাবদ্ধ নয়---আকাশও এর আর এক সীমান্ত। পাকিস্তানের তাই কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা নেই---মাটির মায়ায় মন আমাদের শান্ত হয় না; নিঃসীম নভোনিলীমায় সে ঘুরে বেড়ায়। এই ব্যাপ্তি এই বিশ্ববোধ পাক-নিশানের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর পানে চাইলেই আমাদের মনের দিকচক্রবাল সম্প্রসারিত হয়ে যায়; ভৌগোলিক পাকিস্তানের মৃন্ময়ী রূপ মিলিয়ে যায় এক জ্যোতির্ময়ী প্যান-পাকিস্তানের স্বপ্নমূর্তির মধ্যে, যেখানে অনুভব করি---কোটি কোটি চন্দ্র-সূর্য ও গ্রহ-তারকার নীরবপ্রীতি ও সহযোগিতার ইংগিত। ঊর্ধ্ব জ্যোতির্লোকের সঙ্গে এই সহযোগ---পাকিস্তানকে 'সেকিউলার' রাষ্ট্র হতে মুক্তি দিয়েছে। বিশ্ব-বিধানের চিরন্তন সংস্থার মধ্যেই সে স্থান পেয়েছে।

বাঁকা চাঁদ তাই আমাদের যুগে যুগে দিয়েছে প্রেরণা---যুগে যুগে দিয়েছে শাশ্বত চিরন্তনের স্পর্শ আর স্থিতিশীলতার প্রত্যয়। চির-সুন্দরের

প্রতীক এই চাঁদ। ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান, সবাই একে ভালোবাসে। কবি সত্যিই বলেছেন :

“এমন চাঁদের আলো
মরি যদি সেও ভালো,
সে মরণ স্বরগ সমান।”

শুধু চাঁদকেই যে সবাই ভালোবাসে, তা নয় ; চাঁদও সবাইকে সমানভাবে ভালোবাসে, সমানভাবে আলো দেয়। রাজা-বাদশা, উজির-নাজির, মোল্লা-পুরোহিত—কারো বশে নেই সে ; সবার উর্ধ্বে তার স্থান। কেউ তাকে প্রভাবিত করতে পারে না। মানুষের হাতের নাগালের মধ্যে থাকলে হয়তো কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি ওর আলো-বিতরণে স্বজনপ্রীতি দেখাবার সুযোগ পেত। অন্তর্যামী আল্লাহ্ তাই আগে থেকেই ওকে রেখে দিয়েছেন মানুষের নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে। সেখান থেকে তার আলো আসে পৃথিবীর বুকে। সমদর্শিতা ও সমপ্রীতির আদর্শে তাই সে এত সুন্দর—এত মনোরম।

পাকিস্তানের নীতিও হবে চাঁদের মতো উদার ও সমদর্শী। আমাদের আলো সকলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিতে হবে—এই কথাটি চাঁদ আমাদের বলে।

দ্বিতীয়ার চাঁদের মধ্যে আছে অগ্রসরের বাণী! দ্বিতীয়ার চাঁদ প্রতি-দিনই এগিয়ে চলেছে পূর্ণচাঁদের দিকে। পূর্ণিমার চাঁদে না পৌঁছা পর্যন্ত তার সফর থামবে না।

এই এগিয়ে চলার প্রেরণাই হচ্ছে হিলালী চাঁদের পয়গাম।

কিন্তু শুধু পূর্ণচাঁদও পাকিস্তানের লক্ষ্য নয়। আকাশের মৌন মূক অগণিত তারার কথাও সে ভেবেছে। তাই তাদের কাছ থেকেও সে নিয়েছে একজন প্রতিনিধি। আর তাকে আসন দেওয়া হয়েছে কোথায়? নিশানের পশ্চাদ্ভূমিতে নয়, অথবা কোনো এক অবজ্ঞাত অন্ধকার কোণেও নয়—একদম চাঁদের বুকে। এমনি সুন্দরভাবে সে ঘটিয়েছে চাঁদ-তারার মিলন। ইসলাম শান্তির ধর্ম। দুই বিপরীতের মাঝখান দিয়ে সে পথ কেটে চলে। এই 'মধ্যপথ'ই তো শ্রেষ্ঠ পথ। যে আকাশে শুধু চাঁদ আছে, তারা নেই, সে আকাশের শোভা নেই। আবার যে আকাশে তারাই আছে, চাঁদ নেই,

তার শোভাও সম্পূর্ণ নয়। চাঁদ আছে, তারা আছে, তাই তো রাতের আকাশ এমন শান্ত, স্নিগ্ধ ও মনোরম। এই আপোষ---এই সমন্বয়ই তো প্রকৃতির ধর্ম। পুঁজিবাদ (Capitalism) বা সমূহবাদ (Communism) একা কেউই জগতে শান্তি আনতে পারবে না। উভয়ের মধ্যে চাই একটা মিলন বা synthesis. সেই আদর্শই হলো ইসলামের, সেই আদর্শই হলো পাকিস্তানের। পাকিস্তানের জাতীয় নিশানে তাই ঘটেছে চাঁদ তারার মিলন। এরই মধ্যে রয়েছে জগতের ভবিষ্যৎ পথের ইঙ্গিত।

আদর্শ সমাজ, আদর্শ রাষ্ট্র (Ideal State) গড়ে তোলাই হচ্ছে জগতের চিরন্তন স্বপ্ন। একমাত্র সহনশীলতার উপরেই এ সমাজ বা এ রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে। তুমিও থাকো, আমিও থাকি---এই নীতিতেই সমাজ বা রাষ্ট্র রচনা করতে হবে। সাদা-কালো, ছোট-বড় ধনী-নির্ধন---সবাইকে স্বীকার করলে তবেই মহামানবতার ভিত্তি-ভূমি রচিত হয়। এই সমন্বয় ও সহযোগিতার পয়গামকে বলিষ্ঠভাবে রূপ দেওয়া হয়েছে আমাদের জাতীয় নিশানে। নিশানের যে অংশ সাদা, তারই মধ্যে আছে এই মহামিলনের বাণী। সাদার রাসায়নিক ব্যাখ্যা কি? রাসায়নিক ব্যাখ্যা হলো এই যে, যে সাতটি রং আছে, তার সবগুলি এক সাথে মিললে তবেই তা সাদা হয়ে যায়, নইলে হয় না। অন্য কথায়ঃ সাদার বুকে আছে সব রঙের একত্র সমাবেশ। কাজেই বলা হয়েছেঃ "সাদার বুকেতে আছে বাদল ধনু, সাত রঙে গড়া তার শুভ্র তনু।" পাকিস্তান সব রঙকে মিলাবে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, পারশিক---সকল জাতির সকল ধর্মের রঙই এখানে বিকাশের সুযোগ পাবে। সবার রঙে রঙ মিশাতে গিয়েই নিশানের এক অংশ আমাদের সাদা হয়ে গিয়েছে। সব মানুষ এক জাতি---এই উদার বিশ্বমানবতার বাণী এখানে যেন শুভ্র বেশে রূপ ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

এমনই সুন্দর মহিমান্বিত আমাদের কওমী নিশান।

প্রথম রচনা
১৯৪৮

যশোর সমিতি

(১)

যশোরের সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ---

যশোর সমিতির আজ তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন। গত ১৯৪৮ সালে এই সমিতি ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। যশোরবাসীদের ধর্ম শিক্ষা সাহিত্য সমাজ ও তাহজিব-তমদ্দুন বিষয়ে সর্ব প্রকার উন্নতি সাধনই এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য।

আমাদের এই সংকীর্ণ গণ্ডীগত রূপ দেখে অনেকেই হয়তো ক্ষুণ্ন হবেন। কিন্তু গণ্ডীরও প্রয়োজন আছে। বিক্ষিপ্ত সূর্য-রশ্মিকে অধিকতর শক্তিশালী করতে হলে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করতে হয়। ব্যষ্টি ও সমষ্টি এ দুটো হলো আপেক্ষিক শব্দ। একটা ছাড়া অন্যটার কোনো অর্থ নেই। ব্যক্তি ছাড়া সমাজ নয়, সমাজ ছাড়াও ব্যক্তি নয়। একটি অপরের পরিপূরক। জাতীয়তা ছাড়া যেমন আন্তর্জাতীয়তা দাঁড়াতে পারে না, আন্তর্জাতীয়তা ছাড়া জাতীয়তারও ঠিক তেমনি কোনো অর্থ হয় না। যশোর সমিতির স্বতন্ত্র অস্তিত্বের এই হলো ব্যাখ্যা। আজ যদি যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, রাজশাহী ইত্যাদি সব জেলাগুলি স্বতন্ত্রভাবে জেগে ওঠে, তবে সে জাগরণ গোটা পাকিস্তানেরই। কাজেই আপাতদৃষ্টিতে যশোর সমিতির স্বতন্ত্র ও বিশেষরূপ ধরা পলেও তার ভিতরে আছে একটা পরিব্যাপ্ত উদাররূপ-- যা সমগ্র পাকিস্তান বা বৃহত্তর মানব-সমাজের সঙ্গে অন্তর্বিজড়িত। সীমার মাঝেই অসীমের সুর শোনা যায়; যশোরের মাঝেও তেমনি ধ্বনিত হবে বিশ্বজগতের সুর---মহামানবতার সুর।

আমাদের সমিতি তিন বৎসরের শিশু। কিন্তু জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই একে হতে হয়েছে স্বাবলম্বী। সমিতি কি কি কাজ করেছে তার বিস্তৃত পরিচয় আপনারা পাবেন সমিতির সেক্রেটারীর কার্য-বিবরণীতে। এদিক দিয়ে আমি কিছু বলবো না। সমিতির সৃষ্টি থেকেই আমি এর সঙ্গে

জড়িত। যশোর বাসীর মনের কথা আমি কিছুটা জানি। সেই দিক দিয়েই দু-চারটা কথা আজ বলবো।

যশোরের যুবশক্তির আজ চাই নূতন জাগরণ, জিন্দাদিল্ একদল নওজোয়ান আমাদের একান্ত প্রয়োজন। সেরূপ যুবক যে আমাদের মধ্যে নেই তা বলছি না, তবে সংগঠন অভাবে সে শক্তির সম্যক পরিস্ফূরণ হতে পারছেনা। রসুলুল্লার আদর্শে একটা নূতন 'হিল্ফ্উল্-ফজুল' বা সেবা-সমিতি আমরা গড়তে চাই—যারা অন্ধকারের বিরুদ্ধে করবে আলোকের অভিযান, আর্ত পীড়িত ও ব্যথিতের করবে সেবা, অত্যাচার ও অনাচারকে করবে প্রতিরোধ, মজলুমকে করবে রক্ষা আর কওম ও পাকিস্তানের জন্য করবে জান কোরবান।

পাকিস্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে নব নব সম্ভাবনার দুয়ার আমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়েছে। পাকিস্তান আদর্শ মুসলিম রাষ্ট্র হবে, ইসলামের বিশ্বজনীন যাবতীয় ধ্যান-ধারণাকে আমরা আবার নূতন করে রূপদান করবো, এই হলো আমাদের স্বপ্ন। কিন্তু এ সমস্ত নূতন ধ্যান-ধারণার বাস্তব রূপায়ণ কি হঠাৎ একদিন আকাশ থেকে নামবে? নিশ্চয়ই না। এর জন্য চাই একনিষ্ঠ সাধনা, চাই প্রস্তুতি। ছাত্র সমাজ, আলেম সমাজ, পুরুষ-সমাজ, নারী-সমাজ—প্রত্যেক স্তরেই আজ আনতে হবে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি, নূতন জিজ্ঞাসা, নূতন অন্বেষা। যশোরের ছেলেরা হবে আদর্শ ছেলে, মেয়েরা হবে আদর্শ মেয়ে। শুধু তাই নয়, শিল্পী ব্যবসায়ী কৃষক মজদুর—সবারই ভিতরে আনতে হবে আজ নূতন প্রাণ-চাঞ্চল্য। আনতে হবে আজ বাঁচবার দুর্নিবার আকাংখা। যশোর সমিতির মধ্য দিয়ে আজ আমরা সবাইকে জানাই সেই আহ্বান—সবাইকে শুনাই সেই এগিয়ে চলার পয়গাম।

যশোরের কবি-সাহিত্যিকদেরকে আজ ডাক দেই। যে নূতন ভবিষ্যৎ তাঁদের হাতছানি দিচ্ছে, অনাগত উজ্জ্বল দিনের যে ইঙ্গিত আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে, তা যেন তাদের দুয়ার হতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে না যায়। সাহিত্য ক্ষেত্রে নূতন পথ দেখাবার অথবা এর গতিপথের মোড় ফিরাবার যোগ্যতা তাদের আছে। তারা যেন গতানুগতিক পথ অনুসরণ না করে। জানি

এপথ অতি বন্ধুর, কিন্তু না-চলা পথে চলার ভেতরেই তো গৌরব। এ কথা আমাদের ভুললে চলবেনা যে, ভৌগোলিক পাকিস্তানেরই আমরা শুধু সীমান্ত-রক্ষী নই, তামদ্দুনিক পাকিস্তানেরও সীমান্ত আমরা রক্ষা করবো।

হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির দিক দিয়েও যশোর অগ্রণী। কোনো বড় রকমের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যশোরে কোনোদিন ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। যশোর সমিতি সেদিকেও দৃষ্টি রেখেছে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা সুন্দর সুস্থ মিলনের আবহাওয়া তারা বজায় রাখতে চেষ্টা করবে।

উপসংহারে আরও দুএকটি কথা না বললে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকবে। সমিতির জন্ম থেকেই আমি এর সঙ্গে জড়িত আছি। সমিতির সাধারণ মেম্বর এবং কর্ম-পরিষদের মেম্বরদের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে। আমি এদের উৎসাহ, উদ্দীপনা, সেবাপ্রবৃত্তি, সংহতি ও শৃংখলার মনোভাব দেখে মুগ্ধ হয়েছি। অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়তো এদের ঘটেছে, কিন্তু সকল ছেপে জেগে আছে এদের আন্তরিকতা।

যশোরবাসীর মনে লাগুক আজ নূতন অনুরাগ, চোখে জাগুক আজ নূতন খোয়াব, বুকে জাগুক আজ নবদৃপ্ত উদ্যম। আপন যোগ্যতা দিয়ে সব বিষয়েই তারা সামনের কাতারে এগিয়ে আসুক—রহমানুর রহিম আল্লাহ্ তা'লার দরগায় এই মুনাজাত।

(২)

যশোরের প্রিয় ভাই-ভগিনীরা,

তসলিম ও মুবারকবাদ! যশোর-সমিতি আজ তার চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করলো। অনেক ঝড়ের রাত্রি পেরিয়ে অনেক ঢেউএর দোলায় দোল খেয়ে আমাদের এই ক্ষুদ্র সোনার তরী এসে পৌঁছালো নূতন আর একটি বন্দরে। চারটি বছর আগে যাত্রা হয়েছিল তার শুরু, ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে চলছিল সে সুমুখ পানে; বুকে ছিল তার নূতন আশা, চোখে ছিল তার নূতন খোয়াব। নূতন প্রেরণায় চেতনায় যাত্রীরা হয়ে উঠেছিল অশান্ত ও চঞ্চল। দুঃসাহসী নওযোয়ানের দল, জানেনা কোথায় যাবে, তবু চলে! চলায় চলায় পায়ের তলায় তাদের পথ জাগে। বাধাকে মানেনা, বিপদকে মানেনা, এগিয়ে যায় তারা। ঘাটে ঘাটে নামে;

কিছু দেয় কিছু নেয়। দৃষ্টি আকর্ষণ করে সব্বার। "কারা এই তরুণ দল ?---আলোকের গান গেয়ে নেচে নেচে চলেছে ?" কণ্ঠে কণ্ঠে জবাব শোনা যায়ঃ জানোনা ? ওরা যশোর সমিতি। সুদূরের যাত্রী ওরা, নূতন ভোরে নূতন আলোকে জয়যাত্রা করেছে অসীম দিগন্তের পানে। ধ্বনি ওঠে 'যশোর সমিতি জিন্দাবাদ!'

চার বছরের অক্লান্ত চেষ্টায় যশোর সমিতি আজ একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। পূর্ব-পাকিস্তানে গঠন-মূলক প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে আজ তার নাম সুপরিচিত। আমাদের অন্য কোনো বল নাই, আছে মনো-বল। সেই মনোবল নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি বৃহত্তর কল্যাণের পথে। একদল মুষ্টিমেয় তরুণ শুধু আমাদের সঙ্গে আছে; আমাদের আদর্শকে তারাই দিচ্ছে রূপ। তরুণ সেই দলকে জানাই আজ অকুণ্ঠ অভিনন্দন।

গত চার বছরে যশোর-সমিতি অনেক কাজ করেছে। কাজ এখনো ফুরায়নি, সামনে আরও অনেক বড় কাজ করবার আছে। কিন্তু একটা জিনিসের গৌরব আমরা করি। আমাদের স্বষ্টিধর্মী প্রতিভা দিয়ে আমরা এক নূতন যশোর রচনা করেছি। যশোরের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ তাই ছিন্ন হয়নি। তার হাসিতে আমরা হাসি, তার কান্নায় আমরা কাঁদি---তাকে আমরা স্বপ্নে দেখি। এই নবস্বষ্টির গৌরব একান্তরূপে যশোর সমিতির। সমিতি যেন একটা আরশি। এই আরশিতে সমগ্র যশোরের জনমনের অন্তর্মূর্তি আমরা দেখতে পাই। সবার মুখ একসঙ্গে ভিড় জমিয়েছে আমাদের এই মনোমুকুরে। সবার হাসি-কান্না এক সঙ্গে আজ শুনতে পাচ্ছি। বিচ্ছিন্ন একটা বিরাট পরিবারকে আমরা যেন একত্র করেছি, আমাদের স্ত্রী-পুত্র মা ভাই-বোন ও প্রতিবেশীকে আজ আমরা একখানে মিলিয়েছি। 'আমি' নই---'আমরা'-অনুভূতি আজ প্রত্যেক যশোরবাসীর মনে সুস্পষ্ট।

ব্যষ্টি যখন সমষ্টির মধ্যে নিজকে অনুভব করতে শিখে, তখনই হয় সত্যিকার জাতীয় জীবনের জাগরণ। সদর, নড়াইল, ঝিনাইদা, মাগুরার সীমা-প্রাচীর আজ ভেঙে গেছে; যশোর সমিতির চোখে আজ শুধু একটা মূর্তিই বড় হয়ে আছে---সে হচ্ছে যশোর।

কিন্তু শুধু যশোরকেই আমরা একান্ত করে দেখিনি। যশোরের কথা ভাবতে গিয়ে আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের কথাও ভেবেছি। যশোর শুধু একা তার কথা নিয়ে থাকতে পারেনা। খুলনা, কুষ্টিয়া, পাবনা প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিও তার পর নয়! জীবনের দিকচক্রবাল এমনি করে দিন দিন আমাদের বড় হয়ে যায়। আমরা তাই বৃহত্তর মানবতারও প্রতিষ্ঠা করেছি। জেলা ছেড়ে আমরা ডিভিশনের সুখ-দুঃখের কথাও ভাবছি। রাজশাহী ডিভিশন্যাল এসোসিয়েশনও আমরা গঠন করেছি। আজ রাজশাহী, পাবনা, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, কুষ্টিয়া, খুলনা ও যশোর সবাই হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলেছে সুমুখ পানে। আমরা জানি, সাধনা করলে আমরা এক একটা করে আরও সিঁড়ি অতিক্রম করবো এবং পাকিস্তান ও মুসলিম জাহানের সীমানা পেরিয়ে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ চিন্তা করবো। যশোর সমিতির সর্বোচচ স্তর হচ্ছে বিশ্ব-কল্যাণ-সমিতি।

যশোর সমিতির তাই প্রয়োজন আছে। প্রত্যেক জেলা-সমিতি যদি সুগঠিত না হয় এবং মজবুত ভিত্তির উপর না দাঁড়াতে পারে, তবে গোটা প্রদেশের সংহতিও সুদৃঢ় হয়না। যশোর সমিতির এই সাধারণ সভায় দাঁড়িয়ে আজ তাই আমার সহানুভূতি ও আবেদন অন্যান্য জেলাবাসী ভাইদের প্রাণের দুয়ারেও পৌঁছে দিচ্ছি। আজকের এই দিনে যারা বাইরে আছেন, তাঁদেরও জানাচ্ছি আমাদের সালাম আর আন্তরিক শুভেচ্ছা।

যশোর সমিতি আর একটা গৌরবের অধিকারী। বৃহত্তর গোষ্ঠি-গঠন-চিন্তায় তারা অগ্রণী। আপনারা জানেন, পাকিস্তানের জন্মের অব্যবহিত পরেই আমাদের এই যশোর সমিতি গঠিত হয়। সবই তখন নূতন; রাজধানী নূতন, আপন স্বার্থ-চিন্তায় মানুষ তখন ব্যাকুল। এমন সময় এই চঞ্চল আবহাওয়ার মধ্যে একমাত্র ঢাকাস্থ যশোরের মুষ্টিমেয় তরুণদের মধ্যেই জেগে উঠেছিল তাদের সমগ্র রূপের কথা; ভেবেছিল তারা সারাটি জেলার সুখ-দুঃখ ও অভাব-অভিযোগের কথা। সেবা ও সংগঠন কার্যে যশোরের এই অগ্রবর্তিতা তাই উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেখাদেখিই পরে অন্যান্য জেলাগুলিতেও জেলা-সমিতি গঠিত হয়েছে।

যশোর যে সংগঠন-কার্যে শুধু পাকিস্তানেই অগ্রণী হয়েছে, তাও নয়;

মিলিত বঙ্গের আমলেও যশোর লাভ করেছিল পেশ-কদমের গৌরব। মনে পড়ে ১৯০৭ বা তার কাছাকাছি সময়ে কলিকাতায় ঐরূপই একটা যশোর সমিতি গঠিত হয়। যশোরের অন্যতম কৃতিসন্তান মরহুম মৌঃ সিরাজুল ইসলাম এম-এ, বি-এল ছিলেন তখন সেই প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেণ্ট। যশোরের দেখাদেখি পরে অন্যান্য জেলাতেও অনুরূপ জেলা-সমিতি গঠিত হয়। সুতরাং যশোর তখনও ছিল না-চলা পথের অগ্রপথিক। লাখো শুকরিয়া খোদার দরগায় যে, আজ সীমান্ত পেরিয়ে এসে নূতন রাজধানী-তেও যশোর সেই নকীবের ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হয়েছে। এইখানেই আমাদের কৃতিত্ব। অনাগত ভবিষ্যৎ যে আমাদের চোখে ছায়া ফেলে সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি নিয়ে আমরা যে পথ চিনে লই, একটুকুই আমাদের বিশেষত্ব। যশোরবাসীর মুখ অনাহারে বেদনা-মলিন কিন্তু বুদ্ধি-দীপ্তিতে তার অন্তর উজ্জ্বল। যশোর আজই শুধু তার খেজুর রস ও পাটালি গুড়ের জন্য বিখ্যাত নয়, বহু পূর্ব থেকেই সে এই রসের বেসাতি করে আসছে। পাঠান, মোগল ও বৃটিশ আমলেও সে সরবরাহ করেছে চিনি ও গুড়। ইতিহাস থেকে জানা যায়, কোটচাঁদপুরে বিরাট চিনির করখানা ছিল। সেখান থেকে লাখ লাখ টাকার চিনি ইউরোপে রপ্তানি হতো। আর সে চিনি ছিল যশোরের মুসলমানদের তৈরী।

এ থেকেই মনে হয়, যশোরের মাটির তলে আছে এক অক্ষয় রস-ধারার উৎস-মুখ। খেজুর গাছগুলো যেন সেই রস-ধারার এক একটা পাইপ বা চোঙ্। যশোরের মাটিতে ফলে তাই এত কাব্য, এত গান, এত ছন্দ, এত প্রাণ। যুগে যুগে যশোরে জন্মেছে কবি-সাহিত্যিক, নৃত্য-শিল্পী, বাগ্মী, জন্মেছে ভাববাদী সাধক-দরবেশ ও অলি-আল্লাহ্। মাইকেল-মধুসুদন, উদয় শঙ্কর, শিশির কুমারও যেমন জন্মেছে, তেমনি জন্মেছে ক্ষণজন্মা বাগ্মীপুরুষ মুনশী মেহের উল্লাহ্, গরীব শাহ্ ফকির, লালন শাহ্ ও পাগলা কানাই। মুন্শী মেহের উল্লাকে আমরা এখনো সম্যকরূপে চিনিনি, চিনলেও তাঁর যোগ্য সমাদর আমরা করিনি; কিন্তু দিন যেদিন আসবে, সেদিন দেখা যাবে তার নাম লেখা হয়েছে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নকীবের রূপে। আঁধার যুগে তিনি ছিলেন আমাদের নও-বেলাল। তিনিই

ডাক দিয়েছিলেন আমাদের আঁধার থেকে আলোকে, মৃত্যু থেকে জীবনে। জেলায় জেলায় মেহের উল্লার জন্ম-বার্ষিকী আজ উদ্‌যাপিত হওয়া উচিত। যশোর সমিতি এই কর্তব্য যথাযোগ্য ভাবে পালন করবে।

আধুনিক যুগেও যশোর কারো পশ্চাতে পড়ে নেই। বর্তমান বাংলা সাহিত্যে যশোরের কবি-সাহিত্যিকেরা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন।

শিল্প ও জ্ঞানের ক্ষেত্রেও যশোর গৌরবের অধিকারী। পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রিণ্টিং প্রেস 'প্যারামাউণ্ট প্রেস' যশোরের প্রতিষ্ঠান। একমাত্র বাঙালী মুসলিম চিত্র-তারকা বনানী চৌধুরীও যশোরের মেয়ে। শিল্প-সাহিত্য ও চিন্তার ক্ষেত্রে যশোরের দান তাই অনস্বীকার্য।

এই আগে-চলার নেশা ভয়ঙ্করের পথেও যশোরকে করেছে অগ্রণী। এশিয়াটিক কলেরা এবং ম্যালেরিয়া জ্বর সর্বপ্রথম যশোরেই দেখা যায়।

নিতান্ত দুঃখের বিষয়, রাজনীতি ক্ষেত্রে যশোর তার যোগ্য আসন এখনও লাভ করতে পারে নাই। যশোরের রাষ্ট্রীয় ও ভৌগোলিক গুরুত্ব অন্যান্য জেলা অপেক্ষা অনেক বেশী। পূর্ব-পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষা করছে যশোরবাসীরা। যশোরবাসীকে তাই তুলনা করা যেতে পারে পাঠান ও আফ্রিদিদের সঙ্গে। এই কঠিন ভূমিকায় তারা অবতীর্ণ হয়েছে।

যশোরের নওযোয়ান দল! তোমাদের সামনে এসেছে এক নূতন প্রতিযোগিতার যুগ। তোমাদের ঘুমন্ত শক্তি আজ জাগাও। বহির্বিশ্বের পানে তাকাও। আপন শক্তি বলে আজ তোমাকে দাঁড়াতে হবে। যোগ্যতা অর্জন না করলে আজ কেউ তোমাকে খাতির করবেনা। আজ তোমার ভৈরব ও কপোতাক্ষী গতি হারিয়েছে; তোমার মনের ভৈরব ও কপোতাক্ষীও কি আজ কচুরীপানায় আচ্ছন্ন নয়? এই মনের নদীর সংস্কার না হলে বাইরের নদী চালু হবেনা। যশোর সমিতির হে তরুণ কর্মীরা, এসো আজ সেই নদীর বাঁধ আমরা কেটে দেই। জোয়ার আসুক আবার আমাদের জীবনে। দেখবে সেই নূতন স্রোতে আমাদের মনের বদ্ধ আবর্বনা সব ভেসে যাবে; আমাদের নদী-নালা সব আবার বেগবতী হয়ে উঠবে, যশোর আবার ফুলেফলে নবগৌরবে জাগবে।

ঢাকা, ১৯৫২

মাঠের কবি

দেশের মাটিই হচ্ছে প্রত্যেক জাতির Real State বা সত্যিকার রাষ্ট্র। কাজেই আমাদের কৃষক ভায়েরাই হচ্ছে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সত্যিকার নাগরিক। মাটির সঙ্গে এদেরই রয়েছে রক্ত-মাংসের সম্বন্ধ।

সাহিত্য প্রত্যেক জাতির মনোমুকুর। সাহিত্যের আর্শিতেই জাতির অন্তর্মূর্তি প্রতিফলিত হয়। আমাদের সাহিত্যেও তাই স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিবিম্বিত হবে আমাদের কৃষক-জীবনের ছবি। শতকরা ৯০ জনকে বাদ দিয়ে কোনো সাহিত্য রচিত হতে পারে না; হলেও তা হবে বুর্জোয়া সাহিত্য বা কুলীন সাহিত্য। আমরা যে ভাষায় লিখি, তাতে আছে সেই আভিজাত্যের গন্ধ। এ ভাষা মাটিতে নামতে জানে না, শুধু জানে আকাশে উড়তে। সাহিত্যের এই ব্রাহ্মণ্যরূপ এখন আমাদের যথাসাধ্য বর্জন করতে হবে; নামতে হবে আমাদের ধরার ধূলায়, শুনতে হবে মাটির বুকের কান্না-হাসি, গাইতে হবে মাটির মানুষের গান। এদের জীবনেও রহস্য আছে, রোমাঞ্চ আছে, প্রেম আছে, বিরহ আছে। কাব্য ও সাহিত্যের প্রচুর উপকরণ এখানে আছে। Bitter Rice-এর মতো তিক্ত ধান এদেশেও জন্মে; Silviana-র মতো মেয়ে এ দেশেও অনেক পাওয়া যায়। সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার গুণে ইটালিতে তা নিয়ে রচিত হয় অমর কাব্য-কাহিনী আর এখানে কিছুই হয় না। আমাদের দৃষ্টিকোণের ও মূল্যজ্ঞানের পরিবর্তন হওয়া তাই একান্ত প্রয়োজন। এদের প্রতি এখন আমাদের চোখ ফিরাতে হবে। দরদী শিল্পীর ছোঁওয়া লাগলে এই সব উপকরণই অপরূপ কাব্যশ্রীতে মণ্ডিত হতে পারে। দুঃখের বিষয়, আমাদের কবি সাহিত্যিকেরা এদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছেন; এদের জীবনের চমৎকারিত্ব ও মাধুর্য তাই এরা ধরতে পারেন না। আজ তাই নূতন করে সম্বন্ধ পাতাতে হবে এদের সাথে; কলকাতা বা কৃষ্ণনগরী ভাষার মোহ আমাদের ভুলতে হবে। আর ভাষার রূপ বদলালেই সাহিত্যের মূল্য ও মান কমে যাবে,

তাই বা কে বলছে। ওটা একটা সংস্কার মাত্র। কলকাতার ভাষাই যে আদর্শ ভাষা, তা তো নাও হতে পারে। স্থষ্টি করতে জানলে পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা দিয়েও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য রচনা করা যায়। লালন ফকিরের গান বা ময়মনসিংহ-গীতিকা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। কৃষকদের নিয়ে স্থষ্টি করতে হবে এক নূতন সাহিত্য—পোষাকী সাহিত্য হতে যা হবে স্বতন্ত্র। বর্তমান পণ্ডিতী ভাষায় সে সাহিত্য রচনা সম্ভব হবে না; তার জন্য খুঁজতে হবে আমাদের নূতন টেক্‌নিক—নূতন শব্দ-সম্পদ।

আমাদের কবিসাহিত্যিকরা খানিকটা অকৃতজ্ঞ বৈ কি। 'দেওয়া-নেওয়া' (Give and take) নীতির উপরেই সমাজ গড়ে উঠেছে। তোমার যা অভাব আমি পূরণ করবো; আমার যা অভাব, তুমি পূরণ করবে—সমাজ-বিজ্ঞানের গোড়ার কথাই হলো এই। সমাজ জীবন এমন করেই গড়ে উঠেছিল প্রথমে। কিন্তু এই চুক্তি ভঙ্গ করেছে স্বার্থবাদীরা, তাই সমাজের স্তরে স্তরে দেখা দিয়েছে এত অশান্তি—এত সংঘাত। অন্য যে যা-ই করুক, অন্ততঃ কবি-সাহিত্যিকদের দৃষ্টি ওদের পানে উদার ও সহানুভূতিশীল হওয়া দরকার। টলষ্টয় বড় সুন্দর কথাই বলে গেছেন যে, কৃষকেরা যা উৎপন্ন করে, তা যদি কবি-সাহিত্যিক বা শিল্পীরা অসঙ্কোচে গ্রহণ করতে পারে, তবে তাদেরও উচিত এমন সাহিত্য উৎপন্ন করা—যা কৃষক মজদুরেরাও খানিকটা উপভোগ করতে পারে। দুঃখের বিষয়, আমরা শুধু নিতেই জানি, দিতে জানিনা। ওদের ধান, ওদের শস্য, শাক-সবজী, তরী-তরকারী দিব্বি আমরা খেয়ে যাচ্ছি, কিন্তু আমরা বসে বসে এমনি দিল্লীকা লাডডু বা অশ্বডিম্ব তৈয়ার করছি—যা ওরা মোটেই গ্রহণ করতে পারে না, করলেও স্বাদ পায়না। আমাদের স্থষ্টির পানে ওরা তাই অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। ওরাও শিল্পী আমরাও শিল্পী, কিন্তু ওদের আর্ট হচ্ছে Art for man's sake, আর আমাদের স্থষ্টি Art for Art's sake—এই হচ্ছে পার্থক্য। ওদের কাব্য-স্থষ্টির প্রতি-বছরেই নূতন সংস্করণ বেরোয়, কিন্তু আমাদের কাব্যের এক একটা সংস্করণ বেরুতে কতো বছর লাগে?

সমস্ত কাব্য-শিল্পই স্থষ্টিধর্মী। যেখানে আছে স্থষ্টি ও সৌন্দর্যের

বিকাশ, সেখানেই প্রকাশ পেয়েছে কাব্য ও আর্ট। কথা দিয়ে যারা মালা গাঁথে তারাই শুধু কবি নয়, রং-এর তুলি দিয়ে যে ছবি আঁকলো, কণ্ঠ দিয়ে যে সুর সৃষ্টি করলো, শ্বেত-মর্মরে যে 'তাজমহল' গড়লো—সেও কবি। এই হিসাবে আমাদের কৃষক ভায়েরাও কবি। তারা সৃষ্টি করে ধানের মঞ্জরী, মাঠে মাঠে ফলায় সোনার ফসল, ফুটায় তারা ফুল ও ফল। এক-একখানি আল-বাঁধা ক্ষেত যেন তাদের বিরাট কাব্যের এক একখানি পৃষ্ঠা ; অথবা এক একখানি ফ্রেমেআঁটা ছবি। ওদের লাঙল, কাস্তে, নিড়ানি—এগুলো সব তুলি। এক এক সময় এক একটা দিয়ে সরু মোটা কাজ করতে হয়। এমনি করে দিনে দিনে ফুটে ওঠে ওদের মনের স্বপ্ন বাস্তব রূপ নিয়ে। ওদের সোনার তুলির ছোঁওয়া লেগে জেগে ওঠে কতো বর্ণ, কতো গন্ধ, কতো গান, কতো ছন্দ! বর্ষা-শরতে, শীত-বসন্তে, ওদের মাঠে মাঠে বসে ফসলের উৎসব। প্রথম আষাঢ়ে দাওয়াৎ পাঠায় ওরা মেঘে মেঘে গগনে গগনে। বাজে বাদল, বাজে মৃদঙ্গ, সাথে সাথে নেচে যায় বাদলা-পরীরা রুম্‌ঝুম্‌ নূপুর পায়ে। হেমন্তে আসে ভোজের উৎসব। মাঠ ভরা সোনালী ধান—কে কতো নেবে নাও ; কে কতো খাবে খাও! আসে দোয়েল কোয়েল, আসে বুলবুল, আসে আরো নাম-না-জানা কতো পাখী! ঘাটে ঘাটে ভিড় করে কতো পণ্য-তরণী, গঞ্জে গঞ্জে বসে কতো হাট-বাজার। মাঠের কাব্যের কল-সঙ্গীতে সারা দেশ ওঠে মেতে! শীতের শেষে ওরা করে আনন্দোৎসব। কতো মটর-কুমারী ও সর্ষে বালা নেচে নেচে গান গায়—নানা রঙের ওড়না তাদের গায়ে। রূপ আর সুরভিতে ভরে ওঠে সারামাঠ। কী বিচিত্র এদের কাব্য-বোধ।

এই অনাদি কালের স্বভাব-কবিদের থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছি আমরা। এদের বাণী, এদের সুর, এদের ছন্দ আমাদের বুঝতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানের কবি-সাহিত্যিকেরা এই পথে এগিয়ে আসুন।

কৃষিকথা, ১৯৫৩

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

হে কবি,

শতাব্দীর আড়াল থেকে তোমারই দেশের আর এক নগণ্য কবি জানায় তোমাকে সশ্রদ্ধ তসলিম। এই শ্রদ্ধা নিবেদন শুধু একটা মামুলি শিষ্টাচার নয়। অন্তরে অন্তরে তোমার সাথে আমার যে নিবিড় যোগ রয়েছে তারই এ স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। যে মাটির বুকে, যে আকাশের তলে, যে আলো-বাতাসে একদিন তমি লালিত হয়েছিলে, সেই মাটি সেই আকাশ—সেই আলো-বাতাস আমারও জীবনকে করেছে পরিপুষ্ট। তোমার জন্মভূমি আমারও জন্মভূমি---এইতো আমার এক বড় পরিচয়। আজ এই সাগরদাঁড়িতে এসে আমার মনেও দোলা লেগেছে। এই সাগরদাঁড়িতে দাঁড়িয়েই তো তুমি শুনেছিলে মহাসাগরের আহ্বান---পেয়েছিলে অসীমের ইংগিত। তাই তো দিয়েছিল ভাসিয়ে অনন্তের পানে তোমার গানের তরী। আজ এসেছি তোমার সেই জয়যাত্রার বেলাভূমি পুণ্যস্মৃতি সাগরদাঁড়িতে। আশা আছে এই বন্দর থেকে আমিও ভাসাবো আমার স্বপ্নের তরী---নীল সাগরের বুকে। হে কাব্যলোকের দুঃসাহসী কলম্বস, আমার চলার পথে তুমি রেখাপাত করে গেছো। শুনে খুশী হবেঃ এই খণ্ডকাব্য ও তরল ভাববিলাসের যুগে আমিও তোমার পদানুসরণ করে লিখেছি একখানি মহাকাব্য। সে-কাব্যের কিছুটা আজ তোমাকে শুনিয়ে যাবো। জানিনা আমার এ প্রচেষ্টা সার্থক হবে কিনা এবং আমার দেশবাসী একে গ্রহণ করবে কিনা। যদি করে, তবে সে-কৃতিত্বের উপর তোমার দাবী থাকবে অনেকখানি, আর থাকবে মহাকাব্যের দেশ এই যশোরের আলো-বাতা আরস মাটির।

তুমি শুধু যশোরের নও—পাকিস্তানের। জানি কবিরা সর্বদেশের, সর্ব কালের। তবু যদি দৃষ্টিকোণকে খর্ব করে জাতীয়তা বা প্রাদেশিকতার আলোকেও তোমাকে দেখি তা হলেও তোমাকে নিয়ে আমরা গর্ব করতে

পারি। পূর্ব-পাকিস্তান আজ এমন একজন কবিকে পেয়েছে যিনি বাংলা ভাষার অন্যতম মহাকবি। এই গৌরব গোটা পাকিস্তানের।

কাব্য হচ্ছে সত্য ও সুন্দরের প্রকাশ। তার আবেদন কোনো দিন সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে না, আকাশের আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে সে ভুবনে ভুবনে। কাব্য সাহিত্য ও শিল্প তাইতো বিশ্ববাসীর সাধারণ সম্পত্তি। কবি-শিল্পীরা গোটা মানব জাতির প্রতিনিধিত্ব করেন। সব কাব্য সব সাহিত্য হচ্ছে জীবনেরই রূপচ্ছবি---জীবনেরই রসমূর্তি। সে জীবন কার. সে প্রশ্ন অবান্তর। কবি হিন্দু না মুসলমান না খৃষ্টান—সে প্রশ্ন কেউ করে না। সত্য ও সুন্দর এমনি করে ব্যক্তি সমাজ ও দেশের গণ্ডী পেরিয়ে গিয়ে বিশ্বজনীন হয়। তাজমহল আজ আর শাহ্‌জাহানের নয়—সারা জাহানের। ব্যক্তির চিন্তা বা শিল্পসৃষ্টি এমনি করে বিশ্ব-মানুষের মনের প্রতিনিধিত্ব করে। সেই জন্যই তো হোমার, ভার্জিল, বাল্মিকী, সাদী, হাফিজ, রুমী, দান্তে, মিলটন, শেক্‌স্‌পিয়ার, রবীন্দ্রনাথ, ইকবাল---সবাই আজ বিশ্বকবি।

মধুসূদনের কাব্যে ঝংকৃত হয়েছে সেই চিরন্তনের সুর। তাই আজ তাঁর আবেদন আমাদের সকলের কাছেই সমান। তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে তার স্বদেশবাসীর কাছে হয়তো খানিকটা ছোট হয়েছেন, কিন্তু মূলতঃ তিনি তাঁর নিজ ধর্মে নিজ দেশে এবং নিজ সমাজেই আছেন। সেখানে তাঁর সমাজ বা ধর্মচ্যুতি ঘটে নি। ধর্মচ্যুতি বা সমাজচ্যুতি যে ঘটেনি, তাঁর প্রমাণ আজ এখানেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। মধুসূদন ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দুঘরের ছেলে। তিনি হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করলেন, সমাজ পরিত্যাগ করলেন, স্বদেশ পরিত্যাগ করলেন। হিন্দুধর্ম ও সমাজের প্রতি এটা একটা প্রচণ্ড আঘাত সন্দেহ নাই; কিন্তু বিরাট মানব সমাজ তো তাতে কিছু হারায়নি। হিন্দু সমাজ ছেড়ে তিনি বৃহত্তর মানব-সমাজে এসেছেন। মাইকেল এখন মানুষের কবি--মানবতার কবি। বাংলা ভাষার চিরাচরিত রীতি-পদ্ধতি ছেড়ে অমিত্রচ্ছন্দে তিনি কাব্য রচনা করলেন, 'মেঘনাদবধ কাব্যে' হিন্দুর পরমারাধ্য আদর্শ পুরুষ রাম ও লক্ষ্মণকে করলেন তিনি খাটো, আর তার পাশে উঁচু করে ধরলেন রাবণ মেঘনাদ ও প্রমীলাকে, রাক্ষস-জাতীয় অনার্য ও অসভ্য লঙ্কাবাসীদিগকে দিলেন তিনি মানুষের পদমর্যাদা

ও গৌরবাধিকার। এতবড় প্রচণ্ড আঘাত ও বিদ্রোহের পরও আজ দেখতে পাচ্ছি হিন্দু-সমাজ মাইকেলের গৌরবে গৌরবান্বিত। এ নিশ্চয় হিন্দু-সমাজের উদারতা, উন্নত কাব্যরসানুভূতি ও বিশ্বমানবতাবোধেরই পরিচায়ক। শুধু তাই নয়, মধুসূদনের সমসময়েও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও মধুসূদনকে অবজ্ঞা করেন নি; বরং দুর্দিনে তাঁরা তাঁকে সাহায্যই করেছেন। এর দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, কালজয়ী প্রতিভা গণ্ডীসংকীর্ণতা অতিক্রম করে শাশ্বত মহিমার আসন লাভ করে। মধুসূদনের যুবমনে সৃষ্টির বেদনা ও কৌতূহল অতিমাত্রায় প্রবল হয়ে উঠেছিল; একটা দুর্নিবার আকাঙক্ষার তাড়নায় তিনি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বৃহত্তর জীবন ও বিশ্ববোধই তাঁকে এই গণ্ডী-ভাঙার প্রেরণা দিয়েছিলো। এটা ঠিক যে, হিন্দুসমাজে থেকেও যদি তিনি কোনো মৌলিক দান দিতেন, তা হলেও তিনি বিশ্ববরেণ্য হতে পারতেন—যেমন হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। বস্তুত জাতি ধর্ম বা দেশের প্রশ্ন সাহিত্যে বড় কথা নয়। বড় এখানে সৃষ্টির প্রশ্ন।

তবে একথাও সত্যি যে, মাইকেলী যুগে বাংলার হিন্দু-সমাজে যে রক্ষণশীলতা ও প্রতিকূল পারিবেশ ছিল, তাতে দেশ ও ধর্ম ত্যাগ না করে তাঁর উপায় ছিল না। যে অমূল্য সম্পদ তিনি তাঁর দেশবাসীকে উপহার দিয়ে গেছেন, আপন দেশে আপন সমাজ ও ধর্মের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকেল হয়তো তা তিনি দিতে পারতেন না। নূতন সৃষ্টির তাগিদেই তাঁকে বিদ্রোহী হতে হয়েছিল। যে-বিদ্রোহের পশ্চাতে থাকে নবসৃষ্টির আকাঙক্ষা ও সাধনা, সে-বিদ্রোহ অপরাধ নয়। সৃষ্টির গৌরবে সে বিদ্রোহকে ক্ষমা করা যায়।

মধুসূদনের স্বধর্ম ও স্বদেশ বর্জন নানা কারণে সার্থক হয়েছে। বাংলা ভাষার মুক্তি ও কল্যাণের জন্য একজন ভক্তের রক্তদানের প্রয়োজন ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনেকে বাংলা-ভাষার জন্মদাতা বলে মনে করেন। তাঁর দান অনস্বীকার্য, সন্দেহ নাই, তবু বলতে হবে বাংলা ভাষার সত্যিকার মুক্তি এসেছে মাইকেলের হাতে। মধুসূদনই বাংলা-ভাষাকে গণ্ডীসংকীর্ণতার হাত থেকে উদ্ধার করেছেন। আজ যে বাংলা-ভাষার এত বৈচিত্র্য, এত সমৃদ্ধি তার মূলে রয়েছে মধুসূদনের যাদুস্পর্শ। সংস্কৃত ব্যাকরণ, রচনা-

পদ্ধতি ছন্দ-প্রকরণ এবং পয়ার-ত্রিপদীর একঘেয়ে সুর (jingling monotony) বাংলা ভাষাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল। ছন্দের লৌহ-প্রাচীরের মধ্যে কাব্যস্রোত রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। মধুসূদন বুঝেছিলেন: এই বন্দিনী বাংলা-ভাষার মুক্তি সাধন করতে হলে একে দিতে হবে পাশ্চাত্যের স্পর্শ। কে হবে কালাপানি পার? কে শিখবে ম্লেচ্ছদের ভাষা, ভাব ও আংগিক? কে করবে বাংলা-ভাষাকে নব রূপদান? ভাষা-জননীর আহ্বান ফিরে গেল সবার দুয়ার থেকে। কেউ সাড়া দিল না। অবশেষে যশোরের এক নিভৃত পল্লী থেকে এক তরুণ কিশোর এগিয়ে এলো আত্মদান করতে। স্বধর্ম ছাড়লো সে, স্বদেশ ছাড়ালো সে। গেল বিদেশে, শিখলো নানা ভাষা, নানা ছন্দ, নানা সুর। তারপর লিখলো এসে নূতন ভংগীতে এক নূতন মহাকাব্য, রচনা করলো সনেট; রচনা করলো নাটক। বাংলা ভাষার প্রগতির পথ থেকে সরে গেল যেন একখানা প্রকাণ্ড জগদ্দল পাথর! অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে এলো যেন নূতন আলো-বাতাসের মুক্ত প্রবাহ। বদ্ধ পুষ্করিণীর পাড় ভেঙে এলো যেন সমুদ্রের উদ্দাম প্রাণবন্যা। কে করলে এই যুগপ্রবর্তন? কে আনলো এই বিপ্লব? কেউ নয়—যশোরের এই সাগরদাঁড়িরই দুঃসাহসী তরুণ বীর মধুসূদন। সারা বাংলা দেশের মধ্যে বন্দিনী ভাষা-জননীর ক্রন্দনে যেখানে-কেউ সাড়া দেয়নি, যশোর সেখানে এগিয়ে এসেছে। এ গৌরব একান্তরূপে যশোরের। সত্যি, ভাবলে অবাক হতে হয়,—মাত্র উনিশ বছরের এক তরুণ যুবকের অন্তরে কি করে জাগলো এমন একটা কল্যাণ-জিজ্ঞাসা—এত বড় ধ্রুবের অন্বেষা! ধর্মান্তর গ্রহণ করা, বিলেত যাওয়া বা সনাতন রীতি-নীতিকে অস্বীকার করে কোনো একটা নূতন পথে চলা এখনকার দিনে সহজ, কিন্তু মাইকেলের যুগে তা কতো কঠিন ছিল, তা সকলেই জানেন। একে তো না-চলা বন্ধুর পথ, তাতে আবার একলা পথিক। কতোখানি মনোবল ও গভীর আত্মপ্রত্যয় থাকলে একটা যুবক এই বিপদ-সংকুল অচিনু পথে পা বাড়াতে সাহস করে! এইখানে মাইকেলকে দেখতে পাই শুধু স্রষ্টারূপেই নয়, দ্রষ্টারূপেও। তাঁর চোখে ছিল পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি। দেখতে পেয়েছিলেন তিনি অনাগত ভবিষ্যতের স্বপ্নচ্ছবি, শুনতে

অমিত্রাক্ষর ছন্দ

মাইকেলের সব চেয়ে বড় অবদান হলো বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন। আমাদের দেখতে হবে কেন তিনি এই নূতন পথে চললেন। মাইকেলের সময় পর্যন্ত বাংলা ভাষায় প্রচলিত ছিল শুধু পয়ার আর ত্রিপদী। ভারতচন্দ্রই প্রাক-মাইকেল যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর কাব্যে ভাবলালিত্য ও রস-মাধুর্য ছিল যথেষ্ট, কিন্তু ছিলনা কোনো গাম্ভীর্য বা বীর-রস। পয়ার ও ত্রিপদীর দোষ হলো-- বেশীক্ষণ এ-ছন্দ চালাতে গেলেই একঘেঁয়েমি এসে পড়ে। কোনো গম্ভীর বিষয়বস্তু ধারণ করবার পক্ষে পয়ার বা ত্রিপদী উপযুক্ত বাহনও নয়। ইউরোপের যতো মহাকাব্য, তার অধিকাংশই মুক্তছন্দে লেখা। হোমার, ভার্জিল, মিলটন, শেক্‌সপিয়ার এরা সকলেই মুক্তছন্দ ব্যবহার করেছেন। এ সম্বন্ধে ইউরোপীয় সাহিত্যে অবশ্য দুটো দল আছে, এক দলের মতে ছন্দ ছাড়া কোনো কাব্যই চলে না; আর এক দলের মতে কাব্যের সহজ প্রকাশের পথে ছন্দ একটা মস্ত বড় বন্ধন বিশেষ। মিলটন তাঁর 'PARADISE LOST'-এর ছন্দ সম্বন্ধে বলেছেন:

"The measure is English Heroic verse without Rime, as that of Homer in Greek and of Vergil in Latin, rime being no necessary adjunct or true ornament of poem or good verse, in larger works especially."

মহাকবি গ্যেটে কিন্তু এর বিপরীত মত পোষণ করতেন। তিনি বলেন:

"All that is poetic in character should be rhythmically treated."

দুই তরফেই কিছু বলবার আছে। তবে আমার মনে হয়: মহাকাব্যের পক্ষে অমিত্রাক্ষর ছন্দই অধিক উপযোগী। ইচ্ছামত যতিভঙ্গের ফলে মুক্তছন্দে বৈচিত্র্য আনা যায়, একঘেয়েমি দোষ দূর হয়। মাইকেল ছিলেন এই মতাবলম্বী। মিলটনের "Paradise Lost" তাঁকে দিয়েছে বিপুল প্রেরণা। এরই অনুকরণে তিনি লিখেছিলেন 'মেঘনাদবধ কাব্য'। কিন্তু ইংরাজী ভাষার দিক দিয়ে মেঘনাদবধ কাব্য অনুকরণ হলেও বাংলা-সাহিত্যে এ এক সম্পূর্ণ মৌলিক দান। অনস্তিত্বের ভিতর থেকে কিছু একটা সৃষ্টি

করা সহজ কথা নয়। সৃষ্টিধর্মী প্রতিভা ছাড়া এ কাজ কেউ করতে পারে না। বাংলা ভাষায় নাটক এবং সনেটও মাইকেলের নবসৃষ্টি। এই বিপুল সৃষ্টির উল্লাসেই মাইকেল বিদ্রোহী হয়েছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সার্থকতায় আজ তাঁর বিদ্রোহও সার্থক হয়েছে। বাংলা ভাষার তিনি ত্রাণকর্তা বা 'saviour'। এই বিদ্রোহই ত সুন্দর। সৃষ্টির জন্য যাঁরা ধ্বংস করেন তাঁরা যুগমানব।

মাইকেলের কাব্য সমালোচনার স্থান এ নয়। তাঁর কাব্যের বিরুদ্ধে যে কিছুই বলবার নেই—সে কথা আমি বলছি না। প্রত্যেক কবিরই কিছু-না-কিছু দোষত্রুটি থাকেই। ভাল কাব্যের (poesia) সঙ্গে কিছু-কিছু অকাব্যও (non-poesia) থাকে। মাইকেলেও আছে। তাছাড়া যুগে যুগে মানুষের রুচিজ্ঞানও পরিবর্তিত হয়। তাই এ-যুগের মানুষ যদি মাইকেল-কাব্যের কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনা করেই, তাতেও কোনো দোষ হয় না। অমন সুন্দর যে চাঁদ, তারও বুকে আছে কলঙ্ক। কবিরাই বা কেন বাদ যাবেন! যে মিলটন Paradise Lost লিখে বিশ্ববরেণ্য হয়েছিলেন, এ-যুগের দৃষ্টিতে তিনিও আজ রেহাই পাচ্ছেন না। এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও কাব্যসমালোচক T. S. Eliot মিলটনকে অত্যন্ত কঠোর ভাবে সমালোচনা করেছেন। তাঁর ভাষাকে তিনি বলেছেন "artificial and conventional." "Miltion writes English like a dead language." এই হলো এলিয়টের অভিযোগ। এর দুর্বোধ্য ভাষা অহেতুক শব্দাড়ম্বর কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাবগ্রহণে মস্তবড় বাধার সৃষ্টি করে—এই জন্য এলিয়ট উপদেশ দিয়েছেন 'Paradise Lost' কাব্যখানি দুইবার দুই ভঙ্গিতে পড়বার। একবার পড়তে হবে এর শুধু শব্দ-ঝংকারের সৌন্দর্য উপলব্ধি করবার জন্য, আর একবার পড়তে হবে এর অন্তর্নিহিত ভাব গ্রহণের জন্য। এটা অবশ্য তীক্ষ্ণ শ্লেষ, কারণ কাব্য কেউ এমন করে পড়ে না। পঠন ও রসগ্রহণ একই সঙ্গে চলবে—এই হলো নিয়ম।

মাইকেলের কাব্য-বিচারের সময়েও সমালোচকেরা হয়তো এইসব কথা বলবেন। তাঁর ভাষার দুর্বোধ্যতা এক মস্তবড় অভিযোগ। কিন্তু কোনো

সৃষ্টিই তো নিখুঁৎ নয়। দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও মেঘনাদবধ কাব্য বাংলা সাহিত্যে আজ পর্যন্ত যে একমাত্র স্বার্থক মহাকাব্য, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

কবির ভাগ্য

মাইকেলের শেষ জীবন বড় দুঃখের। এত বড় একজন প্রতিভাশালী কবিকে মরতে হলো নিদারুণ অভাবের মধ্যে দাতব্য চিকিৎসালয়ে! এই সময় তাঁর স্ত্রী হেনরিয়েটাও ছিলেন গুরুতর পীড়িতা। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে জুন মাসের ২৫ তারিখে হেনরিয়েটার মৃত্যু হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর মাত্র চারদিন পরে শোক-বিহ্বল কবিও ইহলোক ত্যাগ করেন। সেদিন ছিল রবিবার ২৯শে জুন, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

বিরাট বাংলা দেশের মুখ এখানে ছোট হয়ে গেছে। এমনকি খৃষ্টান জগতও তাঁদের কর্তব্য পালন করেন নি। মাইকেলের একটা জীবিকার্জনের সুব্যবস্থা তাঁরা অনায়াসেই করতে পারতেন। এতবড় একজন প্রতিভাবান ব্যক্তিও খৃষ্টসমাজের কাছে মর্যাদা পান নি। নেটিভ বলেই হয়তো তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল এই লাঞ্ছনা ও অবজ্ঞা।

একটা সান্ত্বনাই শুধু এখানে আছে, সেটা হচ্ছে—এই ভাগ্যবিড়ম্বনা শুধু যে মাইকেলই একা ভোগ করে গেছেন, তা নয়। যুগে যুগে দেশে দেশে কবিদের ভাগ্য এমনি করেই বিড়ম্বিত হয়েছে।

মাইকেলের জন্মোৎসব কিছুটা যেন একঘেঁয়ে হয়ে উঠেছে। সেটা কিছুতেই হতে দেওয়া হবে না। প্রতি বছর তার জন্মবার্ষিকী উদযাপন করেই আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করছি। তাতে সত্যিকারের কোনো কল্যাণ হচ্ছে না। তার চেয়ে তাঁকে কেন্দ্র করে যশোরে একটা মাইকেল-পাঠাগার বা মাইকেল-পুরস্কার পরিষদ গঠন করলে ভালো হয়। তাতে সাহিত্য-সৃষ্টির পথকে সুগম করা হয়, সাহিত্যিকেরাও উৎসাহ পায়। শুধু স্মৃতি-বার্ষিকী পালন করেই আমাদের ক্ষান্ত থাকা উচিত নয়। মাইকেলের আদর্শকে যথাসম্ভব আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে ; তবেই তাঁর স্মৃতি-উদ্‌যাপন সার্থক হবে। তাঁর মতো সবাইকে ধর্মান্তর গ্রহণ করতে হবে, তার কোন মানে নেই। তাঁর মধ্যে অন্যান্য আরও যেসব মহৎগুণ ছিল, তা থেকে

সকলে আমরা প্রেরণা নিতে পারি। তাঁর মতো ছাত্র কই? তাঁর মতো তরুণ কই? সেই অটল দৃঢ় বিশ্বাস, সেই নির্ভীক মনোবল, সেই গভীর সাধনা কই? কোথায় আমাদের মধ্যে সেই নবসৃষ্টির অদম্য কৌতূহল? আদর্শের জন্য কোথায় সেই আত্মত্যাগ? কোথায় সেই নূতন পথে চলবার দুর্জয় পণ, উদ্যম ও দুঃসাহস? শুধু ভাষা নয়, আমাদের জীবন-ধারাও আজ পয়ারের শ্লথগতিতে একটানা ভাবে বয়ে চলেছে। কোন্ তরুণ এই একঘেঁয়েমি ভেঙে দিয়ে আনবে আমাদের জীবনে মুক্তছন্দের উচ্ছল গতিবেগ? সেই তরুণ এসো, মাইকেলের স্মৃতিস্তম্ভে আজ মালা দাও।

সাগরদাঁড়ি

১৯৫৬

পদ্মা

পদ্মা। পূর্ব-পাকিস্তানের আদুরী সলিল-কন্যা পদ্মা! আমি তোমায় ভালোবাসি। অনন্ত-যৌবনা চিরকৌতুকময়ী এ কোন্ দুরন্ত মেয়ে তুমি! কখনো হাস্যময়ী, কখনো অশ্রুময়ী; কখনো সরল, কখনো অভিমানিনী; কখনো বা কল্যাণময়ী, কখনো বা ভয়ংকরী। ঋতুচক্রের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় তোমার মন, বদলে যায় তোমার রূপ! আমি দেখেছি তোমার শান্তশ্রী, দেখেছি পল্লীবধূর মতো স্নিগ্ধ মমতাময়ী তোমার রূপ। সোনার ধানে, সোনার পাটে ভরে দাও তুমি তোমার ভাইবোনদের গৃহের আঙিনা. ঘরে ঘরে বিলাও তোমার নবান্ন ও শির্‌ণি-পায়েশ। ঘাটে ঘাটে চলে পণ্য-তরণী, চলে জাহাজ, চলে খেয়াতরী। হাটে হাটে, গন্‌জে গন্‌জে, বন্দরে বন্দরে চলে সমারোহ. চলে লক্ষ মানুষের আনাগোনা। এমনি করে গড়ে ওঠে নগর, গড়ে ওঠে নব নব সভ্যতা কৃষ্টি ও সমাজ।

শীত-গ্রীষ্ম বর্ষা-হেমন্ত নানা ঋতুতে নানা বেশে দেখেছি তোমায়। শীতে তুমি হও সংকুচিতা, সংযত হয় তোমার উদ্দাম গতিবেগ। কুয়াশার স্বপ্ন-চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমাও তুমি সারা রাত। সূর্যোদয়ের অনেক পরে ভাঙে তোমার ঘুম, শুভ্র কুয়াশার আড়াল থেকে চাও তুমি বাহির পানে। তখন তোমার তাপসী মূর্তী। বর্ষার দুরন্ত আবেগে হাত বাড়িয়ে যা তুমি নিয়েছ, হিম-শীর্ণা পৌষে তা তুমি ফিরিয়ে দাও।

আসে নববসন্ত। ডাকে-কোকিল। শাখায় শাখায় দোল দিয়ে যায় দখিন হাওয়া। নব কিশলয়ে পল্লবিত হয়ে ওঠে তরুলতা। তখন তোমারও মনে লাগে রং; চোখে জাগে রঙিন খোয়াব। দুই তীরের বনভূমিতে চৈতালি ঘুর্ণি-হাওয়ার অশান্ত গতিবেগে তোমারও মন হয় উড়ুউড়ু চঞ্চল।

দৃপ্ত তেজে আসে বৈশাখ। আসে কাল-বৈশাখী দুরন্ত জলদস্যুর বেশে। সেদিন তুমিও হয়ে ওঠো ক্ষিপ্তা—তোমারও দেখি রণরঙ্গিনী বেশ। বৈশাখী ঝন্‌ঝা প্রচণ্ড বেগে এসে পড়ে যখন তোমার বুকে, নির্মম

হস্তে ভাঙতে থাকে তোমার দুই তীরের তাল-নারিকেল ও আম-কাঁঠালের বাগিচা, সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে যখন চলন্ত নৌকার মাঝিরা, তখন তুমিও হয়ে ওঠ দারুণ ক্রুদ্ধ। জেগে ওঠে তোমার ঘুমন্ত সেনাদল। বিপুল গর্জনে সমর-রঙ্গে তরঙ্গে-তরঙ্গে ধেয়ে চলে তারা সম্মুখের পানে। শুরু হয় মহাযুদ্ধ। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাড়িয়ে দাও তুমি তাকে তোমার দিক-সীমানা থেকে। কিন্তু সেই যুদ্ধে ভেঙে যায় কতো ঘরবাড়ি, ভেঙে যায় কতো তরুলতা, ডুবে যায় কতো নৌকা জাহাজ, মরে যায় কত লোক। তারপর প্রকৃতি যখন শান্ত হয়, তখন নিহত ও আহতদের প্রতি জানাও গভীর সমবেদনা, শান্ত হয় তোমার ক্রন্দন।

বর্ষায় হয়ে ওঠো তুমি পরিপূর্ণ-যৌবনা। সে-ই তোমার সাচ্চা চেহারা! ঊর্ধ্বে আকাশ-জোড়া কাজল মেঘের মায়া, দিনরজনী অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারার ঝরঝরানি গান; উত্তরে পর্বতমালার পঙ্কিল গৈরিক নিঃস্রাব, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে জোয়ার-ভাটার টান, মাঝখানে দুরন্ত পূবালি বাতাসের শন্‌শন শব্দ, সবার সঙ্গে যোগ দিয়ে সৃষ্টি করো তুমি এক অপরূপ দৃশ্য। তখন শুনতে পাও তুমি যেন কোন্ এক অসীমের আহ্বান। পৌষে দেখেছিলাম তোমার যে তাপসীর রূপ, শুনেছিলাম যে ত্যাগের বাউল সুর, আজ আর তা নেই। আজ শুনি তোমার কণ্ঠে মেঘমল্লারের রাগ; আকাশে বাতাসে বাজে মাদল, বাজে বাঁশি। দিকে দিকে সে কী বিপুল সমারোহ! কী ব্যাকুল চঞ্চলতা! বাংলার বুকে বসাও তখন তুমি তোমার মহোৎসব। মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, সবাইকে দাও তুমি দাওয়াত। সব জায়গাই করো তুমি দখল। বালুচরে যারা বেঁধেছিল কুটির, তীরে তীরে বেঁধেছিল যারা ঘর, মাঠে যারা বুনেছিল ধান-পাট, সবাইকে জানিয়ে দাও তোমার প্রয়োজনের তাগিদ, হুঁশিয়ার করে দাও সবাইকে সরে যেতে। তারপর শুরু হয় মাটি পানি ও হাওয়ার খেলা। কোথা থেকে দলে দলে আসে মেঘ, ঢালে বারিধারা, পর্বত পাঠায় তার এতদিনকার সঞ্চিত জলরাশি—সমুদ্রও পাঠায় তার জোয়ারের পানি। এতসব সম্মানিত অতিথিদের জায়গা দেবে তুমি কোথা থেকে? তোমার বিশাল বুক তাদের জন্য অতি ক্ষুদ্র। অধিকার করে নাও তাই তুমি দুই পাশের যতো আছে খালবিল ও মাঠ।

মানুষকেও বলো—ওগো মানুষ, তোমাদেরও রইলো দাওয়াত। প্রস্তুত হও, ঘাটে ঘাটে বাঁধো তরী, বাঁধো পাল; রচনা করো ভাটিয়ালী গান, বাঁধো দোতারা; আস্‌ছে দিন; অস্তরবির রাঙা আভায়, জোছনা রাতের স্নিগ্ধ মায়ায় টানতে হবে দাঁড়, ধরতে হবে হাল, তুলতে হবে পাল, আর গাইতে হবে ভাটিয়ালী সুরেব গান।

শুরু হয় আয়োজন। এতদিন যে বিশাল দিগন্ত-বিস্তৃত চর ছেড়ে দিয়েছিলে, আবার তা করে নাও তুমি জবর-দখল। পাড় ভাঙতে থাকো ঝুপ্‌ঝুপ্ দুমদুম শব্দে। এক একবার প্রয়োজন তোমার এত বেশী হয় যে, বহুদিনের গ্রাম ও শহর-গঞ্জও ভেঙে দিয়ে বাড়াও তোমার পরিসর। গাছ-পালা ঘরবাড়ি দালান-কোঠা কিছুই তুমি মানো না। অনিবার্য তোমার প্রয়োজনে—মানুষ-গরু, তরু-লতার সুখ-দুঃখের কথা আর বড় হয়ে জাগে না। দু'চার খানা নৌকা, কয়েকখানা ঘরবাড়ি যদিই বা ভেসে যায়, ক্ষতি কি! বৃহত্তর কল্যাণের জন্য ছোটখাটো ক্ষয়-ক্ষতি মেনে নিতে হয়, এই যেন তোমার যুক্তি।

এমনি মহিমময়ীর বেশে আমি তোমায় দেখি। তুমি আমাদের পূর্ব-পাকিস্তানের অন্যতম গৌরব। পর্বত পাইনি, সাগর পাইনি, দুঃখ নেই; পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, কর্ণফুলী—ইত্যাদি নদীসম্পদ লাভ করেছি, এও আমাদের কম সৌভাগ্য নয়। আমাদের বুকে বাজে যে উদার শান্তির বাণী, যে ভাঙা-গড়া, হাসি-কান্নার সুর, যে সংগ্রাম ও সমন্বয়ের মনোভাব, তোমার মধ্যেও দেখি সেই সুর ও সেই মনোভঙ্গি। পাকিস্তানের আদর্শের সঙ্গে তোমার আছে চমৎকার মিল। ভাঙাব দুর্জয় উন্মাদনা দিয়ে, নব সৃষ্টির উল্লাস দিয়ে, গতির ক্ষিপ্রতা দিয়ে, আবেগ দিয়ে, ছন্দ দিয়ে, সুর দিয়ে অনুপ্রাণিত করেছো তুমি পাকিস্তানের বীর সেনাবাহিনীকে। তুমি বুঝেছিলে—আমাদের মনের সঙ্গেই মিলবে তোমার সুর। আমরা মাটির বুকে বাসা বাঁধতে জানি। কঠিন মাটি চাষ করে সোনাব ফসল ফলাতে জানি, জলপথে নৌকা ও বড় বড় জাহাজ চালাতে জানি; ধরণীর সাথেও রাখি সংযোগ, আকাশের সাথেও করি মিতালি। এমনি দুঃসাহসী পূর্ণ মানুষই হতে হবে পদ্মার দুই তীরের অধিবাসীদের। বোধ হয় এই

কারণেই তোমাকে ধরতে হয়েছিল কীর্তিনাশার রূপ। কর্মবিমুখ ধনবিলাসী যারা বাঁধতে চেয়েছিল তোমার তীরে সুখের নীড়, তাদের তুমি তাই বুঝি পছন্দ করোনি, তাদের জায়গায় দেখছি আজ দুঃসাহসী কর্মঠ ও বলিষ্ঠ আর এক জাতির অধিকার। পদ্মার দুই তীরের এই অধিবাসীরা পদ্মাকে ভয় করেনা; পদ্মার ভাঙন ও তরঙ্গ-গর্জনকে অবহেলা করে তারা বাস করে তার দুই তীরে। ভেঙে যায় তাদের সাজানো ঘরবাড়ি, দুঃখ নেই। নূতন চরে গিয়ে নূতন করে বাঁধে তারা ঘর। দূর দেশান্তরে চলে যায় তারা নৌকা বেয়ে, তরঙ্গের মাথায় মাথায় দোলে তাদের শিশু-সন্তান। কখনো বা প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে, কখনো বা প্রকৃতিকে জয় করে টিকে থাকে তারা।

অনাদিকালের বিশ্বসৃষ্টির ভাঙাগড়ার জীবন্ত স্মৃতি পদ্মা। আমি তোমায় ভালোবাসি। ভাঙা ও গড়ার, সৃষ্টি ও ধ্বংসের তুমি এক সুন্দর প্রতীক। তোমার পানিতে পাই সৃষ্টির আদিম দিনের গন্ধ ও স্বাদ। জলের মধ্যে স্থলের জাগরণ এবং ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে নবনব দেশ-রচনার খেয়াল ও কৌতূহল আজও জেগে আছে তোমার সফেন ঢেউয়ের বুকে। বর্ষে বর্ষে তাই বুঝি তুমি এককূল ভাঙো, আর-এককূল গড়ো, আর জাগিয়ে তোলো নূতন নূতন চর। সৃষ্টির এই রহস্য ও প্রেরণা তোমার মধ্যে আছে বলেই তোমায় আমি আর সব নদীর চেয়ে বেশী করে ভালো-বাসি। শান্ত নদী চাই না; যে নদী ভাঙতেও জানে গড়তেও জানে, যার গতি আছে, ছন্দ আছে, সুর আছে, গান আছে---সমুদ্রের সাথে আকাশের সাথে মেঘের সাথে বাতাসের সাথে আছে যার চিরদিনের যোগ---আমরা চাই সেই নদী।

পদ্মা। তুমি আমাদের সেই নদী। দজলা ফোরাত ও নীলনদীর মতো তুমি আমাদের জাতীয় জীবনে চিরদিন জেগে থাকো--এই আমাদের কামনা।

নদী-পরিক্রমা

১৯৫৬

মহাশ্মশান কাব্য

'মহাশ্মশান কাব্য' কবি কায়কোবাদের শ্রেষ্ঠ রচনা। এত বড় দীর্ঘ কাব্য বাংলা সাহিত্যে আর নাই। ৭৯০ পৃষ্ঠায় এই বিরাট গ্রন্থ শেষ হয়েছে। আগাগোড়া অমিত্রাক্ষর পয়ার ছন্দে লেখা। মাঝে মাঝে সঙ্গীত ও নৃত্য-দোদুল ছন্দের দু'একটি হালকা রচনার দ্বারা এর একঘেঁয়েমি নষ্ট করার প্রয়াস রয়েছে। বাংলা ১৩১১ সালে এই কাব্যখানি প্রথম রচিত হয়।

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ভাবধারা কেমন করে বিবর্তিত হলো, আর আমরা কোথা থেকে কোথায় এলাম, সে সম্বন্ধে জানতে হলে 'মহাশ্মশান কাব্য' আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করবে। আমাদের জাতীয় জীবনে কাব্যখানি বিশেষ কোনো প্রেরণা যোগাতে না পারলেও, অথবা আজকের যুগমনে এর তেমন কোনো আবেদন না থাকলেও, এর একটা সাহিত্যমূল্য নিশ্চয়ই আছে। বিগত যুগে যেসব বাঙালী মুসলমান কবি-সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে টিকে থাকবার মতো কিছু মৌলিক দান দিয়ে গেছেন, তাঁদের মধ্যে কায়কোবাদ নিঃসন্দেহে অন্যতম। এ যুগের মুসলিম সাহিত্য-কর্ষণায় একমাত্র মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু' এবং কবি কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান কাব্য'ই উল্লেখযোগ্য সঞ্চয়। সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার স্পর্শ একমাত্র এ দুইখানি গ্রন্থেই আমরা দেখতে পাই। অবশ্য অন্যান্য আরও অনেক কবি ও সাহিত্যিকই অল্পবিস্তর কিছু দান করেছেন, কিন্তু তাঁদের সৃষ্টি কালজয়ী হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস।

'মহাশ্মশান' কাব্যখানি হাতে নিলেই সর্বপ্রথম যে বিস্ময় ও কৌতূহল মনে জাগে তা হচ্ছে এই: এত বড় একটা মহাকাব্য লিখবার মতো বিরাট মন যে কবির ছিল সে তো সাধারণ নয়। কবি যে তাঁর এই স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে পেরেছিলেন এটাই তো তাঁর প্রতিভার এক বড় পরিচয়। সৃষ্টির গভীর উল্লাস না থাকলে এত বড় কাব্যরচনা সম্ভব হতো না। তরল

হাসি-কান্না ও আলো-ছায়া মাখানো লিরিক কাব্যের যুগে একজন মুসলিম কবি যে নীরব রাত্রে একটা মহাকাব্য রচনার স্বপ্ন দেখেছিলেন, এ আমাদের পক্ষে সত্যিই এক গৌরবের কথা। এ-যুগের কবিরা কায়কোবাদের কাছে এইখানে প্রেরণা নিতে পারেন। কবির দানের বিচার যদি নাও করি, তবু তিনি যে একটা 'নূতন কিছু' দান করে গেছেন, এটাই তাঁর পক্ষে এক মহাসার্থকথা। সাহিত্যক্ষেত্রে 'মহাশ্মশান কাব্য' তাই বাংলার মুসলমানদের হাতের দেওয়া এক বিরাট অবদান।

কাব্যখানির আভ্যন্তরীণ সম্পদ সম্বন্ধে এইবার কিছু আলোচনা করা যাক।

মহাকাব্যের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকা চাই। আখ্যানবস্তুর চমৎকারিত্ব, ভাষার লালিত্য ও গাম্ভীর্য, ভাবের গভীরতা ও মৌলিকতা, মানব-জীবনের বিচিত্র রহস্য ও অনুভূতির প্রকাশ, উচ্চাঙ্গের কাব্যরসবোধ, সত্য ও সুন্দরের প্রকাশ এবং অতিমানবিক কোনো চরিত্রের অলৌকিক মহিমা---এ সবই হলো মহাকাব্যের লক্ষণ।

এই আলোকে বিচার করলে দেখা যাবে, 'মহাশ্মশান কাব্য' দোষ-ত্রুটি বর্জিত নয়। এমন কি একে মহাকাব্যের পর্যায়ভুক্ত করা যায় কিনা তাই সংশয়ের বিষয়। কেননা 'অতিমানবিক' (**Superhuman**) উপাদান এই কাব্যে অনুপস্থিত। কাজেই, আমার মতে মহাশ্মশানকে 'মহাকাব্য' না বলে 'বৃহৎ কাব্য' বলা সঙ্গত। মহাকাব্যের গোড়া থেকেই তার মূল প্লটটি অগ্রসর হবে। সেই সঙ্গে চারিদিক থেকে স্বপ্নের জাল বুনে কবি তাঁর আখ্যান বস্তুটিকে নিয়ে আসবেন একটা শেষ-পরিণতির দিকে। এমনি করেই রসঘন হয়ে উঠবে তাঁর কাব্য-কাহিনী। এই কাব্যে প্লটের সে মাধুর্য ও চমৎকারিত্ব নাই। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধকে আশ্রয় করেই কবি তাঁর এই কাব্যখানি রচনা করেছেন। কিন্তু এই যুদ্ধের পটভূমিতে তেমন কোনো ঐতিহাসিক রোমাঞ্চকর প্রেম-কাহিনী নেই। শুধু এক গভীর সৌন্দর্য এই আছে যে, আহমদ শাহ্ আবদালী এসে শেষ বারের মতো ভারতের হিন্দুশক্তিকে চুরমার করে দিয়ে গেলেন। একদিকে ৫০,০০০ হাজার মুসলিম সৈন্য, অপর দিকে ৩,০০,০০০ মারাঠা সৈন্য; কিন্তু ফলাফল হলো উল্টো। দুই লক্ষ মারাঠা সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রেই নিহত

হলো। বাদ বাকী বন্দী হলো অথবা পালিয়ে গেল। এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করে রসমূর্তিতে দাঁড় করাতে হলে যে কল্পনা-বিলাসের প্রয়োজন কায়কোবাদ ততোটা আকাশচারী ছিলেন না। কায়কোবাদ যে কাহিনী সাজিয়েছেন তা তেমন সুসংযত ও সুসম্বন্ধও নয়। কেন্দ্রীয় আখ্যান-বস্তুর সঙ্গে তার মিল অল্প। এই জন্যেই এতবড় কাব্যেব প্রধান চরিত্র অথবা প্রধান নায়িকা যে কে, তা আমরা খুঁজে পাই না। পুরুষদের মধ্যে কোনোই প্রধান চরিত্র নেই। নারীচরিত্রের ভিতর একমাত্র জোহরার নাম করা যায়, যার মধ্যে একটা আদর্শ, ঔজ্জ্বল্য ও কাব্য-সৌন্দর্য আছে। জোহরার স্বামী ইব্রাহীম প্রধান চরিত্র হতে পারেনা। কারণ তাকে নিয়ে মূল কাহিনী রচিত হয়নি। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহীম মুসলিম পক্ষ পরিত্যাগ করে মারাঠা পক্ষে যোগ দেয় এবং তাদের পক্ষে যুদ্ধ করে বহু মুসলিম সৈন্যের প্রাণহানি ঘটায়। জোহরা ইব্রাহীমকে মারাঠা পক্ষে যোগ না দিতে বার বার অনুরোধ করে; কিন্তু ইব্রাহীম সে কথায় আদৌ কর্ণপাত না ক'রে বিপক্ষ দলে যোগ দেয়। সেই থেকে জোহরাও পণ করে যে, স্বামীকে সে ফিরিয়ে আনবেই। ইব্রাহীমের একমাত্র যুক্তি: সে মারাঠাদের অধীনে চাকরী করে, তাই নিমক খেয়ে সে নিমকহারামী করতে পারে না। এই নীতির উপর নির্ভর করেই সে মারাঠাদের স্বপক্ষে প্রাণপণে যুদ্ধ করে এবং পরে মুসলিম হস্তে আহত অবস্থায় বন্দী হয়। জোহরাও পুরুষের ছদ্মবেশে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল এবং স্বামীর যাতে কোনো অমঙ্গল না হয় সেই চেষ্টা করছিল। অবশেষে উভয়েই সাক্ষাৎ হয় এবং স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জোহরাও তার পাশে প্রাণত্যাগ করে।

তা' হলে ইব্রাহীমের চরিত্রের বিশেষত্ব কি? মারাঠা মনিবের প্রতি বিশ্বস্ততা তাঁর চরিত্রের একটা উজ্জ্বল দিক সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্যদিক দিয়ে দেখলে দেখা যাবে স্বধর্ম ও স্বজাতিদ্রোহিতা দোষে সে চরিত্র নিতান্তই মসীমলিন। কোনো মহৎ আদর্শ দ্বারাও এই স্বজাতিদ্রোহিতা সমর্থিত হয় না; কাজেই এমন চরিত্র কোনো কাব্যের আদর্শ নায়ক হতে পারে না; মূল বিষয়বস্তুর সঙ্গে ইব্রাহীমের অথবা জোহরার তেমন কোনো সম্বন্ধও নেই। এরা বড়জোর দুটো পার্শ্ব-চরিত্র হতে পারে।

আশ্চার্যের বিষয়, পানিপথের রণাঙ্গনে যে দুইজনকে আমরা প্রধান ভূমিকায় দেখতে পাই, সেই আহমুদ শাহ্ আবদালী ও সদাশিবরাওকে কবি আদৌ কোনো প্রাধান্য দেননি। এমন কি, যে পানিপথের যুদ্ধই হলো এই কাব্যের বিষয়বস্তু, সেই পানিপথের প্রসঙ্গ কাব্যের প্রথম তিরিশ সর্গের ভিতরে কৃচিৎ দেখা যায়। হিরণ ও আতা খাঁর চরিত্রেও তেমন কোনো দীপ্তি নাই। তবে হিরণের চরিত্রের পবিত্রতা ও তেজস্বিতা উপভোগ্য, সন্দেহ নাই।

'মহাশ্মশান' কাব্য সম্বন্ধে কবির বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ—কোনো মুসলিম চরিত্রকেই তিনি উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়ে তোলেন নি। এই অভিযোগ মানি আর নাই মানি, অস্বীকার করা যায় না যে, কবির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার। তিনি কাকেও ছোট বা কাকেও বড় করে আঁকতে চাননি। এ সম্বন্ধে একটা কৈফিয়ত দিতে গিয়ে ভূমিকায় তিনি বলেছেন— "হিন্দুদিগকে কাপুরুষ সাজাইয়া ভীরুতার বর্ণে রঞ্জিত করিয়া মুসলমানদিগের কি লাভ? তাই হিন্দুদিগের বীরত্ব প্রদর্শন করিতে আমি কৃপণতা করি নাই। কম কে? উভয় জাতির বীরত্বই প্রশংসার্হ।" কবির এই উদার মনোভঙ্গী লক্ষ্যণীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু কথাটার অন্য দিকওতো আছে। হিন্দু-চরিত্র পাছে খাটো হয়ে যায়, এই ভয়ে কোনো মুসলিম চরিত্রকে বড় না করাও তো এক চরম হীনমন্যতা। উভয়ের চরিত্রই উজ্জ্বল করতে বাধা কি ছিল?

এই কাব্যের ভালো দিকও আছে। সহজপ্রকাশ গুণ কাব্যখানির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ঝরঝরে সাধু ভাষা সাবলীল গতিতে একটানা বয়ে চলেছে, তার মধ্যে কোথাও আড়ষ্টতা নেই। কাব্যখানি বাহুল্য-বর্জিত হলে আরও সুখপাঠ্য হতো। ইংরেজীতে একটা কথা আছে: **"Art lies not so much in retention as in rejection":** অর্থাৎ ধরে রাখার ভিতরে আর্ট নেই, বর্জনের ভিতরেই আর্ট। কতোটুকু ছাঁটাই করতে হবে তাই জানাই হলো শিল্পজ্ঞানের পরিচয়।

এসব সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান কাব্য' আমাদের সাহিত্যের একটি মূল্যবান সম্পদ।

এলান
১৯৫৬

আমি কেন লিখি ?

আমি কেন লিখি ?

· প্রশ্নটার জবাব দেওয়া কঠিন। সেই ১৯১৩ সালে আমি যখন Class X এ পড়ি—তখন থেকে এ-তক (হিসেব করে দেখুন কতো বছর হবে) লিখেই চলেছি। কিন্তু একদিনের তরেও প্রশ্নটা কেউ তো কোনোদিন করেনি, অথবা নিজেও ভাবিনি যে আমি কেন লিখি। পরিণত বয়সে এই প্রশ্নটা তাই আত্মদর্শনের সুযোগ দিল। জীবনের অতল গহনে তলিয়ে গিয়ে আজ এ প্রশ্নের জবাব আমাকে দিতে হবে।

একজন বিখ্যাত লেখককে এই প্রশ্নটাই করা হয়েছিল। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন : **"I write for myself"** (অর্থাৎ আমি আমার নিজের জন্যই লিখি।) কথাগুলির মধ্যে গভীর সত্য নিহিত রয়েছে। আমারও এই উত্তর —আমি আমার নিজের জন্য লিখি। সমাজ বা পাঠক আমার লেখা থেকে কতোটুকু আনন্দ পাবেন বা উপকৃত হবেন সে কথা ভেবে লিখি না, না লিখে থাকতে পারি না তাই লিখি। লেখার ভিতরে একটা সৃষ্টির উল্লাস আছে এবং আত্ম-প্রকাশের তাকিদ আছে। লিখলে আমি আনন্দ পাই এবং আমার কল্যাণ হয়—এইটেই হলো আমার লেখার মূল প্রেরণা। দেহের ক্ষুধার জন্য যেমন খাদ্য, আত্মার ক্ষুধার ও বিলাসের জন্য তেমনি লিখি। কোনো কিছু লেখার পূর্বে আমি যা থাকি, লেখার পরে আমি তার চেয়ে উন্নততর হই, অধিকরত জ্ঞানী হই ; সুমুখের পানে, অজানার সন্ধানে এক কদম এগিয়ে যাই। লেখার আগে আমার দৃষ্টিতে আমার ধ্যান-ধারণায় যা অস্পষ্ট থাকে, লেখার পরে তা মার্জিত ও পরিচ্ছন্ন হয়। কোথা হতে যেন একটা নূতন আলো এসে আমার অন্তর্লোককে উদ্ভাসিত করে দিয়ে যায়। আমার সব লেখাই তাই আত্মকেন্দ্রিক। আমাকে কেন্দ্র করেই নানা শাখা-প্রশাখায় আমার লেখা পল্লবিত হয়ে আছে। অন্য

কথায়, আমিই নানা ছন্দে নানা গানে বিকশিত হই। আমার আত্মা—আমার খুদীই হলো তাই আমার লেখার উৎস-মূল। আমার লেখার উদ্দেশ্য তাই যতোটা না সত্য-প্রকাশ, ততোটা আত্ম-প্রকাশ। আমার লেখায় তাই আমি প্রকাশিত হবো, নানা বৈচিত্র্য নানা রসে নানা ছন্দে নানা গানে আমি স্পন্দিত হবো, নিখিল মনে আমাকে নিয়ে জাগবে বিস্ময়, জাগবে কৌতূহল, জাগবে নব নব জিজ্ঞাসা—এই বিপুল আত্মচেতনা ও অহমিকা থেকেই আমার সব লেখা উৎসারিত হয়।

দেহের প্রয়োজনে ভাত খাই, আত্মার প্রয়োজনে লিখি।

নিজের জন্য প্রত্যেকেই লেখে। বড় বড় কবি-দার্শনিকরা নিজেকেই তো প্রকাশ করে গেছেন। শিল্প-সাহিত্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মূল্যই বেশি। বিশ্বমনের সমীকরণের মধ্যে কোনো চমৎকারিত্ব নাই। ব্যক্তিগতভাবে কে কেমন করে জীবন ও জগতকে দেখেছেন, সেইটে জানাই বড় কথা। কবি হাফিজের মনে কী রং লেগেছিল, চোখে কী স্বপ্ন নেমেছিল, মিলন ও বিরহকে কিভাবে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, সেই কথা জানতেই তো আনন্দ। তাঁর 'দিওয়ান' তো সেই জন্যই আমাদের ভালো লাগে। শেখ সাদী, ওমর খৈয়াম, রবীন্দ্রনাথ, ইকবাল প্রত্যেকের বেলাই এ-কথা খাটে। বস্তুতঃ বিশ্বসাহিত্য কেউ জোর করে লিখতে পারেনা। আত্ম-সাহিত্যই সত্য হলে বিশ্বসাহিত্যে রূপান্তরিত হয়।

কথাটা নিতান্ত স্বার্থপরের মতোই শোনাচ্ছে, না ? কিন্তু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, যতো খারাপ মনে হচ্ছে ততো নয়।

মানুষ সামাজিক জীব। তার দুটো জীবন: ব্যক্তি-জীবন আর সমাজ-জীবন। ঘরের কোণে তাকে যখন দেখি, তখন মনে হয় সে একা ; কিন্তু অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যাবে বিশ্ব-মানুষেরই সে একজন। কবির জীবন তাই ব্যক্তি-জীবনও বটে, সমষ্টি-জীবনও বটে। আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য হওয়া চাই, আমাদের ভিতরকার ঘুমিয়ে থাকা সেই বৃহত্তর সত্তাকে জাগিয়ে দেওয়া। কবি-সাহিত্যিকেরা ব্যক্তিকে অতিক্রম করে সমষ্টির মধ্যে পরিব্যপ্তি হন। সমগ্র মানব-সমাজ তার মধ্য দিয়ে কথা কয়, তার চোখ দিয়ে দেখে, তার মন দিয়ে ভাবে। অন্য কথায় কবি

শিল্পীরা সমাজ-মনের প্রতিনিধিত্ব করে। এক কবির লেখা পড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ আনন্দ পায়, তার অর্থ কি? তার অর্থ হলো: কবির কাব্যে নিখিল মনের ছায়া পড়ে---নিখিলের স্বপ্ন তাঁর চোখে ঘনিয়ে আসে।

কবি-সাহিত্যিকেরা যে নিজের লেখা জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করে, তার উদ্দেশ্য শুধু চিত্ত-বিনোদন বা প্রসংশা-অর্জন নয়। মানুষ যে-কোনো মূল্যবান সম্পদ তার কোনো নিরাপদ স্থানে সঞ্চয় করে রাখতে চায়। কবি যে-সম্পদ তার মানস-গহন থেকে উদ্ধার করে আনে, তা সে রাখবে কোথায়? নিজের মধ্যে ধরে রাখা সে নিরাপদ মনে করে না। জীবন শেষ হলে তার সম্পদও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাই সে খোঁজে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ কোনো স্থান বা স্থায়ী আশ্রয়। সেই আশ্রয় হচ্ছে মানব-সমাজ। তার লেখা জনসাধারণে প্রকাশ করে তাই সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

লেখকের সঙ্গে তাই সমাজের নিবিড় সম্বন্ধ আছে। সমাজের কথা তাকে ভাবতে হয়। লেখকের ভাব ও চিন্তাধারা যদি সমাজ-মনে সংক্রমিত না হয়, বা নিখিল বিশ্বে তার ঠাঁই না মেলে, তবে সেও মরে যায়, তার সৃষ্টিও মরে যায়। এই জন্যই তাকে সমাজ-সচেতন হতে হয়।

আমার লেখায় এই নীতিই আমি অনুসরণ করি। ব্যক্তি-সত্তাকে বর্জন করিনা, সমাজসত্তাকেও অস্বীকার করিনা। ব্যক্তিসত্তাকে ভালোবাসি বলেই সমাজসত্তাকে ভালোবাসি। কারণ সমাজ-চেতনা আত্ম-চেতনারই ব্যাপক রূপ।

এলান

১৯৫৬

ইসলামী সাহিত্য

বন্ধুগণ,

আমাকে ডাকা হয়েছে, 'ইসলামী সাহিত্য' সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্যে। ইসলামী সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে গোড়াতেই একথা খোলাসা হওয়া দরকার : ইসলামী সাহিত্যের সংজ্ঞা কী, প্রকৃতি কী এবং এর পরিসর কতোদূর।

অনেকেই বলেন : ইসলামী সাহিত্য হলো সেই সাহিত্য যাতে আল্লাহ্-রসুল, রোজা-নামাজ, মছলা-মছায়েল বা ইবাদৎ-বন্দিগীর কথা থাকবে, কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা থাকবে না বা প্রেমের কথাও থাকবে না (থাকলেও আগে নিকাহ্ পড়িয়ে দিতে হবে)! এ সাহিত্যের ভাষা ও আঙ্গিকও হবে ইসলামী কায়দায়। তবেই হবে সে ইসলামী সাহিত্য। এক কথায় : ইসলামী সাহিত্যকে হতে হবে রূপরসবর্জিত নিছক puritan মার্কা সাহিত্য— মিলন-বিরোধী এবং বাহিরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও অপাংক্তেয়।

কিন্তু আমি যদি বলি : ইসলামী সাহিত্য ঠিক এর উল্টা! অর্থাৎ বাইরের সাহিত্যেই রয়েছে সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা ও একদেশদর্শিতা, আর ইসলামী সাহিত্যেই রয়েছে বিশ্বজনীন উদারতা ও মানবতার আবেদন। ইসলাম নিজেই যখন মিলন ও সমন্বয়-প্রয়াসী, তখন ইসলামী সাহিত্য কেন হবে সংকীর্ণ ও অনুদার? ইসলামী কোনো জিনিসই তো সংকীর্ণ বা অনুদার নয়। দেশই হোক, জাতিই হোক, ধর্মই হোক, সংস্কৃতিই হোক, সমাজই হোক, শিল্পই হোক—ইসলাম সর্বত্রই মিলেছে ও মিলিয়েছে। খণ্ডতা ও ক্ষুদ্রতার স্বপ্ন যেখানেই ভিড় জমিয়েছে, সেখানেই প্রয়োজন হয়েছে ইসলামের। সকলের জন্য স্থান-সংকুলান করাই তো ইসলামের কাজ। নিজেও থাকবে, অপরকেও থাকতে দেবে, এই co-existence-ই হলো তার নীতি। ইসলামের সহনশীলতা অনন্যসাধারণ। পূর্ববর্তী 'কিতাব' সমূহকে সে স্বীকার করে, ভিন্নধর্মের পয়গম্বরদিগকে সে মানে। ইসলামের ধাতুগত অর্থই হলো আপোষ বা মিলন। দ্বন্দ্ব ও বৈষম্যের মধ্যে সে শোনায় মিলন বা সমন্বয়ের সুর। শুধু ধর্মে-ধর্মে নয়, ধর্ম ও কর্মের মধ্যেও সে ঘটিয়েছে

অপূর্ব মিলন। ইসলামে জাতিভেদ নাই। সাদা-কালো, বাদশা-ফকীর, কাফ্রী-ইরাণী, আফগানী-তুরানী, আরবী-হিন্দুস্থানী—সব এক করে দিয়ে বৃহত্তর মানবগোষ্ঠী সে রচনা করেছে। বিশ্বমানবতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের স্বপ্ন রয়েছে তার চোখে।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তার একই মনোভাব। ইসলামী কালচার শুধু আরবী কালচার নয়; সেমিটিক ও হেলেনিক কালচারের এ এক অপূর্ব সমন্বয়। অন্য কথায়ঃ সব কালচারের সঙ্গে ইসলাম করেছে মিতালি। প্রাচীন গ্রীক কালচার ধ্বংস হয়ে যেতো। ইসলামই তাকে বাঁচিয়েছে। ইসলাম যেপথ দিয়ে যেখানে গিয়েছে, সেখানেই সে স্থানীয় কৃষ্টি ও সভ্যতাকে আপন করে নিয়েছে। গেল সে স্পেনে, সেখানে সে রচনা করলো মুর-সভ্যতা। এলো সে পারস্যে; নিল সে দুহাতে ভরে যা-কিছু তার দরকার। এলো সে ভারতে। আর্য-সভ্যতার থেকেও সে বেছে নিল তার উপকরণ। গেল সে আফ্রিকায়; সেখানেও সে কাফ্রীদের হাতে হাত মিলালো। এমনি করে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যে সে ঘটালো অদ্ভুত এক সংযোগ ও সমন্বয়।

ইসলামের এই উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও মিলনের মনোবৃত্তি সবচেয়ে প্রকাশ পেয়েছে জ্ঞান-কর্ষণার ক্ষেত্রে। গ্রীকের প্লেটো ইসলামের আফলাতুন, তার সক্রেটিস আমাদের বোখরাত, অগ্নি-উপাসক ইরানবাসীর পেহ্‌লবী ভাষা এখন ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা। মওলানা রুমীর মসনবীকে বলা হয় ''পেহলবী ভাষার কুরআন''।

''মসনবী-এ মানবী-এ মৌলভী
হাস্ত্‌ কুরআঁ দর জবানে পেহ্‌লবী।''

এই ভাষাতেই লেখা হলো 'শাহানামা'—জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। কর্ডোভা, গ্রাণাডা, বাগদাদ, দিল্লী, আগরা, সর্বত্রই একই সুরঃ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান, বৈষম্যের মধ্যে মিলনের আহ্বান। ইসলামের কোথায় তবে সংকীর্ণ রূপ?

সঙ্গীতে ও শিল্পে দেখুন। পাক-ভারতের সঙ্গীতের কথাই ধরা যাক। ধ্রুপদের অচলায়তনে সে যখন ঢুকলো, তখন ধ্রুপদকে সে উচ্ছেদ করলো না; তার সঙ্গে মিতালি করে সে সৃষ্টি করলো আরও তিনটি শাখাঃ খেয়াল,

টপ্পা ও ঠুংরী। বর্তমানে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরী—এই চারটি মিলেই পাক-ভারতের ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীত। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এখন এগুলোকে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষা করে।

ইসলামের হাতেই সৃষ্টি হলো উর্দু ভাষা—যার উপকরণ নেওয়া হলো সব ভাষা থেকে আর যার দুয়ার রইলো সকলের জন্য খোলা।

স্থাপত্য-শিল্পেও 'তাজমহল' এই সমন্বয়ের মূর্ত প্রতীক।

দর্শনের দিক দিয়ে দেখলেও ইসলামকে দেখবেন মিলনধর্মী। দীন ও দুনিয়াকে, জড় ও চৈতন্যকে সে মিলিয়েছে। শুধু দর্শন নয়, রাষ্ট্র-দর্শনেও তার একই রূপ। বারো তের শত মাইল দূরবর্তী দুইটি ভূভাগ মিলিয়ে একটি রাষ্ট্র-রচনা করার নজির ইসলামেই আছে।

ইসলামে পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ নাই। ইসলামের কোন **frontier** বা সীমা-প্রাচীর নাই। তার **Supra-geographical** বা **supra-national** রূপ। ইংরাজ কবি যেখানে বলেছেন:

> **"The West is West, the East is East**
> **The twain shall never meet."**

ইসলামের কবি সেখানে গেয়েছেন:

> "চীন ও আরব হামারা হিন্দুস্তাঁ হামারা
> মুসলিম হ্যঁায় নাম্ ওতা হ্যঁায়, সারা জাহাঁ হামারা।"

এত জায়গায় ইসলাম উদার হতে পারলো, পারলো না কি তবে শুধু বাংলা সাহিত্যের বেলায়? 'ইসলামী সাহিত্য' বললেই কি সেখানে বুঝতে হবে অন্যরূপ? এই বাংলা ভাষাকে তো ইসলামই দিয়েছে মর্যাদার আসন। শব্দ দিয়ে, ভাব দিয়ে, গঠন দিয়ে এ ভাষার প্রাণ-প্রতিষ্ঠাই তো করেছে ইসলাম। বাংলা ভাষাকে কে আগে চিনতো? কে আগে স্বীকার করতো? সে তো অপাংক্তেয় হয়েই ছিল। ব্রাহ্মণেরা এ ভাষাকে অনার্য ভাষা বলে দস্যুর মতো ঘৃণা করেছেন। শুধু তাই নয়। যারা এ ভাষার চর্চা করবে, তাদের জন্য 'রৌরব' নামক নরকেরও ব্যবস্থা তাঁরা করেছিলেন। সেই অনাদৃত বাংলা ভাষাকে রূপ দিয়েছে ইসলাম। ইসলামকে বাদ দিলে বাংলা ভাষা

নেই। হিন্দু কবি-সাহিত্যিকদের সৃষ্টিতে বাংলা ভাষায় কোনো মানবীয় উপাদান ছিল না; শুধু দেবদেবীর মাহাত্ম্য ও লীলা-কীর্তনই ছিল এ ভাষার বিষয়-বস্তু। মুসলমানেরাই একে মানবধর্মী করেছে। মানুষের ব্যথা-বেদনা সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না দিয়ে দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে সহজবোধ্য করে এ ভাষাকে তারাই গড়ে তুলেছে। পাঠান ও মোগল আমলে ইসলামী বাংলা-ভাষা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলন ঘটিয়েছে। ভারতচন্দ্র রায়ের ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গি দেখলেও তা আপনারা বুঝতে পারবেন। শুধু তাই নয়। হিন্দু কবিরাও ইসলামী বিষয়বস্তু নিয়ে ইসলামী কায়দায় পুঁথি লেখা আরম্ভ করেছিলেন। উমাচরণ মিত্র ও প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের 'গোলে-বকাঅলি' ও রাধাচরণ গোপের 'জঙ্গনামা' তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

বাংলা গদ্য-সাহিত্যও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলন-সেতু রচনা কধেছে। নিম্নে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা দুই খানা পত্রের নকল উদ্ধৃত করছি। তা থেকেই বুঝবেন ভাষা তখন কিরূপ ছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা (১৬৭২)

"শ্রীজসোমাধব ঠাকুর কুমড়াল গ্রামে দেবালয়ত আছিলা। রামসর্মা ও গয়রহ সেবকেরা আপনার ২ ওয়াদা মাফিক সেবা করিতেছিল। রাত্রদিন চৌকী দিতেছিল। শ্রী রামজীবন মৌলিক সেবার সরবরাহ পুরুসানুক্রমে করিতেছেন। ইহার মধ্যে পরগণা পরগণাতে দেওতা ও মুরূত তোড়িবার আহাদে......থাকিয়া আর আর পরগণাতে দেওতা ও মুরূত তোড়িতে আসিল। ......তাহার পর ২৭ মহরম মাহে ২৮ জৈষ্ঠ ঠাকুর দেখিবার প্রাতেঃকালে সকল লোক গেল.....।

—শ্রীমনোমোহন ঘোষের 'বাংলা গদ্যের চার যুগ' (১১ পৃঃ)

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা (১৭৮৬)

"শ্রীযুক্ত ওলন্দেজ কোম্পানীতে আড়ঙ্গ বিরভূমের গঞ্জে খরিদের দাদনী আমি লইয়া ঢাকা আড়ঙ্গ চালানী করিয়াছি আপরেল মাহাতে এবং মোকাম মজকুরের গোমস্তা কাপড় খরিদ করিতেছিল এবং কাপড় কথক ২ আমদানী

হইয়াছে এবং হইতেছিল দাস্ত কথক ২ তৈয়ার হইয়াছে এবং মবলক কাপড় ধোবার হাতে দাশতর কারণ রহিয়াছে তাহাতে সংপ্রীতি মেঃ গেল সাহেবের তরফ পেয়াদা আসিয়া খামখা জবরদস্তী ও মারপিট করিয়া ঘাট হইতে ধোবা লোককে ধরিয়া লইয়া গেল আমার তরফ হইতে গোমস্তা পেয়াদা যাইয়া সাহেব মজকুরকে হাজির করিলো তাহা সাহেব গৌর না করিয়া আমার লোককে হাকাইয়া দিলেক এবং কহিলেক তোমরা আইয়াছ সাজাই দিব আমার কমবেষ 4000 চারি হাজার থান কাপড় ধোবার ঘাটে দাস্ত বেগর পচিতে লাগিল বহা সেওয়ায় কোরা কাপড় কাচীতে তইয়ার অতএব আরজ ইহার তদারক মেহেরবাণী করিয়া করিতে হুকুম হয়---।"

পত্রখানি ওলন্দাজ কোম্পানীর ডিরেক্টরের কাছে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে লেখা হরিমোহন বর্মার আরজি থেকে গৃহীত।

কিন্তু এর পরে বৃটিশ আমলের প্রারম্ভে শ্রীরামপুরের প্রাদ্রীরা কতিপয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে মিশে যে কাণ্ডটি করলেন, তাতেই তো দেখা দিল সংকীর্ণতা ও অনুদার মনোভাব। বাংলা ভাষা সেখানেই তো দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গেল। আরবী-ফার্সী শব্দ বর্জন করে তারা যে ভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টি করলেন, তা হলো একদম সংস্কৃত-ঘেঁষা, সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক। ইসলামের হাতে যতোদিন ছিল, ততোদিন তো বাংলা ভাষায় সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি গজায় নি। কিন্তু অনৈসলামিক যেই হলো, অমনি এলো বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির অভিশাপ। 'দুর্গেশ-নন্দিনী' 'আনন্দ-মঠ' ইত্যাদি ধরনের পুস্তক নিশ্চয়ই মুসলমানেরা লেখেনি বা ইসলামী আমলেও লেখা হয় নি। এই ভিন্ন-গোঠ রচনা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন তাঁর 'ইসলামী বাংলা সাহিত্যে' বলেছেন :

"১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ থেকে বাংলা দেশে শাসন কার্যে ফারসীর স্থান নিল বাংলা। সেই থেকে আরবী-ফারসী শব্দের আমদানি তো বন্ধ হলোই, উপরন্তু স্বল্প-পরিচিত আরবী-ফারসী শব্দের রপ্তানিও শুরু হলো। বাংলা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি হলো সংস্কৃত শিক্ষিতদের দ্বারা। এদিকে ফারসী-উর্দু জানা মুসলমান লেখকেরা পুরানো রাস্তা ধরেই চললেন। তার ফলে ইসলামী বাংলা সাধারণ সাহিত্যের ভাষা থেকে যেন দূরে সরে গেল।"

ঠিক তা নয়। একান্নভুক্ত ভাষা থেকে পণ্ডিতী ভাষাই জুদা হয়ে গেল।

এই পণ্ডিতদের সম্বন্ধেই ভাষাতত্ত্ববিদ্ গ্রীয়ারসন (Grierson) বলেছেন :

"Literary Bengali, as now known, is the product of the present (19th) century. Its direct cultivators were Calcutta Pandits who, however well-meaning, have ruined the language by their learning."

ঠিকই তো। পণ্ডিতী বাংলাই তো বাংলাভাষাকে ধ্বংস করেছে!

এই পণ্ডিতী ভাষা গণমানুষের কাছ থেকে এখন কতো দূরে সরে গেছে, তা আপনারা জানেন। বর্তমান বাংলা সাহিত্যের লেখ্য ভাষার সঙ্গে কথ্য ভাষার মিল নেই। এর ব্যাকরণও নিজস্ব নয়, সংস্কৃত ব্যাকরণ এর ঘাড়ে চাপান হয়েছে। আধুনিক বাংলা ভাষাকে তাই বলা যেতে পারে আভিজাত্যপূর্ণ বুর্জোয়া ভাষা। সাধারণ মানুষের সঙ্গে এর নাড়ীর যোগ নেই। ইসলাম-নিরপেক্ষ বাংলা-সাহিত্যের এই পরিণতি!

তা হলে দেখা যাচ্ছে : 'ইসলামী বাংলা-সাহিত্য' বললে সাধারণত যে গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতার ভাব মনে জাগে, আসলে তা মোটেই নয়। বরং তার উল্টা। মিলন, সমন্বয় ও ব্যাপকতা বুঝাতে কোনো কিছুর পূর্বে 'ইসলামী' বিশেষণ লাগানো যেতে পারে—সংকীর্ণতার জন্য নয়।

কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় ইসলাম এত উদার হওয়া সত্ত্বেও আমাদের অনেক কবি-সাহিত্যিক ইসলামের নাম শুনলেই আঁতকে ওঠেন। হাইড্রো-ফোবিয়া রোগের কথা আপনারা জানেন—যাকে বলে জলাতঙ্ক রোগ। সেই রকম আরেকটা রোগ আছে। তার নাম হচ্ছে 'logophoboea' অর্থাৎ শব্দাতঙ্করোগ। সেই শব্দটা হচ্ছে 'ইসলাম'। 'ইসলামের' নাম শুনলেই একদল লোক ক্ষেপে যান। কিন্তু প্রকৃতির প্রতিশোধ তাঁরা এড়াবেন কি করে? ইসলাম অলক্ষ্যে এসে তাঁদের ঘাড়ে চাপে। দেখা যাচ্ছে অতি-আধুনিক কবিরা তাঁদের কবিতায় আজকাল প্রায়ই 'এবং' শব্দ ব্যবহার

করছেন। সুধীন দত্ত এই পথ দেখিয়ে গেছেন। এর উৎস-মূল কোথায়? উৎস-মূল হচ্ছে কুরআন। কুরআনেই এই অভিনব কাব্য-ভঙ্গি বিদ্যমান।

বর্তমান মুক্তছন্দই বা কবিরা কোথা থেকে পেলেন? কুরআনই তো পথ দেখিয়েছে।

তারপর দুই দাঁড়ি (।।)। বাংলা কাব্যে, হেডিং-এ, নামে, যত্রতত্র আজকাল দুই দাঁড়ির বাড়াবাড়ি। এটা কোথা থেকে এলো? এটাও তো ইসলামি! যে কোনো পুঁথির কিতাব খুললেই আপনারা তা দেখতে পাবেন।

বস্তুত ইসলামী সাহিত্য অনুদারও নয়, সাম্প্রদায়িকও নয়। কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান---সর্বক্ষেত্রেই ইসলাম তার আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে আছে। ইসলামের জন্য খাস করে তো কোনো বিষয়বস্তু মার্কা-মারা নেই। দুহাত প্রসারিত করে রেখেছে ইসলাম। সবাইকে সে তার বুকে স্থান দিতে পারে আর তার সোনার কাঠির যাদুস্পর্শ পেলেই যে-কোনো বস্তু সুন্দর হয়ে সহজ হয়ে বৃহত্তর কল্যাণ রূপে দেখা দেয়। একদিকে তার যেমন কুরআন-হাদিস রয়েছে, অপর দিকে তেমনি আছে আলিফ্-লায়লা, শাহ্‌নামা, মসনবী, দিওয়ান, রুবাইয়াৎ, মুতাজেলা, দর্শন, আবু সিনা, আল-ফারাবী, আল-জাবের ইত্যাদির বিজ্ঞান-সাধনা, ইবনে খলদুনের ইতিহাস, ইবনে বতুতার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, নিজামীর রস-রচনা ইত্যাদি ইত্যাদি। বস্তুত ধর্ম, নীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, সাহিত্য, উপন্যাস, ভ্রমণ-কাহিনী, ইতিহাস, লোক-সঙ্গীত, পুঁথি-সাহিত্য, --সর্বত্রই রয়েছে ইসলামের অবাধ গতি ও অধিকার। বাকী ছিল আধুনিক বিজ্ঞান (space science)। সেখানেও দেখা যাচ্ছে: চৌদ্দশ বছর আগেই সবার অলক্ষ্যে সে ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে 'গ্রহতারার দেশে।

দায়ী কে?

এখন কথা হচ্ছে: ইসলামী সাহিত্যের এই বিকৃত অর্থ ও সংকীর্ণ ধারণার জন্য দায়ী কে? দায়ী প্রকৃত পক্ষে মুসলমানেরাই। মুসলমানেরা

ইসলামকে সংকীর্ণ করে রেখেছে। এর উদার পরমাশ্চর্য রূপ তাদের অনেকে নিজেরাও দেখেনি, অপরকেও দেখাতে পারেনি। বাইরের প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়ে ঘরের কোণায় এসে তারা মুখ লুকাচ্ছে। বিধর্মীরা আজ কুরআন থেকে ইংগিত ও প্রেরণা পেয়ে নব নব সৃষ্টি দিয়ে জগতকে স্তম্ভিত করে দিচ্ছে, অথচ মুসলমানেরা সেই মান্ধাতার আমলের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কুরআন পাঠ করছে। আমরা মিরাজকে শুধু আমাদের বিশ্বাসের বস্তু করেই রেখেছি, আমাদের কবিরা একে নিছক 'ইসলামী-সাহিত্যে' বলে স্পর্শ করে নি, অথচ এই মিরাজের কাব্যরূপে মুগ্ধ হয়েই ইতালির মহাকবি দান্তে '**Divine Comedy**' লিখে জগতে অমর হয়ে রইলেন। কাজেই আমাদের এই নির্বুদ্ধিতার জন্য অন্য কেউ দায়ী নয়—আমরাই দায়ী। আমাদের জানতে হবেঃ শুধু কুরআন-কিতাব বা পুঁথিপত্রই ইসলামী-সাহিত্য নয়। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, ভাবধারা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে-সাহিত্য রচিত হবে, তাই হবে ইসলামী সাহিত্য।

অনেকে বলেনঃ সাহিত্য সাহিত্য। সেখানে আবার ইসলামী সাহিত্য বলে স্বতন্ত্র গণ্ডী-কাটা কেন? কথাটা একদিক দিয়ে ঠিক। কিন্তু তাদের এই জিজ্ঞাসাই'ইসলামী সাহিত্যের' স্বপক্ষের যুক্তি। আজ বাংলা সাহিত্যে কেন ইসলামী বিভাগ খুলতে হয়। ইসলামী সাহিত্যের অভাব আছে বলেই তো এর প্রয়োজন? পশ্চিম-বঙ্গের বাংলা-সাহিত্যে 'হিন্দু বাংলা বিভাগের' নাম তো শুনি না। উর্দু-সাহিত্যেও 'ইসলামী উর্দু' বলে কোনো শাখা নেই। নেই এই জন্যে যে তাদের প্রয়োজন নেই। মাতৃভাষার কাজ হলো জাতির ধ্যান-ধারণা ও আশা-আকাংখার রূপ দেওয়া। পশ্চিম বঙ্গের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-কৃষ্টির পূর্ণ রূপায়ণ ঘটেছে। উর্দু সাহিত্যেও ইসলামী আদর্শে ও ধ্যান-ধারণায় ভরপুর। কাজেই তাদের বেলায় স্বতন্ত্র শাখার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের বাংলা ভাষা সম্বন্ধে সেকথা বলা যাবেনা। পাকিস্তান লাভ করা সত্বেও পশ্চিম বঙ্গের শক্তিশালী সাহিত্যের আওতায় আমরা এখনও আড়ষ্ট। নিজের পায়ে দাঁড়াবার মতো শক্তি আমরা এখনও অর্জন করি নি। খবরের কাগজে পূর্ব-পাকিস্তানের যে কোনো স্থানের 'সংস্কৃতি-সংবাদ' পড়লেই আপনারা একথার সত্যতা উপলব্ধি

করবেন। পূর্ব-পাকিস্তানে পশ্চিম বঙ্গের পুস্তকের চাহিদাও একথার সাক্ষ্য দেবে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রুচি-বিকৃতিও যে ঘটেছে, তাও বুঝা যাবে। এই কারণেই 'ইসলামী সাহিত্যের' দাবী এখনও আমাদের স্বীকার করতে হচ্ছে। সাহিত্যে একটা স্বতন্ত্র গণ্ডী কেটে রাখা নিশ্চয়ই আমাদের পক্ষে অক্ষমতা ও অগৌরবের পরিচয়। কিন্তু 'ইসলামী সাহিত্যের' লেবেল তুলে দিলেই এ অগৌরব ঘুচবে না। ইসলামী সাহিত্যের প্রাচুর্য দিয়েই ইসলামী সাহিত্যের দাবী মিটাতে হবে। অন্য কথায়ঃ ইসলামী সাহিত্যকে তুলতে হলে আরও বেশী করে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে।

ইসলামী সাহিত্যের রূপ

ইসলামী সাহিত্যের রূপ কেমন হবে, সে সম্বন্ধেও কিছুটা ধারণা আমাদের থাকা উচিত। এ সম্বন্ধে চিরদিন মতবিরোধ থাকবেই, আর আমার মতে থাকাই উচিত। কেউ বলবেনঃ ইসলামী বাংলা হতে হলেই তার পোষাকও ইসলামী হবে, অর্থাৎ আরবী-ফার্সি শব্দে তা ভরপুর থাকবে। কেউ বলবেনঃ আরবী-ফার্সি শব্দ থাকলেই কি ইসলামী হয়? আসল বস্তু হলো ভাব বা spirit. বিশুদ্ধ বাংলা ভাষাতেও ইসলামী সাহিত্য রচিত হতে পারে। কেউ বা আবার প্রশ্ন তুলবেনঃ যে-সাহিত্যে সত্য সুন্দর ও মঙ্গলের বাণী আছে, তা কি ইসলামী সাহিত্য নয়? গয়ের-ইসলামী বলে সে সাহিত্যে কি আমরা বর্জন করবো? প্রকৃতির রূপ-বর্ণনা, মানব-মনের সুখ-দুঃখের চিরন্তন চিত্র—এ সব কোন্ পর্যায়ে পড়বে? এই ধরনের বহু ইস্যু উত্থাপন করা যেতে পারে।

এই সমস্যাগুলির চূড়ান্ত জবাব কোনোদিনই কোনো সমালোচক যুক্তিতর্ক দ্বারা দিতে পারবেন না। সৃষ্টিধর্মী প্রতিভাই এর জবাব দেবে। কোন্ বস্তুকে যে কি ভাবে কাজে লাগানো যায়, বাইরে থেকে তা কেউ বলে দিতে পারে না। কলা-কুশলী শিল্পীর মন তা উদ্ভাবন করে। "ও মন, রমজানের ওই রোজার শেষে, এলো খুশির ঈদ"—এই গানের পূর্বে কেউ

কল্পনা করতে পারেনি যে বাংলা ভাষায় 'ইসলামী গান' সার্থকভাবে রচিত হতে পারে। কাজেই এ সম্বন্ধে কোনো নির্দেশ না দেওয়াই ভালো।

পক্ষান্তরে এমন অনেক কাব্য গান বা বিষয়বস্তু আছে যা **non-committal** অর্থাৎ তা ইসলামী কি নন-ইসলামী বুঝা যাবে না। এ সব ক্ষেত্রে এই নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে যে, ইসলামের মূল নীতি বা আদর্শের বিরোধী না হওয়া পর্যন্ত সব-কিছুই আমরা ইসলামের গণ্ডীর ভিতরে ধরে নেব। এতটা ব্যাপক বাউণ্ডারীর মধ্যেও কি সৃষ্টি সম্ভব হবে না?

বরিশাল সাহিত্য সম্মেলন
১৯৫৭

পাক-বাংলার কাব্য-সাহিত্য

বন্ধুগণ,

চট্টগ্রামের এই সাহিত্য-সম্মেলন পূর্ব-পাকিস্তানের তামদ্দুনিক সংগঠনের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বাইরের আকাশে বাতাসে যখন বিভ্রান্তি ও ব্যর্থতার সুর ধ্বনিত হচ্ছে, রাষ্ট্রে সমাজে সাহিত্যে শিল্পে নীতি ও আদর্শ যখন ম্লান হয়ে আসছে, সেই সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে আহ্বান এলো এই সম্মেলনের। অন্য কোনোখান থেকে নয়—চট্টগ্রাম থেকে। এর একটা তাৎপর্য আমি খুঁজে পেয়েছি। আমার মনে হয়, এইবার আমরা আমাদের তাহ্‌জিব-তমদ্দুনের উৎস-মূলে এসে পৌঁছেছি। এখন এই নগরী 'চট্টগ্রাম' নামে অভিহিত হচ্ছে বটে; কিন্তু এর আসল নাম তো চট্টগ্রাম নয়; আসল নাম হচ্ছে 'শাতিল্‌-গঙ্গ্‌'—যেমন আমরা পেয়েছি 'শাতিল্‌-আরব'। আরবদের দেওয়া এই নাম। আরবীতে 'শাৎ' মানে হচ্ছে **Delta.** শাতিল্‌-গঙ্গ্‌ বা শাতেগঙ্গ্‌ মানে তাই **Delta of the Ganges.** খৃষ্টের জন্মের অনেক পূর্ব থেকেই আরবেরা বাংলা দেশে বাণিজ্য করতে আসে। শাতেগঙ্গ্‌ই ছিল তখন তাদের প্রধান বাণিজ্য-বন্দর। বলা বাহুল্য 'গঙ্গ্‌' শব্দটি আর্য শব্দ নয়, অনার্য শব্দ। শাতিল্‌গঙ্গ্‌ যে আরবদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা **Chittagong District Gazetteer**-এও উল্লিখিত হয়েছে। কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করছি:

"Here I may also quote the note of Bernavilli on the origin of the word, Chittagong. He derives the name from the Arabic 'Shat' or delta (which he translates as the end or extremity and Ganga, the Ganges, explaining that it was a name given by the Arabs meaning the city at the mouth of the Ganges."

এই শাতিল্‌-গঙ্গ্‌-ই ধীরে ধীরে শাতেগঙ্গ্‌, চাটিগঙ্গ্‌, চাটগাঁ এবং ইউরোপীয়ানদের হাতে **Chittagong**-এ রূপান্তরিত হয়েছে। বস্তুতঃ খৃষ্টের জন্মের বহু পূর্ব থেকেই আরব সওদাগরেরা বাণিজ্যের খাতিরে

চট্টগ্রাম বন্দরে যাওয়া-আসা করতো। ঢাকার সোনার-গাঁ পর্যন্তও তারা আসত। সোনার-গাঁর মস্‌লিন্ তারা ইয়ামনের বাজারে নিয়ে বিক্রি করতো। সেখান থেকে ইউরোপীয় বণিকগণ রোম ও অন্যান্য স্থানে সেগুলি চালান দিত। এই আরবেরা যে সেমিটিক গোত্রের লোক এবং খৃষ্টের জন্মের ৪000 বৎসর পূর্বে তারা যে ব্যাবিলন ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিরাট সভ্যতা গড়ে তুলেছিল এবং তাদেরই এক শাখা যে পরবর্তীকালে বেলুচিস্তানের মধ্য দিয়ে পাঞ্জাব সিন্ধু এবং বাংলা দেশে এসে বসতি স্থাপন করেছিল, ঐতিহাসিক গবেষণা ও প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে সে কথা এখন সুস্পষ্ট হয়েছে। সম্ভবতঃ এরা ছিল দ্রাবিড় জাতি আর তাদের ভাষাই ছিল বাংলা ভাষার আদিম রূপ। ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় প্রমুখ আর্যভাবাপন্ন লেখকেরাও এ-কথা প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন। আধুনিক বাংলা-ভাষাতেও এমন অনেক শব্দ ও ক্রিয়ারীতি আমরা পাচ্ছি যা না সংস্কৃত না আরবী না ফার্সী না হিন্দী। সেই সব শব্দ ও বাক্য-ভঙ্গি আজও প্রাচীন দ্রাবিড়-ভাষার স্বাক্ষর বহন করছে। কড়া, ক্রান্তি, গণ্ডা, পণ, কুড়ি, হাঁড়িকুঁড়ি, খোকা-খুকি, মাছ-টাছ ইত্যাদি ধরনের শব্দ ও বাচনভঙ্গি দ্রাবিড় জাতীয়। বাংলা দেশের অধিকাংশ গ্রাম বা স্থানের নাম দ্রাবিড়দের দেওয়া। দামুকদিয়া, বিজুলিয়া, ঝিনাইদহ, শৈলকুপা, নাগিরাট, নোয়াখালী, কুমিল্লা, পাবনা, খোকসা, কুষ্টিয়া, খুলনা, যশব ইত্যাদি ধরনের অসংখ্য দ্রাবিড় নাম আজ পর্যন্ত বিদ্যমান আছে। অবশ্য এই সব দ্রাবিড় শব্দকে পরে বিকৃত করে সংস্কৃত রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। ডক্টর সুনীতি কুমার তা স্বীকার করেছেন। তাঁর উক্তি এখানে উদ্ধারযোগ্য :

"But it is a pity that generally there was an attempt to give these names a Sanskrit look... In the formation of these we find some words which are distinctly Dravidian. An investigation of place-names in Bengal, as in other parts of Aryan India, is sure to reveal the presence of non-Aryan speaker, mostly Dravidian, all over the land before the establishment of the Aryan tongue."

(quoted from Dr. Nihar Ranjan's 'Bangalir Itihas' : p. 62)

শুধু দ্রাবিড় নয়, বহু আরবী ফার্সী নামও বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। যেমনঃ---যসর থেকে যশোহর, নওগাঁ থেকে নবগ্রাম, বশিরহাট থেকে বসুর হাট, ইব্রাহিমপুর থেকে ব্রহ্মপুর, মনোয়ারপুর থেকে মনোহরপুর—ইত্যাদি।

যাই হোক। আমি এখানে কোনো ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করছি না। আমি শু_ এইটুকুই আপনাদেরকে দেখাতে চাই যে, বাংলা ভাষার বুনিয়াদ সম্বন্ধে এতদিন আমাদের মনে যে ধারণা ছিল, তা এখন উল্টে যাচ্ছে। বাংলা ভাষা গোড়াতে যে আর্ ভাষা ছিল না এই কথাই আমার প্রতিপাদ্য। আর এ-কথা শুধু আমিই বলছি না, বড় বড় ঐতিহাসিকদের এই মত। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ঐতিহাসিক মার্শম্যান তাঁর "বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত" গ্রন্থে লিখে গেছেন:

"অতি পুরাতন কালে বঙ্গদেশের কি অবস্থা ছিল তাহা নিশ্চয় করা অতি দুষ্কর; বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম কোন্ সময় চলিত হইতে লাগিল, তাহা জানা যায় না। যে মনুষ্যেরা প্রথমে এদেশে বাস করিয়াছিল, তাহারা হিন্দু ছিল না, কিন্তু পশ্চিম সীমায় পার্ব্বতীয় লোকদের তুল্য এক জাতি ছিল। আব যে-বঙ্গভাষা এখন চলিত আছে, তাহা কোন্ সময়ে উৎপন্ন হইল, ইহাও নিশ্চয় কবা আমাদের অসাধ্য। সংস্কৃত ও আরবী ও ফার্সী শব্দ ভিন্নও অন্য অন্য অনেক শব্দ সেই ভাষাতে চলিত আছে, তাহাতে অনুমান হয় অতি পূর্বকালে বঙ্গদেশ নিবাসি লোকেরা যে ভাষা ব্যবহার করিত, তাহার সংস্কৃতাদি ভাষার সহিত কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু সেই পুরাতন ভাষা এখন নষ্ট হইয়াছে।"

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন; "দ্রাবিড় জাতি বহুকাল পূর্বে ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাদের ভাষা অনার্য।... বাঙ্গালার বর্ত্তমান অধিবাসিগণের সহিত দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড় ভাষাভাষী অধিবাসীগণের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। ইহার প্রমাণ দ্রাবিড়-সাহিত্যে পাওয়া যায়।"—বাঙ্গালার ইতিহাস, ২০ পৃঃ।

পূর্ব-পাকিস্তানের কাব্য-আলোচনায় গোড়াতেই আমাদের তাই এই উপলব্ধি হওয়া বিশেষ প্রয়োজন যে, বাংলা ভাষা মূলতঃ দ্রাবিড় ভাষা, এবং যে হেতু দ্রাবিড়, সেই হেতু—সেমিটিক, কাজেই মুসলমানদেব ধ্যান-ধারণা ও

আদর্শ এ-ভাষার সঙ্গে কিছুটা অন্তর্বিজড়িত। বাংলা-লিপি ব্রাহ্মী-লিপি থেকে গৃহীত। আর এই ব্রাহ্মী-লিপি অশোকের পূর্বেই দক্ষিণ আরব থেকে ভারতে এসেছিল। ব্রাহ্মী লিপি (ইব্রাহিমী লিপি ?) আদিতে দক্ষিণ হতে বাম দিকে লেখা হতো। কালে কালে সেই লিপিই বঙ্গ লিপিতে রূপান্তরিত হয়েছে'' :

"The Brahmi script, the parent script of India, was borrowed from Semitic sources probably about the seventh century B. C."—(Rawlinson)

বাংলা ভাষা যে মূলতঃ সেমিটিক গোষ্ঠীর ভাষা এই উপলব্ধি আমাদের ভাষাগত বহু সমস্যা ও বিতণ্ডার অবসান ঘটাতে পারে। এই মত সুপ্রতিষ্ঠিত হলে বাংলা ভাষায় কেন এত আরবী শব্দ, কেন বাংলা দেশে এত মুসলমান, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালির বাচন ভঙ্গি কেন অত আরবী ঘেঁষা ইত্যাদি বহু কথারই সদুত্তর পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষাকে ব্রাহুই, পাঞ্জাবী, পশ্‌তু ও সিন্ধীর ন্যায় আমাদেরই স্বগোত্রীয় ভাষা বলে নিঃসঙ্কোচে আমরা গ্রহণ করতে পারি। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে 'চর্যাপদ' আবিষ্কার করে নিয়ে এলেন ; সেগুলোকে যদি বাংলা ভাষার আদিম রূপ বলে ধরা হয়, তবে এর থেকেই বুঝা যায়, বাংলাভাষার চর্চা আদিতে কারা করতো। অনেকের মতে বৌদ্ধরা আর্য ছিল না, তারা ছিল অনার্য (**Sakyans**) এবং হয়তো বা সেমিটিক গোত্র সম্ভূত কোনো মিশ্রজাতি। এই কারণেই তারা সেমিটিক বর্ণমালা (**Alphabet**) অনায়াসে গ্রহণ করতে পেরেছিল। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" পুস্তকের ভূমিকাতে লিখেছেন : "বৌদ্ধযুগে পালবংশীয় রাজাদিগের সময় হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রচার আরম্ভ হয়।" বস্তুতঃ ভাষার লেখন ও প্রচার ব্যাপারে বৌদ্ধরা তাদের ভাষা ও বর্ণজ্ঞান নিয়ে সিংহল আরাকান প্রভৃতি দেশে পালিয়ে যায়। সম্ভবতঃ তাদের একাংশ নেপালে গিয়েও আশ্রয় নিয়ে থাকবে। শুধু নেপাল নয়, তিব্বতেও আরবী ভাষায় বহু প্রাচীন হস্তলিপি পাওয়া গিয়েছে :

"Paper scraps with Arabic writing are occasionally found among old Tibetan & Sakyan rubbish"—(North India Antiquity)

এই সব ব্যাপার থেকেই বুঝা যায়—সেমিটিক সভ্যতার ধারা কি ভাবে কোন্ খাতে প্রবাহিত হয়েছে। আরাকানে কেন বা বাংলা ভাষার এত চর্চা হলো, কেন বা বহু মুসলমান কবি রোসাং রাজদরবারে আশ্রয় নিল, পার্শ্ববর্তী চট্টগ্রামেই কেন বা এত বাঙালী মুসলিম কবির আবির্ভাব হলো, এ সব কথা নূতন ভাবে বিচার করতে হবে।

বাংলা ভাষার প্রাচীন নিদর্শন যা পাওয়া যায়, তার মধ্যেও ভূরিভূরি আরবী শব্দের প্রচলন রয়েছে। সে কথা অন্যত্র বলেছি।

বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের বলিষ্ঠ রূপ গদ্য অপেক্ষা পদ্যেই বেশী প্রকাশ পেয়েছে। বাংলার সুলতানদের সময় থেকে আরম্ভ করে ইংরেজ আমলের প্রারম্ভ পর্যন্ত মুসলমান কবিরা নানাভাবে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন। বাংলা ভাষাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে নেওয়া এবং এই ভাষার মাধ্যমে নিজেদের জাতীয় ঐতিহ্য, ধ্যান ধারণা ও আশা-আকাঙ্খাকে রূপ দেওয়াই ছিল মুসলমানদিগের প্রধান লক্ষ্য। হিন্দু পণ্ডিতদের প্রভাবে বাংলাভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব পড়েছে বটে, কিন্তু তাতে মুসলমানগণ বিশেষ বিভ্রান্ত হন নি। যে যে বিষয়বস্তু নিয়ে তাঁরা কাব্য রচনা করে গেছেন তার একটা ফিরিস্তি নিলেই তা বুঝা যাবে। কাসাসুল আম্বিয়া, য়ুসুফ জোলেখা, আমির হামজা, জঙ্গনামা, শহীদে কারবালা, সয়ফল মুলক বদিউজজামাল, ফতুহশ্বাম, ফতুহল মিছর, ফতুহল ইরাক, খোলাসাতুল আম্বিয়া, রসুল বিজয়, সায়াৎ-নামা, গাজী-বিজয়, গাজী কালু, সোনাভান, নসিহৎ নামা, আযুব নবীর কথা, কেয়ামত নামা, খায়রল হাসার, গোলে বকাওলি, জয়নালের চৌতিশা, তাজকিরাত-উল-আওলিয়া, শাহনামা, সেকেন্দর নামা, ফাতিমার সুরতনামা, শরীয়ৎনামা, হাজার মসায়েল, হানিফা ও কয়রাপরী, হানিফার লড়াই, আলি ও বীর হনুমানের লড়াই ইত্যাদি অসংখ্য পুঁথি মুসলমানেরা লিখেছেন। বিখ্যাত বিখ্যাত আরবী ফারসী গ্রন্থের অনুবাদও তাঁরা বাংলাভাষায় করেছেন। ডক্টর আবদুল গফুর সিদ্দিকীর মতে মুসলমানদের পুঁথির সংখ্যা আনুমানিক ৫০,০০০ হাজার। এদের আরবী-ফারসী-মিশানো ভাষা দেখলে অবাক হতে হয়। এ এক নূতন সৃষ্টি। আর কিছুর জন্য না হোক, বাংলা ভাষাকে চমৎকার ইসলামী

রূপ যে তাঁরা দিতে পেরেছেন, এই কীর্তি তাঁদের অক্ষয় হয়ে থাকবে। আজ সংস্কৃত-মুখর বাংলা ভাষার শব্দঝঙ্কার ও বাক্য-বিন্যাস আমাদিগকে সম্মোহিত করে রেখেছে, নৈলে অন্য চোখ দিয়ে অন্য মন দিয়ে অন্য কান দিয়ে অন্য অনুভূতি দিয়ে দেখলে আমরা নিশ্চয়ই এদের ভাষার সহজ প্রকাশগুণ ও লালিত্যের প্রশংসা না করে থাকতে পারতাম না। একটা নমুনা দেখুন:—

"মেছের সহর হৈতে বাহির হইয়া
মকদ্দস পানে নবি জান নেকালিয়া
সামের সহর বিচে ফলগুন গ্রাম
তথা উতরিল যদি নবী নেক কাম
জিবরিল আসিয়া কহে শোন সমাচার,
দেখ হেথা জমিনেতে কেমন বাহার ॥"

—কাছাছোল আম্বিয়া।

"পহেলা ফকির সেই বিবির খাতির
ছালাম করিয়া হাল করেন জাহির।
শুন বিবি আঁখি মোর গেল কি কারণে
সে বয়ান করি আমি তোমার ছামনে।
কি কারণ ফকিরের ভেস হৈল মোর
শুন বিবি কহি কিছু সে সব খবর।।"

—আলেফ লায়লা।

"উজিরের পানে বাদসা আঁখি ঘুমাইল
দেলেতে হইল গোশ্বা কিছু না কহিল
উজির কহিল বাদসা আমি সব জানি
আমিরের বেটা এই ওম্মর ইউনানি।
নওসেরওয়া বলে ঝুট হবে এই বাত
আমির কারার করে সাহাজাদি সাত।"

—আমির হামজা।

"শুন যত বেরাদার, কহি কিছু সমাচার,
শুন সবে আগামি কালাম।
রূমের সহর বিচে কুস্তনতুনিয়া দেশে
এস্তাম্বুল বলে যার নাম।।"

—চাহার দরবেশ।

"কহে এই লাড়কা যবে হইবে সিয়ানা
দেখিয়া পরীর তরে হইবে দেওয়ানা
সেই গমে ছাএর করিবে দেশে দেশে।
দুঃখ পাবে সুখ তাতে হইবেক শেষে।"

—মোহাম্মদ খাতের, মৃগাবতী

এই ভাষাতেই মুসলমান কবিরা কাব্য লিখে গেছেন।

অবশ্য হিন্দু কবিরা বাংলা ভাষাকে একটা সংস্কৃত রূপ দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। দৌলত কাজী, আলাওল প্রমুখ অনেক মুসলমান কবিও তাঁদের অনুকরণে সাধু-বাংলায় কাব্য রচনা করেছিলেন। আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্য তার চূড়ান্ত নিদর্শন। কিন্তু এ কথা অনায়াসে বলা যায় যে, এটা ছিল শুধু একটা ব্যতিক্রম, নিয়ম নয়। সংস্কৃত ঘেঁষা সাধু বাংলা যে মুসলমান সমাজে কোনো কালেই আদৃত হয়নি, তার প্রমাণ ছহি চাহার দরবেশ পুঁথিতে। মরহুম মোহাম্মদ দানেস তাঁর কিতাবের ভূমিকাতে বলেছেন ঃ

"চলিত বাংলায় কেচ্ছা করিব তৈয়ার
সকলে বুঝিবে ভাই কারণে ইহার।
আসল বাংলা সবে বুঝিতে না পারে
এ-খাতিরে না লিখিলাম শুন বেরাদারে।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত মুসলমানেরা এই "চলিত বাংলা" জবানেই কাব্য রচনা করে গেছেন। তাদের গতি ভীষণভাবে বাধা পেল—যখন শ্রীরামপুরের মিশনারীরা হিন্দু পণ্ডিতদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বাংলা ভাষাকে দ্বিধাবিভক্ত করে দিল। এর আগে পর্যন্ত আরবী-ফারসী-মিশানো ভাষাই ছিল সত্যিকার বাংলা ভাষা। এই চলতি ভাষা হিন্দুদের

মনও জয় করতে পেরেছিল। অনেক হিন্দু কবিও মুসলমানি কায়দায় পুঁথি লিখে গেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়—রাধাচরণ গোপের কথা। ইনি 'ইমামএনের কেচ্ছা' নামক একখানি পুঁথি লেখেন। পুঁথির লিপিকাল ১৮২৭। রচনার নমুনা দেখুন:

"আল্লা আল্লা বল পাক পরওয়ারদিগার
আখেরে দোজখে ডালি- - - যার
দোজখ তরিতে বান্দা করহ ফিকির
জাহিরে বাতুনে লইলাম আল্লার জিকির।
আল্লার আরশ-কোর্সে কিছু মেহেরবানি চাই।
ইমামএনের কেচ্ছা কিছু মিলাইয়া গাই।
শ্রীযুক্ত ছাহেবের কেচ্ছা রাধাচরণ গাএ
আল্লা আল্লা বল নবী পঞ্জতনের পাএ।"

এর থেকেই আপনারা বুঝতে পারবেন—বাংলা ভাষায় মুসলমানেরা কতোদূর আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এমন কি বাংলা হরফকে সরিয়ে তারা আরবী হরফে বাংলা লেখা শুরু করেছিল। আরবী হরফে বাংলা পুঁথি এখনও বিদ্যমান। এই গৌরবোজ্জ্বল পরিস্থিতি থেকে মুসলমানেরা কি ভাবে স্থানচ্যুত হলো, তা জানতে পারবেন আপনারা শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাশের 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস' থেকে। তিনি বলছেন:

"১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হালহেড এবং পরবর্তীকালে হেনরি গিটস্ ফরষ্টার ও উইলিয়াম কেরী বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত জননীর সন্তান ধরিয়া আরবী পারসীর অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে রীতিমত ওকালতি করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে এই তিন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতের যত্ন ও চেষ্টায় অতি অল্প দিনের মধ্যে বাংলা ভাষা সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। ১৭৭৮ খৃঃ এই আরবী-পারসী-নিঃসূদন-যজ্ঞের সূত্রপাত এবং ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে আইনের সাহায্যে কোম্পানীর সুদূর মফস্বল আদালতসমূহে আরবী-পারসীর পরিবর্তে বাংলা ও ইংরাজীর প্রবর্তনে এই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি।"

...পাদ্রীদের সঙ্গে মিলেছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাম নাথ বিদ্যা-বাচস্পতি, রামরাম বসু এবং আরো অনেকে।

আমরা কী ছিলাম এবং কী হয়েছি, আশা করি এর থেকেই তা আপনারা বুঝতে পারবেন। আমরা ভবিষ্যতে কী হবো বা কোথায় যাবো-তার হদিসও এর থেকেই পাওয়া যাবে। আমাদের যাবতীয় তামদ্দুনিক পুনর্গঠন এই আলোকে এই পরিপ্রেক্ষিতে করতে হবে।

এইবার কাব্য-আলোচনায় আসা যাক:

কাব্যের প্রকৃতি

কাব্য সম্বন্ধে বলতে চেয়ে বিপদে পড়েছি। কাব্য বুঝি, কিন্তু বুঝাতে পারি না। একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ঠিক এই কথাই বলেছেন: **"If not asked I know, if you ask me I know not."** রবীন্দ্রনাথও অন্য ভাবে ঠিক একই কথা বলেছেন: "বোঝবার বেলায় মা-লক্ষ্মী যতো সহজ বোঝাবার বেলায় ততো নয়।" বস্তুতঃ রসের কথাই এই। রসকে বোঝানো যায় না। বহু মনীষী বহু ভাবে কাব্যকে বুঝাতে চেয়েছেন; কিন্তু তবু যেন কোনো ব্যাখ্যাতেই মন ভরে না। **Methew Aronld** বলেছেন: **"Poetry is criticism of life."** **Edgar Alan Poe** বলেন, **"It is the breath and finer spirit of all knowledge."** **Plato** বলেন: **"Interpreter of Divinty."** **Aristotle** বলেছেন, কাব্য হচ্ছে **"authentic tidings of invisible things,"** **Dante** বলেন: **"Divine phantom of reality."**

সংজ্ঞাগুলোর কোনোটাই মিথ্যা নয়, অথচ একটাও পূর্ণাঙ্গ সত্য নয়। একই সত্যের বিভিন্ন দিক বিভিন্ন জন দেখেছেন—যিনি যেরূপ দেখেছেন সেই রূপই বর্ণনা করেছেন। সব চোখ মিলিয়ে দেখলে হয়তো পূর্ণ সত্য পাওয়া যেতে পারে।

মুসলিম কাব্যের রূপ ও প্রকৃতি

আমরা এখন পাকিস্তান পেয়েছি। স্বতন্ত্র জাতিত্ব এবং স্বতন্ত্র তাহ্‌জিব-তমদ্দুনের দাবীই এর ভিত্তিমূল। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্যে ভয় পাবার কিছু নেই। ধর্মে, সাহিত্যে, রাজনীতিতে মুসলমানেরা স্বতন্ত্র হয়েছে বলেই জগতে বহু কল্যাণের পথ খুলে গেছে। বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র পথ নিলেও অনেক

নূতনত্ব ও বৈশিষ্ট্য আসবে। ইসলাম অচলায়তন সৃষ্টির বিরোধী। তার মধ্যে আছে সৃষ্টির উল্লাস, মুক্তির আনন্দ, অসীমের ইংগিত ও অনির্বচনীয়ের ছাপ। এইখানে আমাদের কাব্য-সাহিত্যে ইসলামের প্রয়োজন রয়েছে। ইসলামের স্পর্শ পেলে প্রেম 'তাজমহলে' রূপান্তরিত হয়। জয়পুর, যোধপুর তুরস্ক, ইরাণ—সব যায়গা থেকে সে উপকরণ সংগ্রহ করে বটে; কিন্তু সমস্ত মিলিয়ে যে মর্মরস্বপ্ন সৃষ্টি হয়, তার অন্তরে থাকে মমতাজ, বাইরে থাকে শাহ-জাহান। মানব-মনের যা-কিছু অনুভূতি, তা যখন সত্য সুন্দর ও কল্যাণলোকে পৌঁছে যায়, তখন তার গায়ে আর কোনো সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ থাকে না—তার আবেদন তখন বিশ্বজনীন হয়। আমাদের শিল্পসাহিত্যও একই নীতিতে রচিত হবে।

পাকিস্তান যুগের মুসলিম-কাব্য

উপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বাংলার মুসলমানেরা একটা Superiority Complex নিয়েই বাংলা ভাষার সেবা করে এসেছে। অথচ তাদের মধ্যে কোনো অনুদারতা বা aggressiveness ছিল না। স্বকীয়তা বজায় রেখে হিন্দুদের সঙ্গে মিলে মিশেই তাঁরা সাহিত্যকর্ম করে গেছেন। এইটেই ছিল স্বাভাবিক। মুসলমানের কথা মুসলমানকেই বলতে হবে, হিন্দুর কথা হিন্দুকেই বলতে হবে। একে সাম্প্রদায়িকতা বলা অন্যায়। এতে সাহিত্য বরং পরিপুষ্টিই লাভ করে। মুসলমানেরা নীতি হিসাবে তাই এই তামদ্দুনিক সহনশীলতা গ্রহণ করেছিল। হিন্দুর রামায়ণ, মহাভারত তাই এত সহজেই মুসলিম সুলতানদের দ্বারা অনুদিত হতে পেরেছিল।

এবার আমাদের সাধনার মূলমন্ত্র হবে পাকিস্তানবাদ। পূর্বেই বলেছি: এ-কোনো নূতন মতবাদ নয়। সাহিত্যে আমরা আমাদের বৈশিষ্ট্য ফুটাবো—আমাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ও আশা-আকাঙ্খাকে রূপ দেব—এতে আবার ভাববার কি আছে? বরং বিপরীত কিছু চিন্তা করাই হবে অস্বাভাবিক। কঠিন পথে আজ আমাদের পা বাড়াতে হবে। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে—

কি কাব্যে, কি দর্শনে, বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশই হচ্ছে জীবনের ধর্ম। ইকবাল ঠিকই বলেছেন :

"Come, I shall tell you the difference
between a freeman and a slave
The freeman creates, the slave imitates."

নিতান্ত দুঃখের বিষয়, আমাদের কাব্য বহুলাংশে ব্যর্থ পরানুকরণ-প্রিয়তার দ্বারা বিড়ম্বিত হচ্ছে। আমাদের কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই প্রতিভাদীপ্ত; কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকেই এখনও আত্মস্থ হননি। আত্মদর্শন বা আত্ম-পরিচয় তাঁদের আজ সব চেয়ে বড় প্রয়োজন। আমি যা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তাতে এইটুকুই জেনেছি যে, সার্থক স্বষ্টি আপন ঘরেই সম্ভব। অনুভূতির বিশ্বস্ততাই (Sincerity of feeling) হচ্ছে সমস্ত স্বষ্টির প্রাণ। এখানে মুনাফিকি করলে প্রকৃতি তার শোধ নেবে।

না বলে পারছি না যে পূর্ব-পাকিস্তানের বুকে দাঁড়িয়ে আমাদের অনেকেই চেয়ে আছেন পশ্চিম বঙ্গের দিকে। পদ্মাতীরের ভাষার মধ্যে তাঁরা কোনো কাব্যসৌন্দর্য দেখেন না, যতো সৌন্দর্য সব পুঞ্জীভূত হয়ে আছে যেন ভাগীরথীর দুই তীরে। শুধু কবি-সাহিত্যিক নয়, পাঠকদেরও এই রোগে ধরেছে। কোলকাতার বই হলেই ব্যস্, আর কোনো কথা নেই। সব ভালো। এই মনোভাবের কিছুটা যে সঙ্গত কারণ নেই, তা আমি বলছি না। উন্নত রুচিজ্ঞান ও আলোর পিয়াসা মানুষ চাপা দিয়ে রাখতে পারে না। পশ্চিম বঙ্গের অনেক পুস্তকই বিষয়-গৌরবে ও পারিপাট্যে আকর্ষণীয়। কিন্তু সেটাও যেমন সত্যি, আমাদের মনোবিকৃতিও ঠিক তেমনি সত্যি। তুলনায় ভালো না হলেও আমাদের ঘরের জিনিসের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। শিল্পই হোক, সাহিত্যই হোক, সংগঠন যুগে **tariff** বা সংরক্ষণীয় কোনো একটা আশ্রয় দিয়ে স্বদেশী শিল্পকে রক্ষা করতে হয়। জগতের সমস্ত জাতিই এমনি করে বড় হয়েছে।

নূতনত্ব ও বৈশিষ্ট্য আসবে। ইসলাম অচলায়তন সৃষ্টির বিরোধী। তার মধ্যে আছে সৃষ্টির উল্লাস, মুক্তির আনন্দ, অসীমের ইংগিত ও অনির্বচনীয়ের ছাপ। এইখানে আমাদের কাব্য-সাহিত্যে ইসলামের প্রয়োজন রয়েছে। ইসলামের স্পর্শ পেলে প্রেম 'তাজমহলে' রূপান্তরিত হয়। জয়পুর, যোধপুর তুরস্ক, ইরাণ—সব যায়গা থেকে সে উপকরণ সংগ্রহ করে বটে; কিন্তু সমস্ত মিলিয়ে যে মর্মরস্বপ্ন সৃষ্টি হয়, তার অন্তরে থাকে মমতাজ, বাইরে থাকে শাহ-জাহান। মানব-মনের যা-কিছু অনুভূতি, তা যখন সত্য সুন্দর ও কল্যাণলোকে পৌঁছে যায়, তখন তার গায়ে আর কোনো সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ থাকে না—তার আবেদন তখন বিশ্বজনীন হয়। আমাদের শিল্পসাহিত্যও একই নীতিতে রচিত হবে।

পাকিস্তান যুগের মুসলিম-কাব্য

উপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বাংলার মুসলমানেরা একটা **Superiority Complex** নিয়েই বাংলা ভাষার সেবা করে এসেছে। অথচ তাদের মধ্যে কোনো অনুদারতা বা **aggressiveness** ছিল না। স্বকীয়তা বজায় রেখে হিন্দুদের সঙ্গে মিলে মিশেই তাঁরা সাহিত্যকর্ম করে গেছেন। এইটেই ছিল স্বাভাবিক। মুসলমানের কথা মুসলমানকেই বলতে হবে, হিন্দুর কথা হিন্দুকেই বলতে হবে। একে সাম্প্রদায়িকতা বলা অন্যায়। এতে সাহিত্য বরং পরিপুষ্টিই লাভ করে। মুসলমানেরা নীতি হিসাবে তাই এই তামদ্দুনিক সহনশীলতা গ্রহণ করেছিল। হিন্দুর রামায়ণ, মহাভারত তাই এত সহজেই মুসলিম সুলতানদের দ্বারা অনুদিত হতে পেরেছিল।

এবার আমাদের সাধনার মূলমন্ত্র হবে পাকিস্তানবাদ। পূর্বেই বলেছি: এ-কোনো নূতন মতবাদ নয়। সাহিত্যে আমরা আমাদের বৈশিষ্ট্য ফুটাবো—আমাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ও আশা-আকাঙ্খাকে রূপ দেব—এতে আবার ভাববার কি আছে? বরং বিপরীত কিছু চিন্তা করাই হবে অস্বাভাবিক। কঠিন পথে আজ আমাদের পা বাড়াতে হবে। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে—

কি কাব্যে, কি দর্শনে, বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশই হচ্ছে জীবনের ধর্ম। ইকবাল ঠিকই বলেছেন :

"Come, I shall tell you the difference
between a freeman and a slave
The freeman creates, the slave imitates."

নিতান্ত দুঃখের বিষয়, আমাদের কাব্য বহুলাংশে ব্যর্থ পরানুকরণ-প্রিয়তার দ্বারা বিড়ম্বিত হচ্ছে। আমাদের কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই প্রতিভাদীপ্ত; কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকেই এখনও আত্মস্থ হননি। আত্মদর্শন বা আত্ম-পরিচয় তাঁদের আজ সব চেয়ে বড় প্রয়োজন। আমি যা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তাতে এইটুকুই জেনেছি যে, সার্থক সৃষ্টি আপন ঘরেই সম্ভব। অনুভূতির বিশ্বস্ততাই (Sincerity of feeling) হচ্ছে সমস্ত সৃষ্টির প্রাণ। এখানে মুনাফিকি করলে প্রকৃতি তার শোধ নেবে।

না বলে পারছি না যে পূর্ব-পাকিস্তানের বুকে দাঁড়িয়ে আমাদের অনেকেই চেয়ে আছেন পশ্চিম বঙ্গের দিকে। পদ্মাতীরের ভাষার মধ্যে তাঁরা কোনো কাব্যসৌন্দর্য দেখেন না, যতো সৌন্দর্য সব পুঞ্জীভূত হয়ে আছে যেন ভাগীরথীর দুই তীরে। শুধু কবি-সাহিত্যিক নয়, পাঠকদেরও এই রোগে ধরেছে। কোলকাতার বই হলেই ব্যস্, আর কোনো কথা নেই। সব ভালো। এই মনোভাবের কিছুটা যে সঙ্গত কারণ নেই, তা আমি বলছি না। উন্নত রুচিজ্ঞান ও আলোর পিয়াসা মানুষ চাপা দিয়ে রাখতে পারে না। পশ্চিম বঙ্গের অনেক পুস্তকই বিষয়-গৌরবে ও পারিপাট্যে আকর্ষণীয়। কিন্তু সেটাও যেমন সত্যি, আমাদের মনোবিকৃতিও ঠিক তেমনি সত্যি। তুলনায় ভালো না হলেও আমাদের ঘরের জিনিসের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। শিল্পই হোক, সাহিত্যই হোক, সংগঠন যুগে tariff বা সংরক্ষণীয় কোনো একটা আশ্রয় দিয়ে স্বদেশী শিল্পকে রক্ষা করতে হয়। জগতের সমস্ত জাতিই এমনি করে বড় হয়েছে।

পাকিস্তান-যুগের পূর্বের কথা বলবো না। পরের কথাই বলবো।

এখানে একাধিক প্রতিশ্রুতিপূর্ণ তরুণ কবির আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু আমি তাদের নাম ধরে ডাকবো না। নীরবে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবো।

একটা বিষয়ের প্রতি আমাদের কবিদের দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করতে চাই। আমাদের সমাজ-জীবনের চিত্র তাঁরা আঁকছেন কই? তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না তাঁদের কাব্যে রূপায়িত হচ্ছে কই? শুধু ঈদের সময় এলেই আমাদের কবিরা একটা বিশেষ ইজমের তাড়নায় সর্বহারাদের দরদে ফেটে পড়েন এবং কতকগুলি কড়া কথা শুনিয়ে দেন। দুর্ভিক্ষ এলে তার করুণ মর্মন্তুদ দৃশ্য তাঁরা আঁকেন। কিন্তু এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে মানুষ যে কেমন করে মৃত্যুকে জয় করতে পারে, সামাজিক অসাম্য থাকা সত্ত্বেও বৃহত্তর মানবতার আহ্বানে কেমন সুন্দর বুকে বুকে মিলতে পারে—সে চিত্র তাঁরা আঁকেন না। পাকিস্তানে নূতন অনাবাদী জমি পড়ে ছিল, যে সব কবি এ-পারে এসেছেন, তাঁরা ইচ্ছা করলে সোনার ফসল ফলাতে পারতেন। কিন্তু আত্ম-অবিশ্বাস এবং পরানুকরণের মোহে তাঁরা কিছুই করতে পারছেন না। আধুনিক কাব্যে আজ যে সুরটি ধ্বনিত হচ্ছে, সে হচ্ছে ঐতিহ্যভিত্তিক। জাতির যে সব **tradition** ও পৌরাণিক কাহিনী আছে, তাদের ছুঁয়ে-যাওয়া একটা স্বপ্ন বা রোমান্স সৃষ্টিই আধুনিক কাব্যের বৈশিষ্ট্য। সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ ও আরও কেউ কেউ এই আঙ্গিকে কবিতা লিখেছেন। অনেক কবিতা তাঁদের সার্থকও হয়েছে। পূর্ব-পাকিস্তানের কবিরা বিশেষ করে জীবনানন্দ দাশের অনুকরণে তৎপর। কিন্তু তাঁদের সৃষ্টিতে এখন পর্যন্ত কোনো মৌলিকতা বা বৈশিষ্ট্য আসেনি। জীবনানন্দ দাশের বিখ্যাত কবিতা 'বনলতা সেন' -এ এমন একটা অপূর্ব ব্যঞ্জনা ও কাব্যশ্রী আছে—যা মনকে স্পর্শ না করেই যায় না—

> 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে
> সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয়-সাগরে
> অনেক ঘুরেছি আমি, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
> সেখানে ছিলাম আমি, আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ-নগরে

আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতি দূর সমুদ্রের পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা।.........ইত্যাদি
—(জীবনানন্দ দাশ)

প্রাচীন ঐতিহ্যকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে এসে কবি এলেন একেবারে বর্তমান নাটোরের বনলতা সেনের কাছে। পটভূমিকা স্বপ্নে ভরা। সিংহল-সমুদ্র, মালয়-সাগর, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ, বিদর্ভ-নগর, শ্রাবস্তীর কারুকার্য—সবগুলো মিলে একটা রোমান্স সৃষ্টি করেছে। আমাদের কবিরা এই ধরনের কবিতা লেখেন না কেন? মুসলিম ঐতিহ্য দেখলে তাঁরা নাক সিট্‌কান। তাঁরা জীবনানন্দ দাশের এই spirit অনুকরণ করেন না, করেন দু-একটি form বা শব্দকে, যেমন 'ধানসিঁড়ি নদী।'

আমাদের অনেকে কম্যুনিষ্ট ভঙ্গিতে কবিতা লিখতে চান। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি যার যাই হোক না কেন—কবিতা তো হওয়া চাই। যা তাঁরা লিখবেন, তার তো কাব্যমূল্য থাকা চাই। শুধু একটা অতৃপ্তি ও ব্যর্থতার সুর জুড়ে দিলেই কি কম্যুনিষ্ট-মার্কা কবিতা হয়? সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রানার', 'একটি মোরগের কাহিনী' বা 'সিগারেটের' মতো মৌলিক ভাবসম্পন্ন কবিতা আমাদের কেউ লিখেছেন কি? মোরগ কবিতায় অতি অল্প কথায় কী চমৎকার প্রচার-কাব্যই না সৃষ্টি হয়েছে—

"খাবার! খাবার! খানিকটা খাবার!
অসহায় মোরগ খাবারের সন্ধানে
বারবার চেষ্টা করে প্রাসাদে ঢুকতে
প্রত্যেক বারেই তাড়া খেল প্রচণ্ড।
ছোট্ট মোরগ ঘাড় উঁচু করে স্বপ্ন দেখে
প্রাসাদের ভিতর রাশি রাশি খাবারের

তারপর সত্যি সে একদিন প্রাসাদে ঢুকতে পেল,
একেবারে সোজা চলে এল
ধপ্‌ধপে সাদা দামী কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে,
অবশ্য খাবার খেতে নয়—খাবারের হিসেবে।"

তাঁর "সিগারেট" কবিতাও কতো মৌলিক :—

"আমরা সিগাটের।
তোমরা আমাদের বাঁচতে দাও না কেন?
আমাদের কেন নিঃশেষ কর পুড়িয়ে?
আর আমরা বন্দী থাকব না
কৌটায় আর প্যাকেটে
আংগুলে আর পকেটে
আমরা বেরিয়ে পড়ব
সবাই একজোটে একত্রে
তারপর তোমাদের অসতর্ক মুহূর্তে
জ্বলন্ত আমরা ছিট্‌কে পড়ব তোমাদের হাত থেকে
বিছানায় অথবা কাপড়ে।
নিঃশব্দে হঠাৎ জ্বলে উঠে
বাড়িশুদ্ধ পুড়িয়ে মারব তোমাদের
যেমন করে তোমরা আমাদের পুড়িয়ে মেরেছো এতকাল।"

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন : উপরে যে কবিতাগুলি উদ্ধৃত করেছি তার কোথাও কোন আড়ষ্টতা নেই, দুর্বোধ্যতা নেই—প্রতিটি কথা পানির মতো সহজ। ঠিক এর পাশে আমাদের আধুনিক কবিতা পড়ে দেখুন—হয়তো কিছুই বুঝবেন না। শুনতে পাই পাঠককে কোনো-কিছু না বুঝতে দেওয়াই নাকি আধুনিক কবিতার লক্ষণ। তা হলে অবশ্য আর কিছুই বলার থাকে না। বলা বাহুল্য, এ আমাদের ভাবের দৈন্য এবং প্রকাশের অক্ষমতা ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের কবিরা যদি আত্মস্থ হন, তবেই তাঁরা নূতন কিছু সৃষ্টি করতে পারবেন। অনুকরণ দ্বারা তা সম্ভব

হবে না। একটা নূতন পথ তাদের বেছে নিতেই হবে। চলাপথে চললে চলবেনা।

উপরোক্ত কথাগুলি রূঢ় শোনালেও সত্যি। আশা করি আমাদের তরুণ ভায়েরা কথাগুলি ভেবে দেখবেন।

পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যের ভাষা কী হবে, তাও এক সমস্যা। বাংলা ভাষার পূর্ব-আধুনিক রূপ আপনাদের দেখিয়েছি। আরবী-ফারসী শব্দের মিশ্রণে মুসলিম বাংলা একটা বিশিষ্ট রূপ নিয়েছিল। সেই পুঁথির ভাষার হুবহু অনুকরণ আর এখন সম্ভব নয়। তবে তার উপর ভিত্তি করে আমাদের ভাষাকে মার্জিত পাকিস্তানী রূপ দিতে হবে। এটা যে কোনোরূপ সাম্প্রদায়িকভঙ্গিতে করবো, তা নয়, বাংলা ভাষার নিজস্ব কল্যাণ এবং নব সৃষ্টির তাগিদেই করবো।

পাকিস্তানের হিন্দু ভাইদেরও এতে কোনো চিন্তার কারণ নেই। তাঁদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা আছে। তাঁদের সঙ্গে কোনোরূপ বিরোধ না করেই আমরা আমাদের তমদ্দুনকে রূপ দেব।

বন্ধুগণ,

আর আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাবো না। আমার ভাষণের চেয়ে বাইরের প্রকৃতিতে আপনারা বেশী করে গমনের প্রতিধ্বনি শুনতে পাবেন। এই চট্টগ্রামের আকাশে-বাতাসে আজ যে সুর ধ্বনিত হচ্ছে, তার মাঝেই আছে আমাদের পয়গাম। চট্টগ্রামের সাগর-কল্লোলে, পাহাড়ের কাজল মায়ায়, তটদেশের শস্যশ্যামল সমভূমিতে যে বৈচিত্র্য, যে রহস্য, যে প্রাণ-চাঞ্চল্য রূপে-রসে-বর্ণে-গন্ধে লীলায়িত হয়ে ফিরছে, আমাদের সাহিত্যও হবে তেমনি বিচিত্র মধুর, ঐতিহ্যবাহী, বলিষ্ঠ ও সুন্দর। সেই ইংগিত দিয়েই আজকের মত বিদায় হই। তসলিম।*

*চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মেলনে (১৯৫৯) কাব্য-শাখায় সভাপতির অভিভাষণ।

শিরাজীকে মনে পড়ে

মরহুম ইসমাইল হোসেন শিরাজীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় পত্র-মারফৎ। সে আজ প্রায় ৪৫ বৎসর আগের কথা। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে আমার প্রথম কবিতা 'আদ্রিয়ানোপল উদ্ধারে' প্রকাশিত হয় জনাব মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবের 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদীতে'। তখন আমি শৈলকুপা হাই স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। সেই যুগে এই ধরনের আধুনিক কবিতা পূর্বে আর কোনো মুসলিম কবির হাত দিয়া প্রকাশিত হয় নাই। একটা নূতন সুর ও নূতন ভঙ্গি দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন। চারিদিক হইতে বহু প্রসংশা লাভ করিলাম। ফলে আমার উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল। এর পর দুই একটি করিয়া আমার কবিতা 'মোহাম্মদীতে' প্রকাশিত হইতে লাগিল। আমি ম্যাট্রিক পাশ করিয়া আই-এ পড়িতে লাগিলাম।

জনাব মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও মৌলানা (মরহুম) মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সাহেবদ্বয় কর্তৃক মাসিক-পত্রিকা 'আল-এসলাম' বাহির হইল। তাহাতেও আমার কবিতা ছাপা হইতে লাগিল। উদীয়মান কবি হিসাবে আমার নাম তখন ধীরে ধীরে সমাজে কিছুটা ছড়াইয়া পড়িতেছে।

ঠিক এমনি একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার বাড়ীর ঠিকানায় এক-খানি পত্র পাইলাম। খুলিয়া দেখিলাম, শিরাজী সাহেবের পত্র। আমার কবিতার প্রশংসা করিয়া তিনি আমাকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। সে যুগে শিরাজী সাহেবের নাম মুসলিম সমাজের ঘরে ঘরে ধ্বনিত হইত। একাধারে তিনি বাগ্মী, কবি ও লেখক। কাজেই তাঁর মত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে আমি যে পত্র পাইব, এ আশা তখনও আমি করিতে পারি নাই। আনন্দে ও গৌরবে আমার বুক ভরিয়া গেল। সেই হইতে আমি শিরাজী সাহেবের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করিতে লাগিলাম।

কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হইল। স্থানীয় নেতৃবৃন্দের আগ্রহে আমি শিরাজী সাহেবকে শৈলকুপা আনিবার জন্য দাওয়াৎ দিলাম। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তিনি আমার দাওয়াৎ গ্রহণ

করিলেন। শৈলকুপা মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে সভার আয়োজন করা হইল। হাটে হাটে কাড়া দিয়া জানাইয়া দেওয়া হইল : শিরাজী সাহেব আসিতেছেন। চারিদিকে বিপুল সাড়া পড়িয়া গেল।

১৩২৩ বাংলা সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিরাট সভা। বহুলোকের সমাগম। স্কুলের অনেক হিন্দু শিক্ষক ও পার্শ্ববর্তী বহু হিন্দু ভদ্রলোকও শিরাজী সাহেবের বক্তৃতা শুনিবার জন্য যোগদান করিলেন। শিরাজী সাহেবের ভাব, ভাষা ও বাগ্মিতা হিন্দু-মুসলমান সকলকেই মুগ্ধ করিল। সেই সভায় তখনকার রচিত আমার জাতীয় সঙ্গীত 'জাগোরে সুপ্ত স্বজাতি আমার, নিদ্রা-কাতর রয়োনা আর'—গানটি আমি গাহিলাম। শিরাজী সাহেবের অনুরোধে আমার ২।১টি জাতীয় কবিতাও আবৃত্তি করিলাম। বলা বাহুল্য, সেদিন দেশবাসীর নিকট হইতে আমিও কিছু প্রশংসা কুড়াইলাম।

শিরাজী সাহেব ২।৩ দিন শৈলকুপায় ছিলেন। আমার নিজবাড়ী মনোহরপুর শৈলকুপা হইতে দুই মাইল দূরে। যানবাহনের কোনই সুবিধা ছিলনা। কাজেই শিরাজী সাহেবের থাকার বন্দোবস্ত আমাদের বাড়ীতে সম্ভব হইল না। নিকটে খালের ধারেই (মরহুম) তেজারত খাঁ সাহেবের বাড়ী ছিল। সেখানেই শিরাজী সাহেবকে রাখার ব্যবস্থা করা হইল। প্রায় সারাদিনই আমি তাঁহার কাছে থাকিতাম। রাত্রে বাড়ী যাইতাম।

একদিন আসিতে একটু দেরী হইয়াছে। দেখা হইতেই শিরাজী সাহেব অনুযোগ করিয়া বলিলেন : এত দেরী করিয়া আসিলে কেন? তোমাকে না দেখিয়া এই দেখ আমি গান লিখিয়াছি। এই বলিয়া তিনি তাঁহার খাতা হইতে এই গানটি গুন্ গুন্ করিয়া গাহিয়া শুনাইলেন :—

"তোমার বিহনে ওগো বুলবুল।
আজি, প্রাণের কুঞ্জে ফোটে নাই ফুল।।
নাহি আজি তাই কোন সৌরভ
নাহি আজি তাই কোন গৌরব
হারায়ে চিত্ত সকল বৈভব
দুঃখে হয়েছে ধূল।

নাহি আর তার মুখের শোভা
নাহি আর তার চোখের আভা
হারায়ে শান্তি হারায়ে কান্তি
কেবলি করিছে ভুল।।
কবে বা তুমি আসিবে কুঞ্জে
ফুটিবে কুসুম পুঞ্জে পুঞ্জে
গুঞ্জিবে ভ্রমর মধুর ছন্দে
লভিব সুখ-অতুল।"

(প্রেমাঞ্জলি—২য় খণ্ড)

এই সঙ্গে আরও ২।৩টি গান তিনি আমাকে পড়িয়া শুনাইলেন। গানগুলি তাঁর "প্রেমাঞ্জলি" পুস্তকে স্থান লাভ করিয়াছে। ২রা অগ্রহায়ণ ১৩২৩ তারিখে এই গানগুলি লেখা।

এরপর কলিকাতায় তাঁর সঙ্গে বহুবার আমার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে। তিনি তাঁর সমস্ত পুস্তকেরই একসেট আমাকে উপহার দিয়াছিলেন।

এতদিন পরেও সেই সব স্মৃতি আমার অন্তরে এখনও সবুজ রহিয়াছে।

বস্তুতঃ আমার কাব্য-জীবন যাঁহাদের স্নেহস্পর্শে লালিত হইয়াছে, শিরাজী সাহেব তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তরুণকে ডাক দিয়া কাছে টানিয়া আনা, তার চিত্ত-মুকুলের বিকাশ-পথকে উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া মহত্ত্বের পরিচয়। শিরাজী সাহেবের মধ্যে ছিল তেমনি একটা উদার মহৎ প্রাণ। এই মন, এই প্রাণ, এই ঔদার্য আজিকার দিনে অত্যন্ত বিরল। আজ তাই কৃতজ্ঞতায় ও শ্রদ্ধায় এপারে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে জানাই আমার অন্তরের সশ্রদ্ধ সালাম।

দরবার
১৯৫৯

আমাদের হরফ-সমস্যা

সম্প্রতি আমাদের হরফ-সমস্যা আবার তীক্ষ্ণ হইয়া দেখা দিয়াছে। অনেকে বাংলা ও উর্দু ভাষাকে রোমান হরফে লিখিবার জন্য সোপারিশ করিতেছেন। এজন্য বাংলা ও উর্দু ভাষাভাষীদের মধ্যে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। অনেকেই রোমান হরফের বিরোধিতা করিতেছেন। এ সম্বন্ধে ধীরস্থির ভাবে আলোচনা করিয়া একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই সমীচীন। বাংলা হরফ কেনই বা আমরা বর্জন করিতে চাই, বর্জন করিলে তার ফলাফলই বা কী দাঁড়ায়, পক্ষান্তরে রোমান হরফ গ্রহণ করিলে তাহাতেই বা আমাদেব কী ক্ষতিবৃদ্ধি হয়—সব কথাই গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাহার কি বক্তব্য আছে, এখনই বলা ভালো। আমার ব্যক্তিগত মত আমি নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

প্রথমে বাংলা হরফ সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাউক।

বাংলা হরফ

বাংলা হরফ পরিবর্তনের প্রস্তাব এবং প্রয়োজনের মধ্যে এই সত্যই স্বীকৃত হইতেছে যে, বাংলা হরফ বর্তমান যুগের চাহিদা মিটাইতে পারিতেছে না ; অন্য কথায়ঃ এ হরফের বহু দোষ-ত্রুটি আছে। বাংলা হরফ পরিবর্তন করা যদি সাব্যস্তই হয়, তখন আমরা অপর কোন্ হরফ গ্রহণ করিব—রোমান, না অন্য কোনো—সে প্রশ্ন পরে বিবেচ্য।

বাংলা হরফের গুণও আছে, দোষও আছে, সন্দেহ নাই। এ হরফ বর্জন করিতে গেলে আমাদের অনেক নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। অবশ্য জাতির বৃহত্তর কল্যাণ ও প্রয়োজনের তাকিদে যদি আমাদের হরফ পরিবর্তন অনিবার্য হইয়াই উঠে, তখন সব বাধাবিঘ্ন স্বীকার করিয়াই আমাদের পথে বাহির হইতে হইবে। পাকিস্তান নূতন রাষ্ট্র। এখন তার ভাঙা-গড়ার যুগ। এ সময় কোনো একটা বিশেষ বিলাস বা অনুভূতির দ্বারা চালিত হওয়া আমাদের উচিত নয়।

একথা অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে যে, প্রয়োজন যতোই থাকুক না কেন, বাংলা হরফ বর্জন করিলে বাংলা ভাষারও রূপান্তর ঘটিবে। প্রত্যেক ভাষার মেজাজ বা প্রকৃতি অনুসারেই তার বর্ণমালা সৃষ্ট হইয়াছে। ভাবের সঙ্গে শব্দের মিল থাকে। শব্দের রূপটি দেখিলেই তার অন্তর্নিহিত ভাবটি আপনিই আমাদের মনে জাগে। 'স্ত্রী' কথাটি আমরা যেমন সংযুক্তভাবে দ্রুত উচ্চারণ করি, লিখিবার বেলাও ঠিক তেমনি লিখি। অন্য কোনো প্রকারে লিখিতে গেলেই 'স্ত্রী'র আসল রূপটি নষ্ট হইয়া যায়। কেহ যদি 'স্ত্রী'কে 'Stri' লেখেন অথবা সহজ বানানে 'স্‌ত্‌রী' লেখেন, তবে তিনি নির্ঘাৎ তাঁর স্ত্রীকে হারাইবেন। লিখন-ভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ-ভঙ্গিও নষ্ট হইবে। কার্য, কারণ, মন, সকল, সকাল, সাঁঝ—এই শব্দগুলিকে যদি রোমান হরফে লেখা হয়, তবে শব্দগুলির চেহারা এইরূপ হইবে: **Karya, Karan, Man, Sakal, Sanjh.** কোন্‌টির উচ্চারণ যে কী হইবে বলা তখন কঠিন হইবে। অনুলিখন (Transliteration) সর্বত্র ঠিক হইবে না। ফলে ভাবে ও ভাষায় অরাজকতা দেখা দিবে।

লিপি-পরিবর্তনের বড় সমস্যা হইল: অতীত সাহিত্য-সঞ্চয়ের সহিত বর্তমানের সংযোগ সংরক্ষণ। আমরা যদি এখন রোমান হরফে বা অন্য যে-কোনো হরফে বাংলা লিখি, তবে এতদিনকার পুঞ্জীভূত সাহিত্য-সম্পদের কী দশা ঘটিবে? সেগুলির সহিত আমরা যোগ রাখিব কি করিয়া? সাহিত্য দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গেলে দুই কূল বজায় রাখা আমাদের দায় হইয়া উঠিবে। বাংলা ভাষাকে হালকা করিতে গিয়া বরং আমরা তাহার বোঝাকে দ্বিগুণ করিয়া তুলিব। প্রাচীন বর্ণমালাও থাকিবে, সঙ্গে সঙ্গে নূতনটাও শিখিতে হইবে। এক ভাষার তখন দুই লিপি হইবে। যদি বলেন, তখন পুরাতন সব-কিছুকেই নূতন ছাঁচে ঢালিয়া লইতে হইবে, অর্থাৎ সমস্ত পুথি-পত্রকেই রোমান হরফে পুনরায় ছাপিয়া লইতে হইবে, তবে সে প্রলাপোক্তির মতোই মনে হইবে। এত বড় অসম্ভবকে সম্ভব করা সম্ভব হইবে না।

কিন্তু এরূপ ঘটনা যে জগতের ইতিহাসে ঘটে নাই, তাহাও তো নহে। বহু ভাষাই লিপি পরিবর্তন করিয়াছে। ফার্সি ভাষার কথাই ধরুন। আরবদের সংস্পর্শে আসিয়া পেহ্‌লবী ভাষা ইহার লিপি হারাইল।

পেহ্‌লবী লিপিকে বর্জন করিয়া যখন আরবী লিপি গ্রহণ করা হইল তখন প্রথম প্রথম নিশ্চয়ই কিছু অসুবিধা ঘটিয়াছিল; কিন্তু কালে কালে সে অসুবিধা দূর হইয়া গেল। সেইরূপ অন্যান্য ভাষারও লিপি পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পশতু, সিন্ধী ইত্যাদি অনেক ভাষাই আরবী লিপিতে লেখা হয়। এমন কি আমাদের বাংলা ভাষাও মুসলমানেরা আরবী হরফে লেখার প্রচেষ্টা করিয়াছিল। এ যাবৎ প্রায় ৪০ খানা আরবী হরফে লেখা বাংলা পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। কাজেই ব্যাপারটা শুনিতে যেরূপ উদ্ভট লাগে, কার্যতঃ ততো নয়। আধুনিক যুগে কামাল আতাতুর্ক তুর্কী হরফ বর্জন করিয়া রোমান হরফের প্রবর্তন করিয়াছেন, এ কথা সকলেই জানেন। সুতরাং প্রয়োজনের তাকিদে লিপি-পরিবর্তন খুব একটা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

এইবার বাংলা লিপির দোষের কথা বলা যাউক। কদর্যতায় (cumbrousness) বাংলা লিপি চীনা লিপির নীচেই। এ-লিপিতে হরফ বাদেও প্রায় ৪০০টি ফলা এবং কার-চিহ্নের প্রয়োজন হয়। যে কোনো ছাপাখানায় গিয়া 'বাংলা-কেস্' দেখিলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। চারিখানা কেস্ না হইলে বাংলা কম্পোজ চলে না। ইংরেজী বা আরবী কম্পোজ দুইখানা কেসেই চলে। বাংলা টাইপরাইটারও এই কারণে সহজ-সাধ্য নয়। এই লিপির দ্রুত গতিশীলতাও নাই। এ লিপির লেখনে সময়ও যেমন বেশি লাগে, স্থান (space)-ও তেমনি বেশি লাগে। অনেকে মনে করেন, ধ্বনিতত্ত্বের দিক দিয়া (phonetically) বাংলা লিপি অন্য সব লিপি অপেক্ষা উন্নত। কিন্তু এ ধারণাও নির্ভুল নহে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা যেরূপ লিখি, সেইরূপ উচ্চারণ করি বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। বাংলা ভাষার ব্যাকরণে বলা হয়: প্রত্যেক ব্যাঞ্জন বর্ণটি অকারান্ত। কিন্তু কার্যতঃ আমরা সবসময় সেরূপ উচ্চারণ করি কি? পথ, জল, হাত, আকাশ, প্রত্যেকটি শব্দের উচ্চারণ পথ্, জল্, হাত্, আকাশ্—এইরূপ হসন্ত-যুক্ত।

কাজেই বাংলা হরফ বর্জন করিয়া যাহারা রোমান হরফ গ্রহণ করিতে চান, তাঁহারা উত্তপ্ত তেলের কড়াই হইতে আগুনে ঝাঁপ দিবেন। রোমান হরফে বাংলা লিখিতে গেলে নানা বিভ্রাট আসিয়া দেখা দিবে।

কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেখুন: কর, ধর, মন, ধন, জন, অত্যন্ত, এই শব্দগুলি রোমান হরফে লিখিলে এইরূপ দাঁড়াইবে। :

বাংলা		রোমান হরফে অনুলিখন		বিকল্প পঠন
কর	—	Kara	—	করা, কারা
ধর	—	Dhara	—	ধরা, ধারা
মন	—	Mana	—	মণ, মান, মানা
ধন	—	Dhan	—	ধান
জন	—	Jana	—	জানা
অত্যন্ত	—	Atyanta	—	অতিয়ান্ত, অত্যান্ত, অত্যান্তা

সেইরূপ 'কর'কে Koro বা Karo দিয়া লিখলেও একই ফল ফলিবে। বস্তুতঃ লেখন পঠন এবং বচন—তিনটিই তখন কঠিন হইয়া পড়িবে। তখন বাংলা হরফে বাংলা শব্দের রূপ না জানা পর্যন্ত রোমান-বাংলা পড়া যাইবে না। ফলে যে বাংলা হরফকে বর্জন করিবার জন্য এত চেষ্টা, সেই বাংলা হরফ থাকিয়াই যাইবে, মাঝখান হইতে রোমান হরফ আসিয়া আমাদের ঘাড়ে চাপিবে।

রোমান হরফ গৃহীত হইলে এত কালের সঞ্চিত বাংলা পুথিপুস্তকের কী দশা হইবে, কাব্য-কবিতার রূপ ও গঠন কেমন হইবে, সে কথাও আমাদের ভাবিতে হইবে। হয়তো নূতন নূতন চিহ্ন আমদানি করিয়া বিপদটা কিছু লাঘব করিবার চেষ্টা করা হইবে; কিন্তু তাতেও ত জটিলতা বাড়িবে ছাড়া কমিবে না। যাহারা 'শহজ বাংলা' প্রবর্তন করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে এই সব কারণেই ব্যর্থ হইয়া ফিরিতে হইয়াছে। কাজেই ব্যাপারটা যতো সহজ মনে করা হয়, কার্যতঃ ততো সহজ নয়।

'কর' লিখিলে কেহ 'কর্' পড়িবেন, কেহ 'করো'ও পড়িতে পারেন, কেহ বা আবার 'কর' (হস্ত)-ও পড়িতে পারেন। অনেক সময় আমরা অক্ষর ব্যবহার করি একরূপ, কিন্তু উচ্চারণ করি অন্যরূপ। যেমন: 'লক্ষ্মণ', স্মরণ', সূক্ষ্ম, 'স্মৃতি', 'আত্মা,' ধ্বনি, স্বরূপ, কার্য্য, ব্যস্ত, দুঃখ, সত্বর, ত্বরিৎ, রক্ষা ইত্যাদি। উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে স্মৃতি,

আত্মা ইত্যাদিতে ম-ফলার উচ্চারণ নাই। আত্মাকে কেহ আমরা 'আতমা' বলি না। 'সম্যক' বানানে য-ফলা রহিয়াছে, কিন্তু উচ্চারণে 'ম'টি ডবল হইয়া যাইতেছে। য-ফলার এখানে কোনো কাজই নাই। 'সত্বর' কথাটিতে ব-ফলা রহিয়াছে, কিন্তু উচ্চারণের বেলায় ব-এর কোনো উচ্চারণই নাই, অথচ 'ত'টি ডবল হইয়া যাইতেছে। সেইরূপ 'সাম্য' কথাটির মধ্যে য-ফলার কোনো উচ্চারণ নাই, অথচ অকারণে ম-টি দ্বিত্ব হইয়া যাইতেছে। ি (ই), ী (ঈ), ু (উ), এবং ূ (ঊ) এর মধ্যে কোনো তারতম্যই নাই। জ-য, ন-ণ, স-শ-ষ ইহাদের মধ্যেও কোনো পার্থক্য নাই। আমরা লিখি 'এক', কিন্তু বলি 'অ্যাক'। সেইরূপ এত, এমন, এখন ইত্যাদি। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে— যাহাতে বুঝা যাইবে যে ধ্বনিতত্ত্বের (phonetics) দিক দিয়া বাংলা হরফ সর্বত্র বিজ্ঞানসম্মত নয়।

রোমান হরফেও এদোষ পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। একই অক্ষর অবস্থা বিশেষে বিভিন্ন রূপে উচ্চারিত হয়। **B-U-T** 'বাট' কিন্তু **P-U-T** 'পুট', **M-E-N** 'মেন' কিন্তু **H-E-R** 'হার', **D-A-Y** 'ডে' কিন্তু **M-A-N** 'ম্যান'। **P-I-N** পিন্ কিন্তু **P-I-N-E** পাইন। My 'মাই' কিন্তু **Mystery** 'মিস্ট্রী'। **Psalm, Carmichael, Lieutenant, Colonel, Wednesday**,—ইত্যাদি বহু দৃষ্টান্তই দেওয়া যায়—যেখানে হরফের সঙ্গে উচ্চারণের কোনো সামঞ্জস্যই নাই।

একটা সুবিধা এই হইত যে বাংলা বা উর্দুতে রোমান হরফ ব্যবহার করিলে আধুনিক জগতের অন্যান্য আন্তর্জাতিক বর্ণমালার সহিত খাপ খাওয়াইয়া লওয়া যাইত। একই লিপি দ্বারা ইংরেজী, উর্দু ও বাংলা শেখা সম্ভব হইত। ইহাতে শক্তি ও সময় অনেকখানি রক্ষা পাইত। পশ্চিম ও পূর্ব-পাকিস্তানের লোকেরাও একই লিপিজ্ঞান দ্বারা বাংলা, উর্দু ও অন্যান্য ভাষা শিখিতে পারিত।

কিন্তু এ সুবিধাও অনেকটা কাল্পনিক। কার্যতঃ অনেক বাধা আসিয়া দেখা দিবে। ফলে ভাষার উভয় রূপই চালু রাখিতে হইবে এবং কোনোটাই সুষ্ঠুভাবে লেখা হইবে না। রোমান হরফে লিখিলে কোন্ শব্দটি

কোন্ ধাতু হইতে কিরূপে রূপান্তরিত হইল, কিছুই বুঝা যাইবে না। উর্দুর সঙ্গে ফার্সি ও আরবীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সে সম্বন্ধ একদম নষ্ট হইয়া যাইবে। যে রসধারা ও প্রেরণা (Inspiration) আরবী, ফারসী ও উর্দুর মধ্যে ফল্গুধারার মতো গোপনে প্রবাহিত হইতেছে, সে ধারা ব্যাহত হইবে। ফলে লাভ অপেক্ষা আমাদের লোকসানই হইবে বেশি। আরবীর সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় উর্দুর একটা স্বকীয় মহিমা আছে। উর্দুকে রোমান হরফে লিখিলেই সেই মর্যাদা ও মহিমা নষ্ট হইবে। ইসলামী ভাষা-গোষ্ঠির মধ্যে সে বিচ্ছিন্ন হইয়া দিন কাটাইবে। উর্দু আজ সমগ্র জগতের Lingua Franka (সাধারণ ভাষা) হইবার দাবী রাখে। শুধু পাক-ভারতে নয় ; সিংগাপুর, মালয়, সিংহল, জাভা, বোর্নিও, টোকিও, বার্লিন, রাশিয়া, মিসর, আমেরিকা সর্বত্রই উর্দু ভাষা প্রসার লাভ করিতেছে। কাল্পনিক একটা সুবিধার জন্য আমরা কেন এতবড় একটা শক্তি ও সম্ভাবনাপূর্ণ ভাষাকে নষ্ট করিব? ইসলামী-জগতের সঙ্গেই বা কেন আমরা বিচ্ছিন্ন হইব?

আরবী হরফ

এইসব কারণে আমি বাংলা হরফ বর্জন করিবার পক্ষপাতী নই। বাংলা হরফ যদি আমাদিগকে বর্জন করিতেই হয়, তবে রোমান হরফে না গিয়া বরং আরবী হরফেই আমাদের ফিরিয়া যাওয়া উচিত। আরবী হরফেও অসুবিধা আছে, তবে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাওয়া যাইতে পারে:

১। আজ আমরা এক নূতন বৈজ্ঞানিক যুগের অধিবাসী। স্থান ও কাল (Space and Time)-এর হ্রাস এবং গতির (speed) বৃদ্ধি—ইহাই হইতেছে এ যুগের বৈশিষ্ট্য। আমাদের ভাষা ও হরফকেও এই যুগের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। সে হিসাবে আরবী ভাষাই অধিক কার্যকরী বলিয়া আমার বিশ্বাস। এ ভাষা 'Short hand'-এর মতই স্থান ও সময় কম লয় এবং দ্রুত গতিতে চলে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি:—

ধরুন "বিস্‌মিল্লাহ্‌হির রাহ্‌মানির রাহীম'—এই কথাটি লিখিতে হইবে।

একজন লিখিবে আরবীতে, একজন লিখিবে বাংলায়, একজন লিখিবে ইংরাজীতে। ঘড়ি ধরিয়া তিন জনকে যদি একই সময়ে যথাসম্ভব দ্রুত-গতিতে লিখিতে বলা হয়, তবে দেখিবেন আরবী হরফের লেখাটি ৩।৪ সেকেণ্ডে শেষ হইবে, বাংলা হরফের লেখাটিতে ৮।৯ সেকেণ্ড লাগিবে এবং ইংরাজী হরফের লেখাটিও ৭।৮ সেকেণ্ড লইবে। নিজেরাই ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

২। আরবী লিপির সহিত বর্তমান (Shorthand writing)-এর নিকট সম্বন্ধ আছে। লিখিবার সময় ৩।৪টি হরফ একটানে জড়াইয়া লেখা যায়, কাজেই—স্থান এবং সময় ইহাতে কম লাগে; সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত গতিও পাওয়া যায়। এতগুলি সুবিধা অন্য লিপিতে নাই। এই নভোবিজ্ঞানের যুগে ইংগিতমুখর ভাষা ও লিপির প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

৩। সমগ্র ইসলামী জগতে আরবীই হইতেছে আমাদের কেন্দ্রীয় জাতীয় ভাষা। এই ভাষাই আমাদের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য রাখিতেছে। কাজেই এর সঙ্গে আমাদের সংযোগ অপরিহার্য। পাকিস্তানের অন্য সবগুলি ভাষাই (পশতু, পাঞ্জাবী, সিন্ধি ইত্যাদি) আরবী হরফে লেখা হয়। একমাত্র বাংলা ভাষাই ইহার ব্যতিক্রম। বাংলা ভাষা মূলতঃ আর্যভাষা না হইলেও এর লিপি Indo-European বলিয়া ধরা হয়। কাজেই পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির দিক দিয়া রোমান হরফ অপেক্ষা আরবী হরফই আমাদের অধিকতর উপযোগী।

৪। আরবী লিপির ইতিহাস অত্যন্ত গৌরবজনক। আরবীই হইতেছে "উম্মুল আল্-সিনা" অর্থাৎ সকল ভাষার জননী। আরবী বর্ণমালাকেই বলা হয়: 'Mother Alphabet of the World" অর্থাৎ সমস্ত বর্ণমালার জননী। আজও সমগ্র জগতে আরবী একটা বলিষ্ঠ প্রাণবন্ত ভাষা। জগতে বহু প্রাচীন জাতি এবং বহু প্রাচীন ভাষা ছিল। কিন্তু আজ তাহাদের একটিরও অস্তিত্ব নাই। অথচ আরবী জবান এখন পর্যন্ত পূর্ববৎ জীবন্ত রহিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Hitti (হিট্টি) তাই কী সুন্দরই না বলিয়াছেন "The Babylonians, the Chaldaeans, the

Hittites, the phoenicians were, but are no more. The Arabs and the Arabic-speaking people were and remain."

অর্থাৎ ব্যাবিলোনিয়ায়ন, চালদিয়ান, ফিনিসিয়ান ইত্যাদি বহু জাতি ছিল, কিন্তু এখন নাই। আরব এবং আরবী ভাষাভাষী লোকেরা ছিল এবং এখনও আছে।

ইসলাম আজ নবরূপে জাগিয়া উঠিতেছে। আরব-জাহান (Arab World)-এর দিকে আজ সারা পৃথিবী উৎসুক নয়নে চাহিয়া আছে। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সংগ্রামের কথা ভাবিয়া এবং আমরা কোন্ পক্ষে যোগ দিব এবং কাহাদের সঙ্গে আমাদের সংযোগ কল্যাণকর হইবে, সেই কথা ভাবিয়া আমরা যেন হরফ পরিবর্তন করি।

ঢাকা

১৯৬০

ইকবাল ও রবীন্দ্রনাথ

পাক-ভারত উপমহাদেশে যে দুইজন কবি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন ইকবাল ও রবীন্দ্রনাথ। এঁদের প্রত্যেকেরই বহু বিচিত্র দান রয়েছে। এঁদের প্রতিভা সৃষ্টিধর্মী ও বহুমুখীন। এঁদের কাব্য ও চিন্তাধারার সকল বৈশিষ্ট্য এক প্রবন্ধে ফুটিয়ে তোলা কঠিন। এক একটা বিশেষ দিক নিয়ে এক একবার আলোচনা করা যেতে পারে।

বর্তমান প্রবন্ধে আমি এই দুই কবির দার্শনিকতা নিয়ে আলোচনা করব। জীবন ও জগতকে এঁরা কী চোখে দেখেছেন, মানব জাতিকে এঁরা কী বাণী দান করেছেন, মানব-জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও পরিণতি সম্বন্ধে এঁদের কার কী মত—সেই সম্বন্ধে কিছু বলা যাক।

প্রথমেই ইকবাল সম্বন্ধে কিছু বলা যাক।

ইকবাল

ইকবাল দার্শনিক কবি। কিন্তু অনেকের কাছেই এটা তাঁর গুণের কথা নয়, —দোষের। দার্শনিক হওয়াতেই নাকি কবি ইকবাল খাটো হয়ে গেছেন। তাঁরা বলেনঃ তত্ত্বকথাই কাব্য নয়। দর্শন এক, কাব্য এক। অন্য কথায়ঃ তাঁরা বলতে চান, রূপ রস ও আনন্দ দিয়েই কাব্যের বিচার, দার্শনিকতা দিয়ে নয়।

কথাটি আংশিক সত্য হলেও পূর্ণ সত্য নয়। দার্শনিকতা ফলালেই যে কাব্য হলো—এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু সত্যিকার কাব্য হতে হলে তাতে কিন্তু দার্শনিকতা থাকা চাই-ই। যে কবির কাব্যে কোনো দর্শন নেই, সে-কবি ভালো কবি (good poet) হতে পারে, কিন্তু বড় কবি বা মহাকবি (great poet) নয়। Coleridge বলেনঃ "No man was ever yet a great poet without being at toe same time a profound philosopher." (অর্থাৎঃ বড় দার্শনিক ছাড়া কেউ কখনও বড় কবি হয়নি) Browning বলেনঃ Philosophy first and poetry, which is its

outcome afterwards." (অর্থাৎ: দর্শন আগে, তারপর তার ফল স্বরূপ আসবে কাব্য।) বিশিষ্ট কাব্যসমালোচক Landor বলেন:

"we may write little things well and accumulate one upon another, but never will any be justly called a gread poet, unless he has treated a great subject worthily. He may be the poet of the lover and the idler, he may be the poet of green fislds and gay society; but whoever is this can be no more." (অর্থাৎ: আমরা ছোটখাটো জিনিস খুব ভালো করে লিখতে পারি, কিন্তু কোনো গুরুতর বিষয় দক্ষতার সঙ্গে লিখতে না পারলে কেউ কখনো বড় কবি হতে পারে না। সে আসলে প্রেমের কবিতা লিখতে পারে, সবুজ মাঠের বর্ণনা দিতে পারে, কিন্তু যে-কবি শুধু এইসব নিয়েই মগ্ন থাকে, সে এর চেয়ে আর বড় কিছু হতে পারে না।)

কাজেই দেখা যাচ্ছে, কবি হলে যে আর দার্শনিক হতে নেই, একথা ভুল। জগতের সমস্ত বড় কবিরা কোনো না কোনো একটা দার্শনিক মতবাদ প্রচার করে গেছেন; তাতেই তাঁদের কাব্য বেঁচে রয়েছে। দ্যান্তে, মিলটন, গ্যেটে, শেলী, বায়রণ, শেকস্‌পিয়ার, ওয়ার্ডসয়ার্থ, হাফিজ, রুমী, ওমর খৈয়াম,—প্রত্যেকের কাব্যের পশ্চাদ্ভূমিতেই রয়েছে কোনো না-কোনো দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি; তাতেই তাঁদের কাব্য কালোত্তীর্ণ হয়েছে। কাজেই দার্শনিকতা কবিদের একটা প্রধান গুণ। আশ্চর্যের বিষয়, ইকবালের যেটা গুণ, সমালোচকেরা সেটাকেই তাঁর দোষ বলে প্রচার করছেন।

তা হলে ইকবাল-কাব্য পড়তে হলে তাঁর দর্শন সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানতেই হয়।

ইকবালের দর্শন

ইকবালের আবির্ভাবকালে দার্শনিক বিভ্রান্তিতে সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। জগতে তিনটি প্রধান কালচারের ধারা বয়ে চলেছে: (১) গ্রীক বা হেলেনিক কালচার, (২) সেমিটিক কালচার, (৩) আর্য্য কালচার।*

*আর্য-কালচারের স্বরূপ নির্ণয় করা কঠিন। 'আর্য-থিওরী' প্রবন্ধ দেখুন।—লেখক।

ইউরোপ প্রধানতঃ গ্রীক কালচার দ্বারাই প্রভাবান্বিত। গ্রীক কালচারের মূলে রয়েছে প্লেটো ও এরিষ্টটলের চিন্তাধারা। দর্শন, বিজ্ঞান, শিক্ষা, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে গ্রীক পণ্ডিতমণ্ডলীই সর্বপ্রথম বিধিবদ্ধ ভাবে চিন্তা করেন। এই জগৎ কে সৃষ্টি করলো, কোথা হতে এলো, কোথায়ই বা এর শেষ পরিণতি—ইত্যাদি সম্বন্ধে চিন্তা করতে গিয়ে প্লেটো বলেন: এই পরিদৃশ্যমান জগতের সব কিছুই অলীক (illusion); কোনো কিছুরই সত্যিকার অস্তিত্ব নেই; মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বস্তুজগতের সবকিছু বিলীন হয়ে যাবে; থাকবে শুধু নির্গুণ পরম সত্ত্বা (**Idea** বা **Absolute Idea.**) বস্তুজগৎ সেই পরম সত্ত্বারই লীলা বা মায়া; কাজেই অসার ও অনিত্য। মানুষের আত্মাও সেই পরমাত্মারই বাহ্য প্রকাশ; কাজেই যে পথ দিয়ে সে এসেছে, সেই পথ দিয়েই সে ফিরে যাবে তার উৎস-মূলে। মানুষের যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা ব্যক্তিত্ব আছে, মৃত্যুকে অতিক্রম করে সে যে অনন্ত জীবনে বেঁচে থাকবে, এসব কথা প্লেটো বলেননি। এক বিরাট মহামৃত্যুই যে এই সুন্দর ধরণীর পরিসমাপ্তি ঘটাবে, এই নিরাশার বাণীই তিনি জগতকে দিয়ে গেছেন।

ইকবাল নিজেই প্লেটোর দর্শন সম্বন্ধে বলছেন:

"পরম ঋষি পুরুষ প্লেটো
তিনি ছিলেন প্রাচীন যুগের একটা মেষ;
অদৃষ্টের জন্য তিনি এতই পাগল ছিলেন যে,
তাঁর চক্ষু, কর্ণ, হস্ত-পদকে কোনো কাজেই লাগাননি।
তিনি বলে গেছেন: মৃত্যুই জীবনের সার কথা।
নিভে যাওয়ার মধ্যেই বাতির গৌরব।...
মানুষের বেশে তিনি একজন মস্তবড় ভেড়া।
জীবনকে বরবাদ করাই তাঁর জীবনের কাজ।
ক্ষতিই হলো তাঁর কাছে মহালাভ।
মৃত্যুই হলো তাঁর কাছে জীবন।"...

—(আসরার-ই-খুদী)

গ্রীক দার্শনিকদের এই ভাবধারা ইউরোপকেও যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছে। পরবর্তী দার্শনিকেরা এই একই সুরের প্রতিধ্বনি করেছেন। বর্তমান যুগেও এ প্রভাব অব্যাহত রয়েছে। ফিশার ঠিকই বলেছেন: "We European are children of Hellas." (অর্থাৎ আমরা গ্রীকেরই সন্তান) প্লেটো ও এরিষ্টটলের পরে যতো দার্শনিকই ইউরোপে আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁদের সকলেই জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে প্রায় একই কথা বলে এসেছেন। ডেকার্ট, লেবনিজ, বার্কলে, ক্যান্ট, হেগেল, সবাই সেই মূল ধারণাকেই পরিপুষ্ট করেছেন মাত্র।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে জার্মান দার্শনিক নীট্শে এবং ফরাসী দার্শনিক বার্গোসঁ কিছুটা নূতন কথা বললেন। নীট্শে বললেন: "মানুষ মৃত্যুর সঙ্গেই বিলীন হয়ে যাবে না; বারে বারে সে এখানে ফিরে আসবে (eternal recurrence), এবং সাধারণ মানুষ রূপে না এসে অতিমানুষ বা 'Superman' রূপে আসার সাধনা করাই হবে আমাদের কর্তব্য। নীট্শে তাই সাধারণ মানুষকে ঘৃণার চোখেই দেখতেন। খৃষ্টান ধর্মের অনেক বিশ্বাস ও নীতিকে তিনি উড়িয়ে দিলেন; সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় ও পাপ-পুণ্যের প্রচলিত ধারণাকেও তিনি প্রচণ্ড আঘাত করলেন। ঈশ্বর (God) বলে কেউ নেই, এই মানুষই সাধনার দ্বারা Superman বা নব-ঈশ্বররূপে জন্মলাভ করবে—ইত্যাদি অনেক নূতন ধরনের কথা তিনি বললেন। কিন্তু নীট্শের এই মতবাদ ইউরোপ গ্রহণ করলো না; গ্রীক দার্শনিকদের অদ্বৈত-মায়াবাদই (Pantheistic Idealism) ইউরোপের মন ও মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রাখলো।

ভারতীয় দর্শনেও একই মতবাদ অভিব্যক্ত হলো। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের এবং জগতের সম্বন্ধ কি, তা নির্ণয় করতে গিয়ে ভারতীয় দর্শন একই মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদ প্রচার করলো। ভারতীয় ষড়দর্শনের প্রায় সবগুলিই নিরীশ্বরবাদের উদগাতা। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক—কোনো দর্শনেই ঈশ্বর অঙ্গীকৃত হয় নাই; একমাত্র উপনিষদ বা বেদান্ত-দর্শনই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছে। কিন্তু তাও গ্রীকদর্শনের অনুরূপ।

'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অর্থাৎ এক ছাড়া দুই নাই—এই হলো বেদান্ত মত। এর নামই অদ্বৈতবাদ। এই অদ্বৈতবাদ কিন্তু তৌহীদবাদ নয়। 'এক ছাড়া দুই নাই'—এর অর্থ এ নয় যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া দ্বিতীয় (আল্লাহ্) নাই। এর অর্থ হলো: আল্লাহ্ ছাড়া আর কিছুই নাই। অন্য কথায়: আল্লাহ্ ছাড়া দ্বিতীয় বস্তুর কোনো অস্তিত্বই নাই। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পশু-পক্ষী, তৃণলতা, পাহাড়-পর্বত—সবই সেই একের প্রকাশ, অথবা সেই একেরই অংশ; অর্থাৎ কিনা স্রষ্টা ও সৃষ্টি অভিন্ন; কোনো পার্থক্য নেই তাদের মধ্যে। 'জীবই শিব,' 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' (এই আত্মাই ব্রহ্ম), 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (আমিই ব্রহ্ম), 'সোহহং' (সে-ই আমি)—এই হলো বেদান্ত দর্শনের সারকথা। বলা বাহুল্য, এই মতবাদের ভিত্তিভূমি হলো উপনিষদ বা বেদান্ত। বেদান্ত উপনিষদেরই শেষাংশ।

বৌদ্ধদিগের 'নির্বাণ'ও একই প্রেরণা থেকে উৎসারিত। বৌদ্ধেরা ছিল জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী; তারা তাই মনে করতো কর্মফলেই বারে বারে তাদের জন্মগ্রহণ করতে হয়। জন্ম এক অভিশাপ বিশেষ। জন্ম থেকে মুক্তি পেতে হলে তার একমাত্র পথ হচ্ছে: কোনোরূপ কর্মে জড়িত না হয়ে চুপচাপ জীবনটাকে কাটিয়ে দেওয়া। বৌদ্ধরা তাই ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দ্বারে দ্বারে নির্বাক আবেদন জানিয়ে জীবন ধারণ করতো, জীবন-সংগ্রাম থেকে এইরূপে দূরে সরে গিয়ে 'নির্বাণে'র জন্য প্রস্তুত হতো। এখানেও একই জীবন-বিমুখিতা ক্রিয়া করছে। মানুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা ব্যক্তিত্ব এখানেও অস্বীকৃত হয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে: হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনেও জীবন জগৎ এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে প্লেটোর অনুরূপ কথাই বলা হয়েছে। মানবাত্মার চিরমৃত্যুর বাণীই তাঁরা ঘোষণা করে গেছেন। জীবন থেকে কি করে মুক্তি বা মোক্ষ লাভ করা যায়,—এই ছিল তাঁদের প্রধান চিন্তা। এর ফলে মানুষ নিষ্ক্রিয় উদাসীন ও সন্ন্যাসী সেজেছে, জীবন-সংগ্রামে তাঁরা নামেনি, জীবনকে পূর্ণরূপে কেউ উপভোগ করেনি। জীবনের এই অস্বীকৃতি (negation of life) জগতের প্রগতির পথে তাই দারুণ বাধার সৃষ্টি করেছে। মানবতার [illegible] এক অভিশাপের যুগ।

এই অভিশাপ থেকে মুক্তি দিল ইসলাম। মহানবী মুহম্মদ আনলেন আল্লাহ্‌র পাক-কালাম; শুনালেন জগদ্বাসীকে: আল্লাহ্ তো সত্য বটেই, এ জগতও মিথ্যা নয়। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাবেনা বা আল্লাহ্‌তে লয়প্রাপ্তিও মানুষের শেষ পরিণতি নয়। মৃত্যুর পরেও মানুষ অনন্ত জীবনে বেঁচে থাকবে; তার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আছে, নিজস্ব স্বাধীন সত্বা আছে। এই জগৎ 'মায়া' বা 'মরীচিকা' নয়; জগতও সত্য, তবে পূর্ণ সত্য নয়; ইহজগতের সঙ্গে পরজগৎ মিলালে তবেই পূর্ণ সত্য পাওয়া যাবে। এ জগৎ কর্মক্ষেত্র; বীরের মতো এখানে সব বাধাবিঘ্ন জয় করে আপন লক্ষ্যের পানে অগ্রসর হতে হবে; এই জীবনের সুকর্ম বিফলে যাবে না; এর ফল পরকালে আমরা পাবো। ইসলাম তাই ইহকাল ও পরকাল—উভয় জগতের সত্যতার কথা ঘোষণা করেছে; দুই-জগতের সম্পদই ভোগ করবার তাকিদ সে দিচ্ছে। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্, মানুষ ও জগতের এই পারস্পরিক সম্বন্ধ চিন্তা-জগতে নিয়ে এলো এক দারুণ বিপ্লব। মানুষ মৃত্যু থেকে জীবন ও জগতের দিকে ফিরে তাকালো; জীবনের প্রতি অনুরাগ এলো, বেঁচে থাকার আগ্রহ এলো, জীবন-যুদ্ধে বীরের মতো অগ্রসর হবার প্রবৃত্তি এলো।

ইসলাম তাই আনলো এক নূতন জীবন-দর্শন।

কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয়, রসুলুল্লাহ্‌র ইন্তিকালের ৩।৪ শতাব্দীর মধ্যেই মুসলমানদের জীবনেও বিভ্রান্তি দেখা দিল। অত্যধিক গ্রীক দর্শন আলোচনার ফলে এবং পারশ্য ও ভারতের আর্য-দর্শনের সংঘাতে মুসলমানদের মধ্যেও একদল মরমপন্থীর আবির্ভাব হলো। 'জন্নুন মিসরী' 'বায়েজিদ বুস্তামী' ও অন্যান্য সাধকেরা শীঘ্রই একটা নূতন মতবাদ খাড়া করলেন। তার নাম দিলেন সূফীবাদ। সূফীবাদ মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদেরই অনুরূপ। এ জগৎ মিথ্যা, জীবন মিথ্যা, একমাত্র আল্লাহ্‌ই সত্য; দুনিয়াদারী বর্জন করে আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিশে যাওয়াই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য—সূফীরাও এই সব কথা বললেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে স্পেন দেশীয় ইবনে আরাবী এই সুফীবাদের একটা বিশিষ্ট দার্শনিক রূপ দান করলেন। এর নাম হলো 'ওয়াহাদাতুল-অজুদ' (Sufistic pantheism)। প্লেটোর মায়াবাদ

অপেক্ষা ভারতীয় অদ্বৈতবাদের সঙ্গেই সূফীবাদের বেশী মিল দেখা গেল। প্লেটোর মায়াবাদ এবং বেদান্তের অদ্বৈতবাদে কিছুটা পার্থক্য আছে। নির্গুণ ব্রহ্মের একত্ব উভয় মতবাদেই স্বীকৃত; তবে দুজনের ব্যাখ্যা দু'রকম। জগতের অনিত্যতা এবং ব্রহ্মের নিত্যতা প্রমাণ করতে হলে দু'রকমে তা করা যায়। হয় জগতের সব কিছুই মায়া-মরীচিকা বলে উড়িয়ে দিতে হয়; না হয়তো জগতও ব্রহ্মময়—এই কথা বলতে হয়। বেদান্ত দর্শন শেষোক্ত পন্থা অবলম্বন করে। জগতের সবকিছুই ব্রহ্মময়, অন্য কথায় সবকিছুই ঈশ্বরের অংশ, এই কথা বলে সে ব্রহ্মের একত্ব রক্ষা করেছে। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, মানুষ-গরু, পশুপক্ষী, পাহাড়-পর্বত সবকিছুই সেই ব্রহ্মেরই খণ্ড-রূপ; সমস্ত খণ্ডকে মিলিয়েই সেই পরম-এক—পরমব্রহ্ম। এই সর্বব্রহ্ম-বাদই অদ্বৈতবাদ (Unitysm)। নবম শতাব্দীর সমকালে শঙ্করাচার্য এই অদ্বৈতবাদকে একটা বিশিষ্ট দার্শনিক মতবাদ রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ইসলামী সূফীবাদ এই অদ্বৈতবাদেরই অনুরূপ। শঙ্করাচার্য বললেন 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (আমিই ব্রহ্ম); মনসুর হাল্লাজও ঠিক তেমনি বললেন: 'আনাল-হক' (আমিই আল্লাহ্)। মোটকথা আল্লাহ্‌তে লয়প্রাপ্তি বা আল্লাহ্‌তে মিশে যাওয়াই হলো সূফীবাদের সার কথা।

পারশ্যের অমর কবি হাফিজ তাঁর অপূর্ব কাব্য-মাধুর্যের মধ্য দিয়ে এই সূফী মতবাদকে আরও জনপ্রিয় করে তুললেন। অলস নিষ্ক্রিয় খোদা-প্রেমই হলো সূফীদের প্রধান উপজীব্য।

বলা বাহুল্য, ইসলামে এখনও এই সূফী মতবাদ একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীতে মুজাদ্দিদ আলফ্-সানি এসে ইবনে-আরাবীর এই মতবাদকে খণ্ডন করলেন এবং বললেন যে, আল্লাহ্‌র সঙ্গে একাত্মবোধ সাধনার চরম স্তর নয়। এর পরও আরও দুটি স্তর রয়েছে। শেষ স্তরে উঠলে দেখা যাবে: স্রষ্টা ও সৃষ্টি এক নয়। কিন্তু এ হলো ধর্ম বা শরীয়তের দিক দিয়ে সংস্কার; দর্শনের দিক দিয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এই প্যানথিজমকে খণ্ডন করার গৌরব সঞ্চিত হয়ে ছিল দার্শনিক-কবি ইকবালের জন্য।

ইকবাল যখন দর্শনের ছাত্র হয়ে ইউরোপে গেলেন, তখন মানবাত্মার

এই গুরুলাঞ্ছনায় তিনি ব্যথিত হলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দর্শনের সঙ্গেই তিনি নিজকে নিবিড়ভাবে পরিচিত করলেন। তারপর ঘোষণা করলেন, শুধু যে সেই পরম সত্তা (Absolute Idea)ই সত্য আর জগৎ মিথ্যা, এ কথা মিথ্যা। এ জগতও সত্য। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘোষণা করলেন আত্মার অবিনশ্বরতা ও অমরতা। ইকবালের এই দর্শনের নাম আত্মার দর্শন (egoism) বা খুদীবাদ। মানুষের আত্মা যে জলবিম্বের মতো পর-মাত্মায় মিলিয়ে যাবে না, তার যে ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য আছে, মৃত্যুর পরেও যে সে অনন্তকাল বেঁচে থাকবে—এই কথা ইকবাল উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন। তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ মানুষকে অসীম শক্তি ও অনন্ত সম্ভাবনা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন; সাধনা দ্বারা সেই শক্তি ও সম্ভাবনাকে পূর্ণ জাগরিত করে তুললে এই মানুষই আল্লাহ্র খলিফার গৌরবময় আসন লাভ করতে পারে। এই পূর্ণ মানুষকে ইকবাল Superman না বলে বললেনঃ 'মরদ-ই-মুমিন' বা 'ইনসান-ই-কামিল'। ইকবালের দর্শন তাই বলিষ্ঠ জীবনের দর্শন তাঁর "'আসরার-ই-খুদী'তে তিনি এই নূতন দর্শনকে অভিনব কাব্যরূপ দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ 'খুদী' বা ব্যক্তিত্বের বিকাশই জীবনের সারকথা। ব্যক্তিত্বকে যে যতোখানি বিকশিত বা শক্তিশালী করতে পেরেছে, সৃষ্টিতে সে ততোখানি স্থিতিবান হয়েছে এবং ততো পরিমাণে তার মূল্যমান বেড়েছে। এই ব্যক্তিত্বের বিকাশ প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্যেও চলেছে। প্রতিটি পরমাণু শক্তির প্রার্থী। প্রত্যেকেই বলতে চায় 'আমি আছি'। ইকবাল তাই বলছেনঃ

"Only that truly exists which can say: 'I am.' It is the degree of the intuition of 'I-am-ness' that determines the place of a thing in the scale of being."

অর্থাৎঃ "সে-ই সত্যিকারভাবে বেঁচে থাকে—যে বলতে পারেঃ 'আমি আছি'। এই 'আমি আছি'—চেতনার কমবেশীতেই প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্ব পরিমিত হয়।"

পর্বত ও ধুলিকণার দৃষ্টান্ত দিয়ে ইকবাল এই সত্যকে সুন্দররূপে ফুটিয়ে তুলেছেনঃ

"পর্বত যখন ব্যক্তিত্বকে হারায়
তখন সে ধূলিতে পরিণত হয়;
এবং সাগর তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।
পৃথিবী আত্মশক্তিতে অধিষ্ঠিত,
কাজেই বন্দী চাঁদ চিরকাল তারি চারিপাশে ঘোরে।
পৃথিবীর চেয়ে সূর্য অধিকতর বলবান
তাই তো পৃথিবী সূর্যের দৃষ্টিতে সম্মোহিত।"

অন্যত্র ইকবাল কী সুন্দরই না বলেছেন:

"একটা তরঙ্গ সমুদ্রের উপর দিয়ে বয়ে গেল
আর বলে গেল: চললে আমি আছি,
না চললে আমি নেই।"

ইকবাল-দর্শন তাই আত্মশক্তির দর্শন; খুদীকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলবার দর্শন। তাঁর মতে আত্মার মৃত্যু নাই। অনন্তের পথে তার জয়-যাত্রা। আল্লাহ্‌র মধ্যে সে বিলীন হয়ে যাবে না। পাপই করুক আর পুণ্যই করুক, মানবাত্মা অমর। যাঁরা পুণ্যবান তাঁরা তো বেহেশতে গিয়ে অনন্তকাল তথায় বাস করবেনই, যারা পাপী, যারা দোজখী, তাদেরও তিনি নিশ্চিহ্ন করে পুড়িয়ে মারবেন না, তারাও চিরকাল বেঁচে থাকবে। বেহেশ্‌তীদের সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ বলেছেন:

"উলায়িকা আস্‌হাবুল জান্নাত ওয়াহুম ফিহা খালেদুন"
(বেহেশ্‌ত-বাসীরা তথায় চিরকাল বাস করবে।)

আবার দোজখ-বাসীদের সম্বন্ধেও তিনি বলেছেন:—

"উলায়িকা আসহাবুন্‌-নার ওয়াহুম ফিহা খালেদুন"
(দোজখ-বাসীরা চিরদিন দোজখে বাস করবে।)

আত্মার এই অবিনশ্বরতা এবং তার পূর্ণবিকাশের কথাই ইকবাল-দর্শনের সার কথা। তিনি বলেন: 'খুদী' (Self বা Ego)-ই হচ্ছে স্বষ্টির [illegible] প্রত্যেক বস্তুরই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। মানুষ মরতে পারে না। তার আ[illegible] [illegible]। আর সে আত্মা আল্লাহ্‌র দান।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ্ মানুষের স্বাধীন সত্তাকে নষ্ট করবেন না। মানবাত্মা আল্লাহ্‌র মধ্যে লয়প্রাপ্তও হবে না, বা ধ্বংসপ্রাপ্তও হবে না, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে চিরদিন সে বেঁচে থাকবে এবং আধ্যাত্মিক জগতে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হবে। যারা দোজখী, তাদের আত্মার সংস্কার বা সংশোধন শেষ হলে তারাও পুণ্য-জীবনে ফিরে আসবে এবং পুণ্যবানদের মতোই অমরতা লাভ করবে।

আল্লাহর ভিতরে লয়প্রাপ্তি (ফানা-ফিল্লাহ্) তাই ইসলামী জীবন-দর্শন নয়, আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে মানুষ চিরদিন বাস করবে (বাকা-বিল্লাহ্)—এই হলো তার নিয়তি। বস্তুতঃ মানুষের পরিণতি সম্বন্ধে ইসলাম সম্পূর্ণ এক নূতন বাণী দিয়েছে। আল্লাহ্ আমাদের স্রষ্টা বটে; কিন্তু একবার যেই তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি আমাদের কাউকে মেরে ফেলতে চান না, যেমন করেই হোক সবাইকে বাঁচিয়ে রাখতে চান।

এই পরিস্থিতিতে মানব-জীবনের লক্ষ্য কী হওয়া উচিত? তার লক্ষ্য হওয়া উচিত: নিজের আত্মাকে তুচ্ছ মনে না করা এবং আপন খুদীকে শক্তিশালী করে আল্লাহর খেলাফৎ লাভ করা। আল্লাহ্ই হচ্ছেন সকল শক্তি, সকল জ্ঞান ও হিকমতের আধার; কাজেই তাঁর সঙ্গে যোগ রেখে তাঁর নির্দেশিত পথে চলে তাঁর কাছে থেকে আমাদের শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। খুদীর বিকাশ ও পরিপুষ্টি তাই আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও অনুরাগ থেকেই আসবে; তাঁর থেকে দূরে থেকে নয়। যে-নদী মহাসমুদ্রের সঙ্গে যোগ রাখে, সে-ই বেগবতী হয়; যার সে সমুদ্র-সংযোগ নেই, সে শুকিয়ে যায়। এই নৈকট্য ও সংযোগ-সাধনের কথা একটি হাদিসে সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে: 'তাখাল্লাকু বি-আখ্‌লাকিল্লাহ্' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র গুণাবলীর অনুসরণ করো। আল্লাহ্‌র গুণাবলীর অনুসরণের অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ্‌র মধ্যে বিলীন হয়ে যাও; বরং তার উল্টো—আল্লাহ্‌কেই নিজের মধ্যে শোষণ করো। অন্য কথায়: আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হও। ইকবাল তাই একস্থানে বলেছেন। Instead of absorbing yourself unto God, absorb God unto yourself" অর্থাৎ: আল্লাহ্‌র মধ্যে নিজেকে বিলীন করে না দিয়ে, নিজের মধ্যেই আল্লাহ্‌কে শোষণ করে নাও। কথাটি

তাৎপর্যপূর্ণ। একটি প্রবাদ রয়েছে যে, শিশু মুহম্মদ যখন বিবি হালিমার তত্ত্বাবধানে ছিলেন, তখন একদিন তিনি হারিয়ে যান। বিবি হালিমা অধীর হয়ে নানা দিকে হযরতকে খুঁজতে থাকেন। তখন জিব্রাইল ফিরিশতা হালিমাকে দেখা দিয়ে বলেন: "অধীর হয়ো না, মুহম্মদ জগতে হারিয়ে যাবে না। বরং জতগই তার মধ্যে একদিন হারিয়ে যাবে।

এই সব উক্তির মধ্যে খুদীর স্বাতন্ত্র্য ও অপরিসীম শক্তির কথাই অভিব্যক্ত হয়েছে। আল্লাহ্‌র অনুগত থাকবো, তাঁর সঙ্গে সংযোগ রাখবো, তাঁর নির্দেশ মানবো, কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্ব বা আমিত্বকে বিসর্জন দেবো না। ইকবাল তাই বলেছেন:

"নিজেকে ছেড়ে আল্লাহ্‌র কাছে ছুটে যাও
তাঁর কাছ থেকে শক্তি নিয়ে
আবার নিজের মধ্যে ফিরে এসো
এবং 'লাৎ' ও 'ওজ্জার' মাথা ভাঙো ।

—(আসরার-ই-খুদী)

এখানে রসুলুল্লাহ্‌র মিরাজের প্রতি ইংগিত আছে। মিরাজ রাত্রে রসুলুল্লাহ্ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করেও তাঁর মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেননি। সেখান থেকে প্রচুর শক্তি নিয়ে তিনি আবার জগতে ফিরে এসেছিলেন এবং অধিকতর বিপুল বেগে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

আমাদেরও ঠিক এই পথেই চলতে হবে। আল্লাহ্‌র সঙ্গে সহযোগিতাও করবো, স্বাতন্ত্র্যও বজায় রাখবো। এ স্বাতন্ত্র্য প্রেমে মধুর হবে, আনুগত্যে মহীয়ান হবে। সম্রাটের রাজপ্রতিনিধি হতে হলে তাঁর বিদ্রোহী হয়েও [illegible] হওয়া যায় না, আবার আত্মশক্তিবর্জিত অপদার্থ 'কলের পুতুল' হয়েও [illegible] হওয়া যায় না। শক্তিতে তাঁকে সম্রাটের কাছাকাছিই থাকতে হয়, আবার সহযোগিতা ও আনুগত্যও তাঁকে রাখতে হয়। এই যে রাজ-প্রতিনিধির মর্যাদা, এই মর্যাদাই আল্লাহ্ মানুষের জন্য সঞ্চিত করে রেখেছেন। ইকবাল তাই বলেছেন:

'[illegible]তাই মধুর এই নিখিল বিশ্বে
আল্লাহ্‌র খেলাফতি করা
আর [illegible]বর্তী বস্তুর উপর প্রভুত্ব করা।

ইকবালের দর্শন তাই মানবাত্মার জয়ঘোষণার দর্শন। উপেক্ষিত নিগৃহীত বন্দী আত্মার এ এক মহামুক্তির বাণী। এত বড় আশার বাণী আর কোনো কবি এত সুন্দর ও বলিষ্ঠভাবে মানুষকে শুনায় নি। মানুষের জন্য ইকবাল এক মহা সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছেন। মানুষ তার 'খুদী'র শক্তিকে পূর্ণ-পরিস্ফুট করলে তখন আর তার তক্‌দীর্‌ আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন থাকে না। সে নিজেই তার তক্‌দীর্‌ গড়ে নিতে পারে। এ সম্বন্ধে ইকবাল কী সুন্দরভাবেই না বলেছেন:—

"খুদীকো কর্‌ বুলন্দ্‌ এ্যায়ছা কে হর্‌ তকদীর-সে পহ্‌লে
খোদা বান্দেসে খোদ পুঁছে বাতা তেরি রেজা কিয়া হ্যয়।"

অর্থাৎ: আত্মশক্তিকে এমন জাগিয়ে তোলো যে, খোদা তোমার ভাগ্যলিপি লিখবার আগে নিজেই তোমাকে জিজ্ঞাসা করেন: "বলো, তোমার ভাগ্যে কী লিখবো।

এই শক্তিমান পুরুষ-সিংহকেই ইকবাল বলেছেন: 'মরদে-মুমিন' বা 'ইনসান-ই-কামিল'। এই 'মরদ-ই-মুমিন'দের সম্বন্ধে ইকবাল এক অদ্ভুত মর্যাদা কল্পনা করেছেন। আল্লাহ্‌ এঁদের গুণগরিমায় মুগ্ধ হয়ে ফিরিশ্‌তাদিগকে ডেকে যেন আক্ষেপের সুরে বলেন: "হায়, এদের কেন আমি মরণশীল মানবরূপে সৃষ্টি করেছিলাম!"

কাব্যের সাথে দর্শন কী সুন্দরই না মিশেছে।

ইকবালের এই খুদীবাদ তাঁর 'আস্‌রারে-খুদীতে' চমৎকার বিধৃত হয়েছে। অবশ্য তাঁর সম্পূর্ণ দর্শন 'আসরারে-খুদীতে' পাওয়া যাবে না; 'আসরারে-খুদীর' সঙ্গে 'রমুয-ই-বেখুদী' মিলিয়ে পড়লে তবে তাঁর এই নূতন দর্শনের পূর্ণরূপ মিলবে। 'আসরারে-খুদীতে' আছে আত্ম-বিকাশের দর্শন: "রমুয-ই-বেখুদীতে" আছে আত্ম-ত্যাগের দর্শন। ইকবাল প্রতিটি আত্মার পরিস্ফূরণ চেয়েছেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর সমাজ বা মানব-কল্যাণের জন্য আত্মবিসর্জন দিতেও বলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন: মানুষের দুটো সত্ত্বা আছে: এক তার ব্যক্তি-সত্ত্বা, (Individual I) দুই: তার সমাজ-সত্ত্বা (National I). প্রথম সত্ত্বা অর্থাৎ আমিত্বকে বলিষ্ঠ করলেই চলবে না, দ্বিতীয় আমিত্বকেও বলিষ্ঠ করতে হবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে : আল্লাহ্, মানুষ এবং জগতের মধ্যে কার কি সম্বন্ধ এবং কার কি কর্তব্য, তা ইকবাল সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। জগতজোড়া মহামৃত্যুর ক্রন্দনের মধ্যে তিনি শুনিয়েছেন অমর জীবনের গান ; নিরাশার অন্ধকারে তিনি ফুটিয়েছেন নবপ্রভাতের রক্তরাগ। এতদিন পরে মানুষ নিশ্চিত মৃত্যুর দিক থেকে মহাজীবনের দিকে ফিরে তাকালো, এই অবজ্ঞাত জীবন ও জগতের প্রতি তার মমত্ব ও আকর্ষণ এলো ; নুতন মূল্যবোধ নিয়ে সে বিপুল উদ্যমে সম্মুখের দিকে এগিয়ে চললো।

রবীন্দ্রনাথ

এইবার রবীন্দ্রনাথের কাব্য-দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্।

রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ বেদান্ত-দর্শন বা উপনিষদের বাণীকেই তাঁর কাব্য ও গানে নানাভাবে রূপ দিয়েছেন। ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা এবং তাঁর সঙ্গে মিশে যাওয়াই তাঁর চিন্তার প্রধান লক্ষ্য। তাঁর স্বতন্ত্র কোনো সত্তা নেই ; স্বাধীন ব্যক্তিত্ব নেই ; পরম প্রভুর সঙ্গে মিলনের অতৃপ্ত কামনা নিয়েই তিনি ছুটে চলেছেন। বিশ্বজোড়া অনিত্যতার মধ্যে তিনি নিত্যকে খুঁজে ফিরছেন ; বিশ্বপ্রকৃতির সবকিছুতে তিনি তাঁর সেই 'মানস-সুন্দরী'কেই দেখতে পাচ্ছেন এবং তার সঙ্গে মিলনের জন্যই তাঁর প্রাণ অধীর চঞ্চল হয়ে উঠেছে। পারশ্য-কবি হাফিজ যেমন তাঁর সমস্ত কাব্যে আশিক-মাশুকের প্রেম ও বিরহের কথাই ব্যক্ত করেছেন, রবীন্দ্রনাথও ঠিক তেমনি করে তাঁর প্রিয়তমের প্রতি প্রেম নিবেদন করেছেন এবং তাঁর মধ্যেই নিজেকে বিলিয়ে দিতে চেয়েছেন। যুগসঞ্চিত সংস্কার বা ধর্মবিশ্বাসকে অতিক্রম করে তিনি ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি ; সেই অদ্বৈতবাদের বেড়াজালেই তাঁর চিন্তা ও কল্পনা সীমিত হয়ে আছে। যে সব মৌলিক চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা দিয়ে মানবতার ইতিহাস রচিত হচ্ছে, সেখানে তিনি কোনো নূতন দান দিতে পারেন নি। এক কথায় বলা যায় : মায়াবাদ, সূফীবাদ এবং অদ্বৈতবাদের সুরই তাঁর কাব্যে ও সঙ্গীতে ঝঙ্কৃত হয়েছে। কোনো কোনো স্থানে তাঁর

অদ্বৈতবাদ বা প্রতীকবাদ আঁধার-যুগের প্যাগানিজমের এলাকায় গিয়ে পৌঁছেচে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই পাঠক একথার সত্যতা বুঝবেন:—

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ-ধূলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।।

নিজেরে করিতে গৌরব দান
নিজেরে কেবলি করি অপমান
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে।।

আমারে যেন না করি প্রচার
আমার আপন কাজে
তোমারি ইচ্ছা করহে পূর্ণ
আমার জীবন মাঝে।

যাচি হে তোমার চরম শান্তি
পরাণে তোমার পরম কান্তি
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও
হৃদয়-পদ্ম-দলে।।"

—(গীতাঞ্জলি)

এখানে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ আত্মবিলুপ্তি কামনা করছেন। গীতার ভাষায় 'ভগবানে কর্মসমর্পণ' করে তিনি শুধু তাঁর হাতের ক্রীড়নক হতে চাচ্ছেন। আপন কাজের মধ্যে কিছুতেই তিনি নিজকে ধরা দিতে চান না; ভগবানের মধ্যে আত্মগোপন করতে চান। তাই তিনি বলছেন: আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও হৃদয়-পদ্মদলে।

ভগবানের সঙ্গে সব 'ভেদ' মিটিয়ে দিয়ে কবি 'এক' হতে চান:

"আজি যেন ভেদ নাহি রয়
আপনা পরে।

আমায় যেন এক দেখি হে
বাহিরে ঘরে।।"
—(গীতাঞ্জলি)

'আকাশ-ধরার' সব কিছুই যে ব্রহ্মময়, এই প্যানথিষ্টিক আইডিয়া নিম্নের কবিতায় বিদ্যমান:

"তুমি আমার আপন
তুমি আছো আমার কাছে
এই কথাটি বল্‌তে দাও গো বল্‌তে দাও।
এই নিখিল আকাশ ধরা
এযে তোমায় দিয়ে ভরা
আমার হৃদয় হতে এই কথাটি
বল্‌তে দাও গো বল্‌তে দাও।।"
—(ঐ)

রবীন্দ্রনাথ তাই মনে করেন মানুষের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য কিছু নাই। ভগবান যা করান তাই সে করে, মানুষের মধ্যে স্বয়ং ভগবান আসিয়াই 'লীলা' করেন:

"হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ-প্রাণ।
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।।
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান।।
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে।
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।।"
—(ঐ)

"আমার মাঝে তোমার লীলা হবে।
তাই তো আমি এসেছি এই ভবে।।

সব বাসনা যাবে আমার থেমে
মিলে গিয়ে তোমারি এক প্রেমে
দুঃখ-সুখের বিচিত্র জীবনে
তুমি ছাড়া আর কিছু না রবে।"

—(গীতাঞ্জলি)

এই ভাবধারাই নিম্নের গানগুলিতে নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছেঃ

"আমার আমি ধুয়ে মুছে
তোমার মধ্যে যাবে ঘুচে
তোমার মধ্যে মরণ আমার
মরবে কবে।"

—(ঐ)

"মনকে আমার কায়াকে।
আমি একেবারে মিলিয়ে দিতে
চাই এ কালো ছায়াকে।।
তুমি আমার অনুভাবে
কোথাও নাহি বাধা পাবে
পূর্ণ একা দেবে দেখা
সরিয়ে দিয়ে মায়াকে।
মনকে আমার কায়াকে।।"

—(ঐ)

"নামটা যেদিন ঘুচাবে নাথ
বাঁচবো সেদিন মুক্ত হয়ে।
আপন গড়া স্বপন হ'তে
তোমার মাঝে জনম লয়ে।।
আমার এ নাম যাক না চুকে
তোমারি নাম নেব সুখে
সবার সঙ্গে মিলব সেদিন
বিনা-নামের পরিচয়ে।।"

—(ঐ)

"আমারে নিখিল ভুবন দেখছে চেয়ে
রাত্রি দিবা।
আমি কি জানিনে এর অর্থ কিবা।
তারা যে জানে আমার চিত্তকোষে
অমৃতরূপ আছে বসে গো
তারেই প্রকাশ করি আপনি মরি
তবেই আমার দুঃখ মেটে॥"

—(গীতিমাল্য)

"তোমায়-আমায় মিলন হবে বলে
আলোয় আকাশ ভরা।
তোমায়-আমায় মিলন হবে বলে
ফুল্ল-শ্যামল ধরা॥
তোমায়-আমায় মিলন হবে বলে
যুগে যুগে বিশ্বভুবন তলে
পরাণ আমার বধূর বেশে চলে
চিরস্বয়ম্বরা॥

(ঐ)

সন্ন্যাস বা সংগ্রাম-বিমুখতাই যে কবির কাম্য, সে কথা তিনি পরিষ্কার ভাবে বলেছেন। কর্মের অভিশাপ থেকে তিনি তাই ভগবানের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছেন:

"রক্ষা করো হে।
আমার কর্ম হইতে আমায় রক্ষা করো হে॥
আপন ছায়া আতঙ্কে মোরে করিছে কম্পিত হে
আপন চিন্তা গ্রাসিছে, আমায় রক্ষা করো হে॥
প্রতিদিন আমি আপনি রচিয়া জড়াই মিথ্যা জালে
ছলনা-ডোর হইতে মোরে রক্ষা করো হে॥"

—(ধর্মসঙ্গীত)

নিম্নের গানটিতে রবীন্দ্রনাথের মায়াবাদ ও চিরনির্বাণের সুর শোনা যাবে :

"যা হবার তাই হোক
ঘুচে যাক সর্ব লোক
সর্বমরীচিকা।
নিবে যাক্ চিরদিন
পরিশ্রান্ত পরিক্ষীণ
মর্ত্যজন্মশিখা ॥
সব তর্ক হোক শেষ
সব রাগ সব দ্বেষ
সকল বালাই
বলো শান্তি বলো শান্তি
দেহ সাথে সব ক্লান্তি
পুড়ে হোক্ ছাই ॥

—(চিত্রা)

এইসব কবিতা ও গানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবন-দেবতার' মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে বিসর্জন দিতে চেয়েছেন। আমাকে আমি যেন প্রচার না করি, আমাকে তুমি আড়াল করে দাঁড়াও, তোমাতে-আমাতে কোনো ভেদ যেন আর না রয়, এই নিখিল আকাশ ধরা—সকলই তুমি-ময়; সকলই তোমায়-দিয়ে-ভরা, আমার মধ্যে তুমিই বসে লীলা করছো; এই লীলা শেষে আমি যখন তোমার সাথে মিলবো, তখন তুমি ছাড়া আর কিছুই রবে না; তোমার মধ্যেই আমি চিরমৃত্যু মরতে চাই; আমার এই কালো ছায়াকে তোমার কায়াতে মিশিয়ে দিতে চাই; তোমার মাঝে আমার . নাম ও সত্তা বিসর্জন দিয়ে চেনা-নামের পরিচয়ে আমি পরিচিত হতে চাই—এই ধরনের বৈষ্ণব সুলভ প্রেম ভাব ও অনুভূতিই রবীন্দ্র কাব্যের সারকথা।

রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা ও গানে আদিমযুগের প্রকৃতিবাদ বা প্যাগানি-

জমের ছাপও রয়েছে। প্রকৃতিতে তিনি দেবত্ব আরোপ করেছেন। এতে তাঁর অনুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টির স্থূলতাই প্রমাণিত হয়েছে। দু' একটি দৃষ্টান্ত দেখুন:

শরত ঋতুকে কবি শারদ-লক্ষ্মীরূপে বন্দনা করছেন:

"এসো গো শারদ লক্ষ্মী, তোমার
শুভ্র মেঘের রথে
এসো নির্মল নীল পথে
এসো ধৌত শ্যামল আলো ঝলমল
বনগিরিপর্বতে।

—(গীতাঞ্জলি)

শরতকালে বাংলা দেশকে তিনি 'জননী' রূপে দেখেছেন:

আজিকে তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে
হে মাতঃ বঙ্গ শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।
পারে না বহিতে নদী জলধার
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর
ডাকিছে দোয়েল গাহিছে কোয়েল
তোমার কানন-সভাতে।
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী
শরত কালের প্রভাতে।

—(শরতে বঙ্গ)

কবি আকাশে কৃষ্ণমেঘ দেখে শ্রীকৃষ্ণকে কল্পনা করছেন:

ওগো সাঁওতালী ছেলে
শ্যামল সজল নব-বরষার কিশোর দূত কি এলে।
ধানের ক্ষেতের পারে শালের ছায়ার ধারে
বাঁশীর সুরেতে সুদূর দূরেতে দিয়েছো হৃদয় মেলে।।

পূব-দিগন্ত দিল তব দেহে নীলিমলেখা;
পীত ধড়াটিতে অরুণরেখা.
কেয়াফুলখানি কবে তুলে আনি
দ্বারে মোর রেখে গেলে ।।
আমার গানের হংসবলাকাপাতি
বাদল-দিনের তোমার মনের সাথি।
ঝড়ে চঞ্চল তমালবনের প্রাণে
তোমাতে আমাতে মিলিয়াছি একখানে.
মেঘের ছায়ায় চলিয়াছি ছায়া ফেলে ।।
—(বর্ষা)

তা হলে একথা আমরা অনায়াসে বলতে পারি যে, প্লেটোর মায়াবাদ, বুদ্ধের নির্বাণবাদ, শঙ্করের অদ্বৈতবাদ, ইব্‌নে আরাবীর সূফীবাদ, আদিম যুগের প্যাগানবাদ বা প্রতীকবাদ—সকলেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায় রবীন্দ্র-কাব্যের মধ্যে। বলিষ্ঠ আত্মপ্রতিষ্ঠার বাণী, গতির বাণী, মৃত্যুকে জয় করে অনন্ত জীবনে বেঁচে থাকবার বাণী, মানবাত্মার অপরিসীম শক্তি ও সম্ভাবনার বাণী, মানবের গৌরবোজ্জ্বল পরজীবনের বাণী, সমগ্র স্বষ্টির মধ্যে তার শ্রেষ্ঠত্বের বাণী, তার স্বষ্টিধর্মী প্রতিভার বাণী—রবীন্দ্রকাব্যে বিরল। মান-অভিমান, বিনয়, বৈষ্ণব-সুলব প্রেমনিবেদন এবং বিশ্বপ্রকৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে তাঁর মানস-সুন্দরীর অনুভব ও লীলাদর্শন—এই সবই রবীন্দ্রকাব্যের বৈশিষ্ট্য। তাঁর 'গীতাঞ্জলি,' 'নৈবেদ্য', 'সোনারতরী', 'পূরবী' এবং সমস্ত ধর্মসঙ্গীতের মধ্যে মাত্র একটি বিশেষ সুরই ধ্বনিত হয়েছে, সেটি হলো আত্মবিসর্জনের সুর,—'খসে যাবার ঝরে যাবার সুর।' বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ গতির কবি নন—বিরতির কবি।

অতএব বলা যেতে পারে, রবীন্দ্র-কাব্যের যে প্রেরণা ও দর্শন, তা মধ্যযুগীয়; প্রগতিশীল বিশ্বমানুষের কাছে তার বিশেষ কোনো আবেদন নেই। আমরা অমন করে মরে যেতে চাই না, ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চিরদিন বেঁচে থাকতে চাই; গ্রহে-গ্রহে লোকে লোকে প্রভুত্ব করতে চাই; আল্লাহ্‌র খলিফা

হয়ে আল্লাহ্‌র রাজ্য শাসন করতে চাই। যে কারণে ইকবাল প্লেটো বা হাফিজকে আমল দেন নি, ঠিক সেই কারণে আমরা রবীন্দ্রকাব্যকেও আমল দিতে পারি না। রবীন্দ্রকাব্যও আমাদের মনে এনে দেয় প্রশান্তির মনোভাব। যে নূতন নভোভ্রমণের যুগ এলো, নবসৃষ্টি ও নবসম্ভাবনার যুগ এলো, সেযুগের কবি রবীন্দ্রনাথ নন। সেযুগের কবি ইকবাল।

আজ পাশ্চাত্য জগৎ যে ইকবাল কাব্যের প্রতি এত অনুরক্ত হয়ে উঠ্‌ছে, তার মূল কারণ রয়েছে এইখানে। বিশ্বমানুষ ইকবালের মধ্যে আজ গতিবাদের নূতন সুর শুনতে পেয়েছে।

ঢাকা
১৯৬০

পূর্ব পাকিস্তানের লেখকদের প্রতি

প্রত্যেক জাতিরই এক একটা লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বা আদর্শ থাকে। সেই আদর্শ অনুসারেই তার রাষ্ট্র ও সমাজ নিয়ন্ত্রিত হয়। কাব্য, সাহিত্য এবং তাহ্‌জিব-তমদ্দুনও সেই আদর্শের অনুসরণ করে। সবাইকে মূলতঃ এই আদর্শ মেনে নিতে হয়। এ সম্বন্ধে আর সবার চাইতে লেখকদের দায়িত্বই বেশী। লেখককে তাই সমাজ সচেতন না হলে চলে না। লেখকরাই জাতিকে প্রগতির পথে নিয়ে যায়, জাতির মনে আশা-আকাঙ্খা জাগায়, নূতন চিন্তা, নূতন স্বপ্ন ও নূতন ধ্যান-ধারণা দেয়।

আমরা এখন এক নূতন রাষ্ট্রের অধিকারী। এ রাষ্ট্রের একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। এই লক্ষ্য ও আদর্শের রূপায়ণই হলো প্রত্যেক পাকিস্তান-বাসীর কর্তব্য। আজ নূতন মন নিয়ে, নূতন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আমাদের সবকিছু বিচার করতে হবে। আগের দিনের যে মূল্যবোধ আমাদের মনে জেগে ছিল, এখন তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিবর্তন করতে হবে। আগে যা ভালো লেগেছে, এখনও তা ভালো কিনা ভেবে দেখতে হবে। আগে যাকে খারাব ভেবেছি এখনও তা খারাব কিনা, তাও আমাদের ভাবতে হবে। অবস্থার পরিবর্তনে এবং লক্ষ্য ও আদর্শের তাকিদে মূল্যবোধের এই পরিবর্তন আদৌ অস্বাভাবিক নয়, অসঙ্গতও নয়; বরং অনেকক্ষেত্রে অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী।

সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে একথা আরও সত্য। পূর্ব পাকিস্তানের লেখক-দের কথাই বলি। প্রাক-পাকিস্তান যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে-ধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল, পাকিস্তান লাভের পরেও কি সেই একই ধারায় আমাদের সাহিত্য বইবে? পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের মূল্যমান ও আদর্শ কি পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্যের মূল্যমান ও আদর্শ দ্বারা নিরূপিত হবে? তা হতে পারে না। আমাদের মনের রং মিলিয়ে আমাদের নিজস্ব খাতে এ'কে এখন প্রবাহিত করতে হবে। স্বাধীন জাতির লক্ষণ ও বিশেষত্বই তো এই। সর্বক্ষেত্রে তার যদি কোনো স্বকীয়তাই না রইলো, তবে তার স্বাধীনতার মূল্য কি?

পূর্ব পাকিস্তানের লেখকদের প্রতি

অনেকে বলবেন: সাহিত্যে ও শিল্পে স্বাধীনতা চাই, নইলে নবসৃষ্টি সম্ভব নয়। একথা কিছুটা সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়। সম্পূর্ণ মুক্তির মধ্যে সৃষ্টি অসম্ভব। প্রত্যেক বস্তুরই একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা বা গণ্ডী আছে। তার মধ্য থেকেই সে তার গুণাবলী প্রকাশ করে। গ্রহতারকার নির্দিষ্ট পথ আছে। খেলার মাঠে নির্দিষ্ট বাউণ্ডারী লাইন আছে। তাতে তো নূতন সৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটে না। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ও তো একটা নৈতিক নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে থেকেই তাঁর নব নব সৃজন-লীলা প্রকাশ করেন। লেখকদেরও যদি সেইরূপ একটা বাউণ্ডারী লাইন থাকে, তাতে ক্ষতি কি? উচ্ছৃঙ্খলার নাম স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতা শৃঙ্খলার সীমাপ্রাচীরে আবদ্ধ।

এতে ক্ষুন্ন হবার বা লজ্জা পাবার কিছু নেই। যাদের অতীত নেই, ঐতিহ্য নেই—তারাই না হয় ক্ষুন্ন হবে। কিন্তু একজন মুসলিম লেখক সেজন্যে ভাববে কেন? তার তো গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে; কাব্যে, সাহিত্যে, কৃষ্টিতে তার তো স্বীকৃতি রয়েছে। কাজেই তাকে যদি অন্যের অনুকরণ না করে তার নিজস্ব পথে চলতে বলা হয়; নিজের ঘরের মাল-মসলা দিয়ে তাকে যদি নূতন সৃষ্টির তাকিদ দেওয়া হয়, তবে তার ভাববার কিছুই থাকে না। অন্ধ অনুরাগ অথা দাসমনোভাবে তার মন নিতান্ত আচ্ছন্ন না হলে যুগের এই দাওয়াৎ সে কিছুতেই অস্বীকার করবে না।

নিতান্ত দুঃখের বিষয় আমাদের লেখকদের অনেকের মধ্যেই একটা হীনমন্যতা দেখা দিয়েছে। তাঁরা অন্ধভাবে অন্যদের অনুকরণে সাহিত্য সৃষ্টি করতে চান। আত্মশক্তির অভাব, আত্মপ্রত্যয়ের অভাব, পরানুকরণ-প্রিয়তা এবং রুচিবিকৃতিই এর প্রধান কারণ। কোনো সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার এ মানসিকতা থাকবার কথা নয়। জানি, সৃষ্টির পথ সহজ নয়; এ পথে চাই দুঃসাহস সাধনা ও সংগ্রাম। কিন্তু এই কঠিন না-চলা পথে চলাই তো বীরের ধর্ম। চলা-পথে যারা চলে তারা ভীরু। তাদের কাছ থেকে আমরা নূতন কিছু আশা করতে পারি না।

পাকিস্তানী লেখকদেরকে আমি তাই পাকিস্তাবাদ গ্রহণ করতে আহ্বান জানাই। এ পথে গ্লানি নেই; বরং এই পথই একমাত্র গৌরবের। এই

পথেই তাঁদের সাহিত্যি-সাধনা সার্থক হতে পারে। এপারে থেকে ওপারের অনুকরণে যাঁরা সাহিত্য রচনা করবেন, তারা ব্যর্থ হবেন এবং দুই তীরেরই বিদ্রূপ কুড়াবেন। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে সনেট লিখলে বা গান লিখলে, সেটা হাজার ভালো হলেও অনুকরণ বলেই গণ্য হবে। কিন্তু পাকিস্তানের সীমানার মধ্যে আসলেই তার সেই প্রতিভা দিয়ে তিনি একটা কিছু নূতন সৃষ্টি করতে পারবেন। এটা সম্ভব হবে এইজন্যে যে, পাকিস্তানের এখন সংগঠনী যুগ। এখানে বহু শূন্যস্থান (vacuum) রয়েছে; চাহিদাও রয়েছে এবং কাজেকাজেই নব নব সৃষ্টির অবসরও আছে। এখানে কাব্য, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, দর্শন. শিল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস সব ক্ষেত্রেরই দুয়ার খোলা রয়েছে। কাজেই এখানে কৃতিত্ব অর্জন করা অপেক্ষাকৃত সহজ। এখানে মাল-মশলাও প্রচুর। মিলিত বঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের মাল-মশলা হিন্দু-সাহিত্যিকরা কাজে লাগাননি বলে কতোই না আমরা অনুযোগ করেছি। কিন্তু আজ আর তাতে দুঃখ নেই, বরং আনন্দ আছে। পূর্ব পাকিস্তানের লেখকগোষ্ঠি সেই সব মাল-মশলা এখন অনায়াসে কাজে লাগাতে পারবেন। কাজেই আগের যুগের অবজ্ঞা এখন আশীর্বাদে পরিণত হয়েছে। আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের সমাজ-জীবনে কতো হাসি, কতো কান্না, কতো সুখ, কতো দুঃখ, কতো রহস্য, কতো রোমান্স সঞ্চিত হয়ে আছে। অফুরন্ত রূপ ও রহস্য লুকিয়ে আছে পদ্মা, মেঘনা ও কর্ণফুলীর তীরে তীরে। সেই সব উপকরণ দিয়েই আমরা এখন নূতন সাহিত্যি রচনা করবো।

পূর্ব পাকিস্তানের লেখকদিগকে তাই আজ পশ্চিম থেকে মুখ ফিরিয়ে পূর্বাচলের পানে চাইতে হবে। নবসৃষ্টি সম্ভব নয় ততোক্ষণ—যতোক্ষণ শিল্পী অপর কারো সৃষ্টির মায়ায় সম্মোহিত হয়ে থাকে। অভাবের বেদনা এবং প্রয়োজনের তাকিদই নবসৃষ্টির জননী। অভাবের বেদনাবোধ যাদের অন্তরে নেই, তারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। আমার মনে হয়, মূল্যবোধের বিভ্রান্তি এবং রুচি ও রসের বিকৃতিই আমাদের মৌলিক সৃষ্টির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি দরদ তাই আজ নিতান্ত প্রয়োজন। আশ্চর্যের

বিষয়, বাংলা ভাষার যারা প্রথম মুসলিম কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন তাঁদের অন্তরে প্রচুর ঐতিহ্যবোধ ছিল। 'কাসাসুল আম্বিয়া', 'আলেফ-লায়লা', 'জঙ্গনামা', 'গাজীকালু ও চম্পাবতীর কেচ্ছা', 'গোলে বকাওলী', 'শাহনামা', 'লায়লী মজনু', 'শিরী-ফরহাদ', 'ইউসুফ জোলেখা', 'হাতেম তাই', 'ছয়ফুলমুলুক্', 'চাহার দরবেশ', ইত্যাদি অসংখ্য গ্রন্থ তাঁরা রচনা করেছিলেন। তাঁদের সৃষ্টিধর্মী প্রতিভাও ছিল। আগের জামানার সেই সব লেখকদের দানের তুলনায় আমাদের দান কতো ক্ষুদ্র।

বিজাতীয় আদর্শের প্রতি আমাদের অন্ধ অনুরাগ ও সম্মোহনকে অতিক্রম করে আজ আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে। বাংলা সাহিত্যের কল্যাণের জন্যই এই স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজন ঘটেছে। পরের অনুকরণ বা অনুসরণ করে নতুন কিছুই আমরা দিতে পারবো না। বিশেষত্ববর্জিত সৃষ্টির'ও কোনো মূল্য কেউ দেবে না। কাজেই সাহিত্যে যদি কেউ স্থায়ী আসন পেতেই চায়, তবে অনাবিষ্কৃত যে রত্নখনি আমাদের আপন দেশ, আপন ইতিহাসে ও আপন তাহজিব-তমদ্দুনে রয়েছে, তার সন্ধান করতেই হবে। সবিশেষ হলেই তবে আমাদের সাহিত্যের মূল্য বাড়বে।

আমাদের তরুণ লেখকদের কাছে তাই আজ আমার আহ্বান—তাঁরা সুস্থ হউন; আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস করুন; সাধনা করলে পাকিস্তানের মাল-মশলা দিয়েই তাঁরা এমন সাহিত্য রচনা করতে পারবেন--যা বিশ্ব সাহিত্যেব দরবারে অনায়াসে পরিবেশন করা যাবে। আল্লাহ্র ৯৯ নাম নিয়ে **Dr. Arnold** যদি "**Pearl of the Faith**" নামক সুন্দর কাব্য রচনা করতে পারেন, **Allan Poe** যদি কুরআন শরীফের "আল আরাফ" সূরার প্রেরণা নিয়ে "**Al-Araaf**" কাব্য লিখতে পারেন, লায়লী মজনু, শিরী-ফরহাদ, ইউসুফ-জোলেখা, আলেফ-লায়লা নিয়ে যদি ইউরোপীয় লেখকেরা কাব্যরচনা করতে পারেন; হাফিজ, রুমি, ওমর খৈয়াম, ইকবাল এঁরা যদি নিজস্ব রূপ, রঙ ও রস বজায় রেখে বিশ্বসাহিত্য রচনা করতে পারেন —তবে আমরা কেন পারবো না? যে বিশ্বে আমি নেই, সে বিশ্বের মূল্য কী?

এই সমস্ত কথা বলবার অর্থ পশ্চাৎমুখিতা নয়, পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্যের প্রতি অশ্রদ্ধাও নয়। পাকিস্তান প্রগতির প্রতীক। নানা দেশ থেকে নানা

পাথর ও মণি-মাণিক্য কুড়িয়ে এনে শাহজাহান যেমন 'তাজমহল' সৃষ্টি করলেন, আর সে সৃষ্টি যেমন মুসলিম সৃষ্টি হয়েও জাতিবর্ণনির্বিশেষে বিশ্বমানুষের বিস্ময়বস্তু হয়ে রইলো, আমাদের পাকিস্তানী সাহিত্যও হবে ঠিক সেইরূপ।

আমাদের মন সংকীর্ণ গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকবে না; উদার দৃষ্টি দিয়ে আমরা অপর দেশের কাব্য-সাহিত্য নিশ্চয়ই পড়বো এবং যেখানে যেটুকু ভালো আছে, তা গ্রহণ করবো। কিন্তু সৃষ্টি করবার বেলায় অনুকরণ করবো না। আপন প্রতিভা দিয়ে নূতন সৃষ্টি করবো। এই আদর্শ আমরা অতীত যুগেও নিয়েছি, এখনও নেবো।

বাংলা সাহিত্যেও আমাদের এই ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করেছি বলেই যদি আমরা শান্ত হয়ে ঝিমিয়ে যাই, তবে বোকার স্বর্গেই আমাদের বাস করা হবে। নব নব সৃষ্টি দিয়ে, বৈচিত্র্য দিয়ে আমাদের এ ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে হবে। দানে যদি কিছু না থাকে, তবে শুধু ভাষা নিয়ে গৌরব করবার কোনো অধিকারই আমাদের থাকবে না। আমরা যদি বলি, বাংলা ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র আছেন, রবীন্দ্রনাথ আছেন, শরৎচন্দ্র আছেন, তবে তাতে আমাদের গৌরব বাড়বে না। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে, বৈচিত্র্য দিয়ে, চমৎকারিত্ব দিয়ে আমরা আপন গৌরবে অধিষ্ঠিত হতে চাই। নূতন রেকর্ড স্থাপন করার ভিতরেই তো কৃতিত্ব।

পাকিস্তানের লেখকগোষ্ঠি তাই এক কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। সম্ভাবনার দুয়ারও যেমন খুলে গেছে, তেমনি যোগ্যতায় উত্তীর্ণ হবারও আহ্বান এসেছে। এটা তো খুবই ভালো কথা। যোগ্য ব্যক্তিরাই টিকে থাকার মর্যাদা পাবে, এই তো স্বাভাবিক।

আজ আমাদের তরুণ লেখকদেরকে তাই আহ্বান জানাই পাকিস্তানের সংগঠন যুগে তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করে নিজেরাও গৌরব অর্জন করুন, জাতিকেও মহিমান্বিত করুন।

যুববাণী
১৯৬০

পাক-গণতন্ত্র ও লেখক-সমাজ

পাকিস্তানের বিপ্লব-দিবসে শুধু যে একটা রাষ্ট্র-বিপ্লবই ঘটে গেছে, তা নয়; সঙ্গে সঙ্গে ঘটেছে আমাদের চিন্তায়, ধ্যানে ও ধারণায় একটা অভিনব অন্তর্বিপ্লব। এ বিপ্লব আজ আর পাকিস্তানের চতুঃসীমার মধ্যে সীমিত নয়, এ বিপ্লব যুগস্পর্শী। যুগমনকেও সে রাঙিয়ে দিয়েছে। **Basic Democracies** বা বুনিয়াদী গণতন্ত্র জগতের সামনে এক নূতন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। বাইরের বিশ্ব আজ তাই অবাক বিস্ময়ে পাকিস্তানের দিকে চেয়ে আছে। পাশ্চাত্যের বহুযুগসঞ্চারিত সর্বজনস্বীকৃত সাধের গণতন্ত্র এই প্রথম পাকিস্তানের হাতেই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলো। পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের যে কোথাও কোনো বিকৃতি আছে, সে গণতন্ত্র যে সর্বথা সার্থক ও সফল হয়নি, সত্যিকার মানব-কল্যাণ সে যে আনতে পারেনি—সে কথা আজ অনেকেই বুঝেছেন; কিন্তু একে চ্যালেঞ্জ দেবার মতো যোগ্যতা বা সৎসাহস আজ পর্যন্ত কারো হয়নি। সমস্ত দেশ অন্ধভাবে এই গণদেবতার পূজা করে চলেছে।

পরম আশ্চার্যের বিষয়, নবপ্রবর্তিত পাকিস্তান থেকেই জগতজোড়া শক্তিশালী দৃঢ়মূল এই পাশ্চাত্য শাসনতন্ত্রের প্রতি সর্বপ্রথম চ্যালেঞ্জ গেল।

পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক দর্শনকে এইভাবে চ্যালেঞ্জ দিয়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব সত্যি এক চরম দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। আস্ফালন নয়, বিকল্প আর-একটা শাসনতন্ত্র চালু করাবার যোগ্যতা ও সৎসাহস তিনি দেখিয়েছেন। রাজনীতির ইতিহাসে এতকাল রাজতন্ত্র সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র ইত্যাদি বহু তন্ত্রই পরীক্ষিত হয়েছে। এবার এলো আর এক নূতন পরীক্ষার দিন যাকে বলা যেতে পারে পাক-গণতন্ত্র।

পাক-গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

এই নূতন গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হলো: শাসন এবং শাসিতের সমন্বয়—রাজ-কর্মচারী এবং জনসাধারণের সংযোগ। এই দ্বৈত ভাবই পাশ্চাত্য গণতন্ত্র

থেকে পাক-গণতন্ত্রকে পৃথক করছে। দেশের শাসনকর্তা এখন আর দেশবাসীর হর্তাকর্তাবিধাতা নন। এখন তিনি সেবক ও শাসকের মিলিত রূপ। '**S.D.O.-in-Council, District Magistrate-in Council, Governor-in-Council** '—এই রূপই এর চেহারা। এ শাসন দেশের লোকের সঙ্গে শাসন, দেশের লোকের উপর শাসন নয়। এইটেই হলো পাক-জমহুরিয়াতের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বলা বাহুল্য, এই দ্বৈতভাব ইসলাম সমর্থন করে। ইসলাম চিরদিনই দুই প্রান্তকে মিলায়। তাই সে মধ্যপন্থী। দুই বিপরীতের মাঝখান দিয়ে সে তার পথ রচনা করে।

ইসলামিক শাসনতন্ত্র বা জীবন-দর্শন তাই একপ্রান্তিক নয়। ইসলাম ইহলোক ও পরলোককে বিচ্ছিন্ন করে না, রাষ্ট্র ও ধর্মকে (**State and Church**) পৃথক করে না। দুইকে নিয়েই তার কারবার। কুরআন ও তলোয়ারকে সে মিলাতে জানে। আমিরুল-মুমিনিন শুধু তাই দেশের শাসনকর্তাই নন, সিপাহ-সালারও।

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে ইসলামের তাই অনেক বিষয়ে বিরোধ আছে। দুটো জনপদ সুসংলগ্ন না হলে এক-রাষ্ট্রের অধীন হতে পারে না : এক ভাষা, এক অর্থনৈতিক কাঠামো না হলে একজাতিত্ব গড়ে ওঠে না—পূর্ব ও পশ্চিম কোনোদিন মিলবে না ইত্যাদি ধরনের বহু ধ্যান-ধারণা পাশ্চাত্যের চিন্তাক্ষেত্রে বহুদিন ধরে শিকড় গেড়ে আছে। এই সমস্ত মতবাদ এতদিন পরে পাকিস্তানের হাতেই লাভ করলো এক প্রচণ্ড আঘাত। পাকিস্তানই জগতকে দেখিয়ে দিল যে, পূর্ব ও পশ্চিমকে একসঙ্গে মিলানো যায়, ভাষার তারতম্য ও পার্থক্যকে স্বীকার করেও বিভিন্ন জনগোষ্ঠি এক জাতিতে সংগ্রথিত হতে পারে ; ভৌগোলিক সীমারেখাকে উল্লঙ্ঘন করেও বৃহত্তম স্বদেশ রচনা করা যায়।

উপরের দৃষ্টান্তগুলি থেকে পরিষ্কারই বোধগম্য হবে যে, প্রচলিত পাশ্চাত্য রাজনীতি ও সমাজনীতির সঙ্গে ইসলামের অনেক বিষয়েই মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আমাদের নিজস্ব শাসনতন্ত্র রচনা করতে হলে তাই আমাদের অনেক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র না হয়ে উপায় নেই। কায়েদে-আযম যে

বলেছিলেন, "We are a separate nation and we have got a separate culture"—এ কথার তাৎপর্য এই আলোকে বুঝা সহজ হবে।

বলা বাহুল্য, এই যে স্বাতন্ত্র্য, এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। এ স্বাতন্ত্র্যের নাম সংকীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িকতা নয়; এ আমাদের আদর্শ-বাদিতার স্বাতন্ত্র্য, এ আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ। জগতে যতো মৌলিক দান ও নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা দেখতে পাওয়া যায়, সবার মূলে আছে এই স্বাতন্ত্র্যবোধ। গডডালিকা স্রোতে ভেসে না গিয়ে ভিন্ন পথ বেছে নেওয়া অনেক স্থানে তাই বরণীয়। গভীর কল্যাণ-জিজ্ঞাসা না জাগলে অথবা বিশেষ যোগ্যতা না থাকলে সহজে কেউ স্বতন্ত্র পথ খোঁজে না। যতো নবী, যতো কবি, যতো আবিষ্কারক, যতো সমাজসংস্কারক সবাই প্রয়োজনবোধে ভিন্নপথ রচনা করেন। কাজেই পাকিস্তান যদি একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হতে চায়, তাতে তার অগৌরব তো নেই-ই, বরং সেইটেই হবে আমাদের পরম শ্লাঘার বিষয়। কেননা তখন স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব একবিন্দুতে না মিশে আর উপায় থাকবে না।

লেখকদের ভূমিকা

এই নূতন রাষ্ট্র-বিপ্লবের দিনে লেখকদের ভূমিকা কী হবে? তাঁরা কি গতানুগতিকভাবেই লেখনী চালনা করবেন, না নূতন পরিবেশ ও পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের লক্ষ্য ও চিন্তাধারাতেও বিপ্লব আনবেন?

জগতের ইতিহাসে দেখা যায়, চিন্তাজগতে লেখকরাই সর্বপ্রথম বিপ্লব আনেন। নূতন মত ও নূতন পথের সন্ধান দেওয়া লেখকদেরই কাজ। লেখকদের প্রভাবেই রাষ্ট্রে ও সমাজে বিপ্লব আসে। পক্ষান্তরে, কোনো বিপ্লবের পর রাষ্ট্রের চিন্তাশীল লেখকেরা নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রমতকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজেও অগ্রণী হন। তরবারি ও লেখনী তাই যুগে যুগে পরস্পর হাত ধরাধরি করে চলে। প্রাচীন যুগে প্লেটো ও এরিষ্টটল, মধ্যযুগে লক, হিউম, রুশো ও ভল্টেয়ার এবং বর্তমান যুগে কার্ল মার্কস, লেনিন ও এঙ্গেলস রাষ্ট্র-বিপ্লবে সহায়তা করেছেন। এছাড়া আরও অনেক লেখক আছেন যাঁদের লেখার প্রভাব চিন্তা-জগতে বিপ্লবে

এনেছে। ইবনে বাতুতা, আল্-বেরুনী, ইবনে-খলদুন, আল্-গাজ্জালী, আলতাফ হোসেন হালী, আল্লামা ইকবাল—এইরূপ অসংখ্য নাম করা যায়।

বস্তুতঃ রাজনীতি, সমাজনীতি, শাসননীতি ও অন্যান্য সমাজকল্যাণকর বিষয়ে চিন্তাশীল লেখকেরা এমন বহু গ্রন্থ লিখেছেন—যা কোনো না কোনো ক্ষেত্রে বিপ্লবের সহায়তা করেছে। যুগে যুগে তাঁরা রাষ্ট্র-দর্শন, অর্থনীতি ও মানবীয় অধিকার নিয়ে গভীর আলোচনা করে আসছেন। আজও তাদের চিন্তাধারার বিরাম নাই। এ চিন্তা যেন একটানা স্রোতের মতো যুগ হতে যুগান্তরে বয়ে চলেছে। অতি প্রাচীনকালে **Plato** ও **Aristotle** -এর মনে জেগেছিল, কি করে একটা **Ideal City** বা **Ideal State** গঠন করা যায়। সেই থেকে আজ অবধি ইউরোপ ও আমেরিকা সেই 'আদর্শ নগর' বা 'আদর্শ রাষ্ট্রের' সন্ধানে ঘুরে মরছে। **Plato**-র **'Republic,'** **Aristotle**-এর **'Politics'**, **St. Augustine**-এর **'The City of God'**, **John Lock**-এর **'The Two Teratises of Civil Government'**, **Rousseau**-র **'Social Contract'**, **Thomas More**-এর **'Utopia'**, **Machiavelli**-র **'The Prince'**, **Thomas Paine**-র **'Common Sense,'** কার্ল মার্ক্সের **'Das Capital'** এবং আরও বহু গ্রন্থের নাম করা যায়—যা শুধু রাষ্ট্রতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র নিয়ে লেখা। বলা বাহুল্য এই সব বিপ্লবী চিন্তাবিদদের চিন্তাধারা জগতের রাজনৈতিক ইতিহাসের মোড় বহুবার ঘুরিয়েছে। এক একজন লেখকের প্রভাবেই এক একটি জাতির বা দেশের রাজনৈতিক রূপ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। বর্তমান যুগেও **'Human Rights'** সম্বন্ধে, **'Communism Economics'** সম্বন্ধে বা **'population'** সম্বন্ধে বহু বিশিষ্ট লেখক বহু থিওরী দিয়েছেন। **Harold Laski**, **Bertrand Russel**, **Adam Smith**, **Bernard Shaw** প্রভৃতি অসংখ্য লেখক এই সব বিষয়ের উপর বহু গ্রন্থ লিখেছেন।

সেই তুলনায় পাকিস্তানের লেখকেরা কী করছেন বা কে কতোটুকু মৌলিক চিন্তা দিয়েছেন—সে কথা ভাবতে হবে। একমাত্র ইকবাল ছাড়া বিশেষভাবে আর কার নাম করা যায়, জানিনা। রাজনৈতিক চিন্তা ও দর্শন আমাদের মধ্যে নেই বললেই চলে। পশ্চিম পাকিস্তানে তবু কারো কারো

নাম করা যায়—যাঁরা Islamic Socialism সম্বন্ধে কিছু কিছু বই লিখেছেন 'Socialism', 'Islam and Interest', 'The Social Contract and the Islamic State' 'Islam in Modern State', 'Economic Problems of Pakistan', 'The Menifesto of Islam,' 'Ideology of the Future', 'The Idelogy of Pakistan and its Implementation' প্রভৃতি অনেকগুলি বইয়ের নাম করা যায়—যাতে মৌলিক চিন্তা ও গবেষণার স্বাক্ষর আছে।

ইউরোপের নব জাগরণের ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে কবি-সাহিত্যিকরাই সেখানকার মানুষের মন আগে রাঙিয়ে দিয়েছে। পরে সেই সব আইডিয়া বা থিওরীর বাস্তব রূপায়ণ ঘটেছে। পাকিস্তানের জন্মের প্রারম্ভে স্বাপ্নিক কবি ইকবাল সেই ধরনের চিন্তা এবং স্বপ্ন আমাদের মনে সঞ্চারিত করে ছিলেন। কিন্তু তার পরের যুগ আমাদের শিথিলতার যুগ। যে প্রেরণায় আমরা পাকিস্তান লাভ করেছি, সেই প্রেরণা ও সেই আদর্শকে রূপে রসে বর্ণে গন্ধে পল্লবিত করার গুরু দায়িত্ব পড়েছিল আমাদেরই কবি-সাহিত্যিকদের ওপর। কিন্তু আমরা কি সে দায়িত্ব সুন্দররূপে—স্বার্থকরূপে পালন করতে পেরেছি? এই আত্মজিজ্ঞাসারই আজ আমাদের জবাব দিতে হবে।

আমাদের মনে হয়, আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য, লক্ষ্য ও আদর্শের প্রেরণা এখনো আমাদের মনে পূর্ণরূপে দানা বেঁধে ওঠেনি। ইসলামের ধ্যান-ধারণা ও পাকিস্তানের আদর্শবাদের নামে এখনো আমরা সরমে-সংকোচে মুখ লুকাই। আমাদের আপন শক্তি, সম্ভাবনা ও ঐতিহ্যচেতনার ওপর দাঁড়িয়ে বিশ্বে গর্বোন্নত মস্তকে এখনো আমরা কিছু বলতে সাহস করি না। আপন গৌরব ও মহিমা সম্বন্ধে এখনো আমাদের মনে একটা হীনমন্যতা জেগে আছে। তাই দেখতে পাই, পাকিস্তানের বহু দোষত্রুটি থাকা সত্বেও এর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে বহু ইউরোপীয় লেখক ইতিমধ্যেই বহু মূল্যবান গ্রন্থ লিখে ফেলেছেন; যে-কথা আমরা বলতে পারিনি, সেকথা তাঁরা বলেছেন। 'Islam in Modern History'-এর মতো গ্রন্থ লিখেছেন W. C. Smith, 'The Making of Pakistan' লিখেছেন

Richard Symonds। পাকিস্তানের আদর্শবাদে তাঁরা বিশ্বাসী। অথচ এদিকে এখনো আমরা পশ্চাদ্বর্তী।

যুগে যুগে কুরআন থেকে ইউরোপীয়ান লেখকেরা বহু প্রেরণা সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু আমরা এখনও সেখান থেকে কিছু নিতে কুণ্ঠিত। **Rousseau** যে তাঁর **Social Contract** বই লিখলেন, তার মূল প্রেরণা পেলেন কুরআন থেকেই। তার নূতন মতবাদের মর্মকথা হলো: একটা পারস্পরিক চুক্তির উপর সমাজ ও রাষ্ট্র চালিত হবে। একজন শাসক যে আর দশজন নিরীহ লোকের উপর কঠোর শাসন-দণ্ড চালাবে, এটা অসমর্থন-যোগ্য। শাসন চলবে আদান-প্রদানের ভিত্তিতে। "**Rule of the equals over the equals**"—এই হবে শাসনের মূলনীতি। এটা একটা নৈতিক চুক্তি। এই চুক্তির কথা কুরআন শরীফে বহুবার উল্লিখিত হয়েছে। আল্লাহ্‌ বহুবার বনি-ইসরাইলদের সঙ্গে চুক্তি বা **Covenant** সম্পন্ন করেছেন। বলেছেন, তোমরা যদি তোমাদের চুক্তি রক্ষা করো, আমিও আমার চুক্তি রক্ষা করবো। কিন্তু বনি-ইসরাইলেরা বারবার আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাদের সে-চুক্তি বা ওয়াদা ভঙ্গ করেছে। হযরত ইব্রাহিমের সঙ্গেও আল্লাহ্‌ এইরূপ চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। এই যে চুক্তির ভাব, এই যে পারস্পরিক নির্ভরতা এবং দেওয়া-নেওয়ার ভাব—এতদিন পরে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের নবশাসনতন্ত্রে আমরা লক্ষ্য করছি। এই নূতন রাষ্ট্রদর্শনের উপরে আমরা কি কোনো বই লিখতে পারি না।

একই দিনে ভারত ও পাকিস্তান আযাদী লাভ করেছিল। কিন্তু শাসনতন্ত্র ব্যাপারে ভারত এখনও সেই বৃটিশ পদ্ধতিরই অনুসরণ করছে। রাষ্ট্র-দর্শনে সেখানে কোনো বিপ্লব সূচিত হয়নি। 'ভূদান', 'গ্রামদান' 'সর্বোদয়া' আন্দোলন সেখানে ব্যর্থ হয়েছে।

কিন্তু আইয়ুব প্রবর্তিত 'মৌলিক গণতন্ত্র' আজ ঐতিহাসিক সত্য। এর দোষত্রুটি থাকতে পারে। (প্রাথমিক পর্যায়ে সব শাসনেই দোষত্রুটি থাকে); তবু বিদেশী শাসনতন্ত্র বর্জন করে পাকিস্তান যে তার নিজস্ব রাষ্ট্র বিধান কায়েম করতে পেরেছে এতে নিশ্চয়ই গৌরব আছে। লেখকদের কি এ পথ বেয়ে এখন এগিয়ে আসা উচিত নয়? বিপ্লবের আগেও যেমন তাদের প্রয়োজন, পরেও কি তেমনি প্রয়োজন নাই?

যে নূতন জীবনপদ্ধতি ও তামদ্দুনিক সংগঠন আমরা পাকিস্তানে প্রবর্তিত করতে চাই, তা নিয়ে কি আমরা নব নব কাব্য, দর্শন ও নাটক লিখতে পারি না ?

আজ সমগ্র সভ্য জগৎ 'Arab world-এর দিকে চেয়ে রয়েছে। হাওয়ার গতি ফিরে গেছে। বিশ্বের রাজনীতির চাবিকাঠি আজ আবার মুসলিম জাহানের হাতে এসে যাচ্ছে। মিসর, সিরিয়া, ইরাক, জর্দান, সৌদী-আরব, ইয়েমেন, কুয়াইৎ, লেবানন, বাহ্‌রাইন, কত্‌র, ওমান, সুদান, এডেন, মাসকট, তিউনিসিয়া, মরক্কো এবং আলজিরিয়া—এক কথায় 'Arab World' এখন বিশ্বের রাজনৈতিক চিন্তার কেন্দ্রস্থল। বহু ইউরোপীয় লেখক 'Arab World' ও ইসলামের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বহু বই লিখেছেন। 'Islam Inflamed', 'Doubts and Dynamite' ইত্যাদি বহু পুস্তকের নাম করা যায়। কিন্তু আমরা তার খবরও হয়তো রাখি না, লেখা তো দূরের কথা। বস্তুতঃ আমাদের মনন-সাহিত্য এখনও অনেক দরিদ্র।

আইউব-প্রবর্তিত নবশাসনতন্ত্র রাজনীতির ইতিহাসে এক বিপ্লবধর্মী নূতন অধ্যায় খুলে দিয়েছে। এই বিপ্লব থেকে জগতের ইতিাসে বিপ্লব আসতে পারে। এই নূতন আদর্শকে সার্থক রূপদান করবার জন্যে পাকিস্তানের লেখক গোষ্ঠির এগিয়ে আসা উচিত।

ঢাকা
১৯৬০

টু-নেশন থিওরী

একথা সকলেই জানেন, পাকিস্তান সংগ্রামের মূলে ছিল যে-যুক্তি ও দর্শন, তা হচ্ছে 'টু-নেশন থিওরী'। পাক-ভারতের মুসলমানদের কোনো বলিষ্ঠ স্বতন্ত্র সত্বা বা তীক্ষ্ণ জাতীয়তাবোধ ছিল না। গঙ্গা যেমন আপন মহিমায় প্রবাহিত হয়, আর তার দু'পাশ থেকে ছোট ছোট অববাহিকা এসে তার স্রোতে মিশে যায়, পাক-ভারতের হিন্দু-মুসলমানের দশা ছিল সেইরূপ। হিন্দুই ছিল মূলধারা আর মুসলমানেরা ছিল তার উপধারা মাত্র। ভারতীয় হিন্দু নেতারা এই অর্থেই 'অখণ্ড-ভারতের' কল্পনা করেছিলেন।

ঠিক এই সময় কায়েদ-ই-আযম বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন: মুসলমানেরাও একটি জাতি এবং স্বতন্ত্র একটি শক্তি; কাজেই পাক-ভারতের অধিকার বা শাসনের প্রশ্নে হিন্দুর ন্যায় মুসলমানেরও দাবী আছে। মুসলিম মানসে জাতীয়তা-বোধের এই যে নবজাগরণ,—এই যে আত্ম-সচেতনতা, এই হলো পাকিস্তান-লাভের আত্মিক প্রেরণা।

পাক-ভারতীয় সমস্যার সমাধান কল্পে কায়েদ-ই-আযমের এই থিওরী যে আদৌ অসঙ্গত ছিল না, একথা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করবেন। এই উপ-মহাদেশে প্রধানতঃ দুইটি জাতিই বাস করে: হিন্দু এবং মুসলমান। কাজেই যদি বলা হয় যে, এখানে এই দুই জাতিরই পাশাপাশি থাকবার অধিকার আছে, তাহলে এমন কিছুই অন্যায় বলা হয় না। ভায়ে-ভায়ে পৃথক হলেও এমনিই ঘটে। তখন তো বাড়ি-ঘর বিষয়-আশয় ভাগ হয়ে যায়। কাজেই কায়েদ-ই-আযমের এই দ্বিজাতি-নীতির মধ্যে অন্যায় বা অশোভন কিছুই ছিল না; বরং এইটেই ছিল ন্যায়সঙ্গত বিধি এবং বাস্তব সত্যের অভিব্যক্তি। কিন্তু হিন্দু নেতাগণ আপন স্বার্থে কায়েদের এই সত্যবাণীকে সেদিন মর্যাদা দিতে পারেন নি। এক বিকৃত ঐক্যবোধের

ছলনায় সেদিন হিন্দু দেশনায়কেরা মুসলমানদের এই ন্যায্য দাবী মেনে নিতে চাননি। এই বাস্তববিমুখিতার প্রতিক্রিয়া স্বরূপই দেখা দিল পাকিস্তান।

দ্বিজাতি-তত্ত্বের গূঢ় তাৎপর্য তাই সেদিন ধরা পড়েনি। হিন্দু নেতাগণ কায়েদ-ই-আযমের এই বাণাকে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার রঙে রাঙিয়ে দিলেন। ঐক্য ও সংহতির মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্যের দাবী যে নিতান্তই অনুদার ও ভেদবুদ্ধির পরিচায়ক—এই কথাই তাঁরা প্রচার করলেন।

কিন্তু এই 'টু-নেশন থিওরী' যে কায়েদ-ই-আযম শুধু পাক-ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধেই বলেননি, এক বৃহত্তর কল্যাণ-জিজ্ঞাসা থেকেই যে এ বাণী পূর্বেই উৎসারিত হয়েছে, তা আজ আমাদের বুঝতে হবে। এটা কোনো হিন্দু-মুসলমানের রেষারেষির প্রশ্ন নয়; ইসলামের নীতি হিসাবেই একে গ্রহণ করতে হবে। ইসলামের মৌলিক নীতিই হচ্ছে 'টু-নেশন থিওরী'। এই থিওরীর উপরেই ইসলামের সমগ্র কাঠামোটি দাঁড়িয়ে আছে।

টু-নেশন থিওরী কায়েদ-ই-আযমের নিজস্ব আবিষ্কারও নয়, শুধুমাত্র হিন্দু-মুসলমানের প্রতিও এ প্রযোজ্য নয়,—ভারতেও এর উৎপত্তি নয়। এর জন্ম-ইতিহাস খুঁজতে হবে আরো অতীতে—আরো গভীরে। ইসলামের মহা পয়গম্বর—হযরত মুহম্মদ (দঃ)-ই হচ্ছেন এর প্রথম উদ্গাতা। স্বয়ং আল্লাহ-তালাই তাঁকে এই নীতি শিক্ষা দিয়াছেন। কুরআন শরীফে আছে:

"ইন্নামাল মু'মীনুনা ইখ্ওয়াতুন"
অর্থাৎ: সমগ্র বিশ্বাসীরা একজাতি।

মুসলমানের এই এক-জাতিত্বের ভিতরেই দ্বিজাতিত্বের কথা স্বীকৃতি পেয়েছে। সমগ্র মানবমণ্ডলীর মধ্য হতে যদি 'বিশ্বাসীদিগকে' বিচ্ছিন্ন করে আনা হয়, তবে স্বতঃসিদ্ধভাবেই তো অবশিষ্ট মানবকুলকে আর এক জাতি বলা হয়। গোটা জিনিসটা থেকে একটা অংশ স্বতন্ত্র করলেই প্রকৃতপক্ষে তা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কাজেই মুসলিমরা এক জাতি যদি হয়, তবে অ-মুসলিমরাও আর-এক জাতি, এতে আর সন্দেহ কি থাকতে পারে? দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রমাণ করবার জন্য কুরআনের এই একটি আয়াতই

যথেষ্ট। তবু এর উপর আরও একটি হাদিস এসে বিষয়টাকে অধিকতর পরিস্ফুট করে দিয়েছে। রসুলুল্লাহ্ বলেছেন:

"আল্-কুফরো মিল্লাতুঁ ও ওয়াহেদাঃ"

অর্থাৎ: অবিশ্বাসীরা এক জাতি।

তাহলে ইসলাম গোটা মানবজাতিকে দু'ভাগে ভাগ করে ফেলেছে: বিশ্বাসীরা হলো একজাতি, আর অবিশ্বাসীরা হলো আর এক জাতি! কাজেই 'টু-নেশন থিওরী' কায়েদ-ই-আযমের কথাই নয়, এটা ইসলামেরই কথা।

টু-নেশন থিওরীর তাৎপর্য

টু-নেশন থিওরী' গভীর অর্থপূর্ণ। আল্লাহ মুসলমানদিগকে এমন এক আদর্শ জাতি রূপে কল্পনা করেছেন—যারা মানব-কল্যাণে নিজদিগকে সতত উন্মুখ করে রাখবে। পাক-কুরআন মুসলিম জাতিকে এই বেশেই দেখতে চেয়েছে। আল্লাহ্ বলছেন:

"আমি তোমাদিগকে এক শ্রেষ্ঠ (স্বতন্ত্র) জাতিরূপে সৃষ্টি করিয়াছি, যাহাতে তোমরা অন্যান্য সকল জাতির আদর্শ হইতে পারো।"
—(২: ১৪৩)।

অন্যত্র আল্লাহ্ সুস্পষ্টভাবেই মুসলমানদিগকে "খায়রা উম্মাতিন" (শ্রেষ্ঠ জাতি) বলে পরিচয় দিচ্ছেন:

"কুন্তুম্ খায়রা উম্মাতিন উখ্রিজাৎ লিন্না-সে তা-মুরূ'সা বিল্ না'রূফে"
—জাতিসমূহের মধ্যে তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। যা ভালো তাই তোমরা সকলকে করতে নির্দেশ দিবে, যা মন্দ তা করতে নিষেধ করবে।
—(৩: ১০৯)

তাহলে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে. মুসলমানেরা যাতে একটা আদর্শ জাতি-রূপে গড়ে ওঠে—আল্লাহ্ তাই চান। অন্যান্য জাতির ন্যায় মুসলমানও একটা সাধারণ জাতি হোক্—আল্লাহ্ তা চান না। মুসলমানেরা দুনিয়ার মধ্যে একটা স্বতন্ত্র জাতি হোক—পথপ্রদর্শক হোক—এই তিনি চান। মুসলমান্ যদি আর দশজনের মতোই হয়, তা হলে দ্বি-জাতি কল্পনার কোনো

সার্থকতাই থাকে না। আমরা একটা আলাদা জাতি বলে কোনো কিছু আস্ফালন বা দাবী করারও আমাদের কোনো সঙ্গত কারণ থাকে না। 'টু-নেশন থিওরী' তাই অহেতুক একটা সংকীর্ণমনা মানব-গোষ্ঠি খাড়া করবার মতলবে প্রচার করা হয় নি। এর পশ্চাতে আছে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের ইংগিত, আপন লক্ষ্যে আপন আদর্শে চলবার সৎসাহস ও মনোবল এবং নবসৃষ্টির দৃঢ় সংকল্প ও অনুরাগ। পথ অতি কঠিন, কিন্তু এই কঠিন পথে চলাতেই তো আনন্দ। স্বতন্ত্র হয়ে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই তো অধিক গৌরবের।

দ্বি-জাতি তত্ত্বকে সার্থক করে তুলতে হলে তাই একথা মেনে নিতেই হবে যে, মুসলমানের কালচার বা তমদ্দুনও স্বতন্ত্র। এই জন্যই তো কায়েদ-ই-আযম বলেছিলেন : "**We are a separate nation and we have got a separate culture,**" অর্থাৎ আমরা একটা স্বতন্ত্র জাতি এবং আমাদের তাহ্জীব-তমুদ্দুন স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র জাতি হতে হলে আগে চাই স্বতন্ত্র কালচার। স্বতন্ত্র কালচার থাকলে তবেই না স্বতন্ত্র জাতি। কাজেই দ্বি-জাতিতত্ত্বে কালচারের স্বাতন্ত্র্য আনিবার্য।

এখানেই দ্বিজাতি-তত্ত্বের সত্যিকার পরিচয়। স্বতন্ত্র কালচারের কদর্থ করলে এই থিওরী পণ্ড হবে। স্বতন্ত্র কালচার অর্থে এখানে মিলন-বিরোধী কোনো গোঁড়া বা ধর্মান্ধ কালচারের কথা বলা হচ্ছেনা। বরং তার উল্টা। এ হলো স্বাতন্ত্র্যকে ভেঙে ফেলার স্বাতন্ত্র্য, সবাইকে কোলে টেনে নেবার, সবাইকে স্বীকার করবার, সবার সঙ্গে হাত-মেলাবার বৈশিষ্ট্য দিয়েই এ স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত। এইখানেই এর চমৎকারিত্ব। অন্যান্য জাতিরা যা করেনা বা করতে চায় না, বা করতে পারেনা, ইসলাম তাই মুসলমানের দ্বারা সাধন করাতে চায় বলেই তাকে বাধ্য হয়ে স্বতন্ত্র হতে হয়। অন্যান্য ধর্মে যদি বলা হয়: "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম ভয়াবহ", আর সে ক্ষেত্রে ইস্লাম যদি বলে "ধর্মে কোনো বলপ্রয়োগ নাই", অথবা "আমরা পয়গম্বরদিগের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না", তবে অন্যান্য ধর্ম থেকে ইসলাম তো স্বাভাবিকভাবেই স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে। অন্যান্য ধর্ম যদি মানুষকে সমঅধিকার না দেয়, জাতিভেদ ও কৌলিন্য প্রথা দ্বারা যদি মানুষে মানুষে

ভেদাভেদের প্রাচীর গড়ে তোলে, আর ইসলাম যদি সে প্রাচীর ভেঙে দিয়ে সবার সাথে হাত মিলায়, তবে তাকে কি স্বতন্ত্র বেশে দেখায় না? অন্যান্য রাষ্ট্রে বিধর্মীদিগকে যদি তুল্যরূপে সামাজিক ও নাগরিক অধিকার না দেওয়া হয়, আর ইসলামী রাষ্ট্রে যদি সবাইকে তা দেয়, তা হলে ইসলাম কেন না স্বতন্ত্র বলে বিবেচিত হবে? অন্যান্য ধর্মে নারীকে যদি দাসীর মতো ব্যবহার করা হয় আর ইসলামে যদি তাকে দেওয়া হয় মহিমময়ীর মর্যাদা, তখন তার স্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে উপায় থাকে না। বস্তুতঃ ইসলামের মহান আদর্শ ও অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিই তার স্বাতন্ত্র্যের মূল কারণ, আর শ্রেষ্ঠত্বের সাধনাই হচ্ছে এই স্বাতন্ত্র্যের লক্ষ্য।

মানবজাতি আজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডী-স্বাতন্ত্র্যে সীমিত। আমরা যে এক-পৃথিবীর নাগরিক, সবাই মিলে আমরা যে এক মহাজাতি—একথা আজ আর আমাদের মনে নাই। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডী-সংকীর্ণতা ভেঙে দিয়ে মহামানবতা রচনা করবার জন্যে আর একটা স্বতন্ত্র দলের প্রয়োজন। সেই স্বতন্ত্র দলই মুসলমান।

পাক-জমহুরিয়া
১৯৬০

আর্য-সভ্যতা

পাক-ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে এতকাল এই কথাই শিখানো হয়েছে যে, অতি প্রাচীনকালে এইদেশে কোল-ভীল-সাঁওতাল ইত্যাদি অনার্য জাতিদের বাস ছিল। তারা বনে-জঙ্গলে বাস করতো, ফলমূল ও কাঁচা মাংস ভক্ষণ করতো। তারা ছিল অসভ্য বর্বর খর্বাকৃতি কৃষ্ণকায় ও কদাকার। এরপর এলো দ্রাবিড় জাতি। তারাও ছিল অনার্য, তবে কোল-ভীল-সাঁওতাল-দের চেয়ে কিছুটা সভ্য। সর্বশেষে এলো আর্য জাতি। তারা দেখতে সুশ্রী গৌরবর্ণ এবং দীর্ঘকায়। তাদের বাস ছিল মধ্য-এশিয়ায়; কারো কারো মতে কাস্পিয়ান্ সাগর তীরবর্তী অঞ্চলে। কালে কালে তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়লো। একদল গেল ইউরোপের দিকে। এরাই হলো গ্রীক রোমান জার্মান ইংরাজ প্রভৃতি জাতি সমূহের পূর্বপুরুষ। অন্যদল প্রথমে এলো পারস্যে; সেখান থেকে কিছুকাল পর আবার একটা দল বেরিয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশের মধ্য দিয়ে এলো ভারতে; তারপর দ্রাবিড়দিগকে পরাজিত করে অধিকার বিস্তার করলো পাঞ্জাব সিন্ধু ও অন্যান্য প্রদেশে। আর্যরাই সর্বপ্রথম ভারতে সভ্যতার আলো জ্বাললো। অন্য কথায় ভারতীয় সভ্যতা আর্যদেরই দান।

কিন্তু আর্য-সভ্যতার এই থিওরী এখন একরূপ অচল। পাঞ্জাবের 'হরপ্পা', সিন্ধুর 'ময়েনজোদারো' এবং অন্যান্য কয়েকটি স্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে এখন একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, ভারতীয় সভ্যতা আর্যদের দ্বারা আনীত হয়নি। বরং যাদের এতকাল অসভ্য বলে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে, সেই দ্রাবিড় জাতিই ভারতীয় সভ্যতার রচয়িতা। এ কথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, এই দ্রাবিড়-সভ্যতা আর্য-সভ্যতা অপেক্ষা বহুগুণে উন্নত। এ সভ্যতার সঙ্গে আর্য-সভ্যতার কোনো প্রকার সম্পর্কই ছিল না, কারণ দ্রাবিড় সভ্যতা ছিল আর্যদের আগমনের অন্ততঃ এক হাজার বৎসর অগ্রগামী।

দ্রাবিড়-সভ্যতা

ঐতিহাসিকদের সিদ্ধান্ত এই : পাক-ভারতে কোনোকালেই কোনো আদিম অধিবাসী (aborigines) ছিল না। আর্যই হোক্, অনার্যই হোক, সবাই এসেছিল বিদেশ থেকে। **Dr. R. C. Majumdar** ও **A. D. Pusalkar** বলেন :

> **"No kind of men originated on the soil of India; all her human inhabitants having arrived from other lands but developing within India."**

এই হিসাবে কখন্ কোথা থেকে কারা ভারতে এসেছিল, তার একটা কালক্রমিক তালিকাও তাঁরা দিয়েছেন। সেটি এই :

(১) নেগ্রিটো ... ... আফ্রিকা থেকে আরবের মধ্য দিয়ে ভারতে এসেছিল।

(২) প্রোটো-অষ্ট্রোলয়েড......ভূমধ্যসাগরীয় জনগোষ্ঠির আদিম শাখা।

(৩) ভূমধ্যসাগরীয় অনুন্নত জাতি।

(৪) ভূমধ্যসাগরীয় উন্নত জাতি ...... এরাই ভারতে দ্রাবিড় জাতি রূপে পরিচিত।

(৫) আর্মেনয়েড ...... দ্রাবিড়দিগের সঙ্গে এসেছিল।

(৬) আলপাইন ... ... বৈদিক আর্যদের অগ্রবর্তী।

(৭) বৈদিক আর্যজাতি...বৈদিক ভাষা সঙ্গে এনেছিল।

(৮) মঙ্গোলীয়ান...অনুন্নত জাতি।

এই তালিকা দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আর্যদের পূর্বে অন্ততঃ ছয়টি জাতি এসে ভারতে বসতি স্থাপন করেছিল এবং তাদের প্রত্যেকেই নীল-নদ কিংবা টাইগ্রো-ইউফ্রেটিস উপত্যকা থেকে এসেছিল। অন্য কথায় বলা যায় : 'উর্বর হেলালী চাঁদের' (**Fertile Crescent**) দেশই ছিল মানব-সভ্যতার আদিম লীলাভূমি।

পণ্ডিতেরা মনে করেন আর্যদের ভারতে আগমন সংঘটিত হয়েছিল খৃষ্টের জন্মের ১৫০০ বৎসর পূর্বে। তার আগে পাক-ভারতের সর্বত্রই ছিল

দ্রাবিড় জাতির শাসন ও প্রভাব। সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় ঐতিহাসিক **Chokolingam Pillai** বলেন:

> **"It is needless to mention that the question (Aryo-Dravidian problem) was first set in motion on the day the Aryan entered India which event we shall soon see took place in the 15th century B. C. India, prior to his entry, was a Dravidian land."**

বাংলা দেশেও যে দ্রাবিড়দের প্রভাব ও প্রাধান্য ছিল, সে সম্বন্ধে রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন:

> "এই প্রাচীন দ্রাবিড় জাতিই বঙ্গ-মগধের আদিম অধিবাসী। নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা আধুনিক বঙ্গবাসিগণের নাসিকা ও মস্তক পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তাহারা দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণ উৎপন্ন। মগধের ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতীয় ব্যক্তিগণকে আর্যজাতীয় অথবা আর্য সংমিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বঙ্গবাসিগণকে জাতিনির্বিশেষে দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণের ফল বলা যাইতে পারে।"

অতএব স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আর্যদের আগমনের পূর্বে দ্রাবিড় জাতিই ছিল পাক-ভারতের সর্বপ্রধান সভ্য ও শক্তিশালী জাতি।

হরপ্পা ও মহেনজোদারো

হরপ্পা ও মহেনজোদারোতে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন-কার্যের দ্বারা এক অনার্য জাতির সভ্যতার নিদর্শনই আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগ কর্তৃক উপরোক্ত দুইটি স্থানে খনন-কার্য আরম্ভ হয়। **Sir John Marshall** ছিলেন এই বিভাগের অধিনায়ক। বাংলা দেশের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই গবেষণা কার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। খনন-কার্য দ্বারা উভয় স্থানেই এক উন্নত প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। বহু সুদৃশ্য ইষ্টক-নির্মিত অট্টালিকা, সুপরিকল্পিত রাজপথ, পয়ঃপ্রণালী, স্নানাগার, দুর্গ ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ এখানে বিদ্যমান। নিদর্শন সমূহের মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার,

নানাধরনের আসবাবপত্র, মণিমাণিক্যের হার, নানা প্রকার মৃৎপাত্র, নানা ধরনের মুদ্রা ও বহুবিধ বিলাস-দ্রব্য বিদ্যমান। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কথা হচ্ছে এই যে, সেখানে লিপি-খোদিত প্রায় ৬০০ সিলমোহর পাওয়া গিয়েছে। সে লিপি সেমিটিক কায়দায় ডান দিক থেকে বাম দিকে লেখা।

নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা ছিল দ্রাবিড়-সভ্যতা। এ-সভ্যতার সঙ্গে আর্য-সভ্যতার কোনো সম্পর্কই ছিল না। দ্রাবিড় সভ্যতা ছিল নাগরিক আর আর্য-সভ্যতা ছিল আশ্রমিক। **Sir John Marshall**-ও এই পার্থক্যের কথা স্বীকার করেন। হরপ্পা ও ময়েনজোদারোর ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধে তিনি বলেন:

> "They exhibit the Indus peoples of the fourth and the third millennium B. C. in possession of a highly developed culture in which no vestige of Indo-Aryan influence is to be found".

দ্রাবিড় কারা?

এখন দেখা যাক এই দ্রাবিড় জাতি কারা, কোথায় তারা ছিল এবং কোথা থেকে তারা এলো।

পূর্বেই বলা হয়েছে, আর্যই হোক আর অনার্যই হোক, ভারত-ভূমির আদিম অধিবাসী কেউ-ই ছিল না। সবাই ছিল বহিরাগত। দ্রাবিড় জাতিও বিদেশ থেকে ভারতে এসেছিল। এ সম্বন্ধে **Encyclopaedia Britanica** বলেন:

> "At a still pre-historic stage, it is believed that an inflow of what are losely called Dravidian races made its way through Baluchistan from Western Asia and slowly penetrated India to the far south."

বলা বাহুল্য **'Western Asia'** বলতে ব্যাবিলন বা মেসোপোটেমিয়াকেই বুঝায়। এবং ঐ অঞ্চলই ছিল সেমিটিকদের আদিম বাসভূমি।

H.J. Fleure তাঁর "The Dravidian Element in Indian Culture" নামক গ্রন্থে বলেন :

"Who, then, are the Dravidians? What racial affinity have they with the populations outside India? How did they come? After much controversy, it is now, I believe, generally agreed that the main racial element in the Dravidian population is a branch of the Mediterranian race......The Mediterranian races probably came from East Africa whence some of them wandered via Arabia and South-Persia to India."

দ্রাবিড় জাতি যদি পশ্চিম-এশিয়া থেকেই এসে থাকে, তবে স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই প্রমাণিত হয় যে তারা ছিল সেমিটিক নরগোষ্ঠিরই এক শাখা। কাজেই বলা যেতে পারে সিন্ধু-সভ্যতা ছিল সেমিটিক সভ্যতারই প্রতিরূপ। উভয় সভ্যতার সাদৃশ্যের কথা অনেক ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন। H. J. Fleure বলেন :

"That in so for as the Dravidian civilisation was derived from outside sources, its origin is to be traced to Egypt and Mesopotamia, linked up with India by sea commerce."

বস্তুতঃ দ্রাবিড়জাতি যে সেমিটিকদিগেরই জ্ঞাতি-ভাই ('cusins') এবং তারা যে টাইগ্রো-ইউফ্রেটিস ও নীলনদের উপত্যকা থেকেই ভারতে এসেছিল, তা এখন একরূপ নিশ্চিতরূপে অবধারিত।

সেমিটিক কারা?

এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগবে : দ্রাবিড় যদি সেমিটিক হয়, তবে সেমিটিক কারা? তারা কি ব্যাবিলন বা মেসোপোটেমিয়ারই আদিম বাসিন্দা, না তারাও অন্য কোনো দেশ থেকে আগত?

সেমিটিক অর্থে আরব, ইহুদী, আহিরীয়, ব্যাবিলনীয়, ফিনিসীয়, ও মিসরীয় জনগোষ্ঠিকেই বুঝায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আরবেরাই হচ্ছে আদি ও অকৃত্রিম সেমিটিক, আর আরবদেশই হচ্ছে সেমিটিকদের আদিম বাসভূমি।

এ সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত ঐতিহাসিকই এখন একমত। কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় ঐতিহাসিকের মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করছি:—

Sayce বলেন:

"The Semitic traditions conclusively prove that Arabia was the primitive home of the Semities".

Schrader বলেন:

"Religious anecdotes, philological researches, historical and geographical evidences prove conclusively that the original home of the Semitic races was in Arabia."

Hitti বলেন:

"Arabia was the cradle-land of the Semitist."

অতএব বলা যায় সিন্ধু-উপত্যকার দ্রাবিড়-সভ্যতার সঙ্গে আরব বা সেমিটিক সভ্যতার পরোক্ষ সংযোগ ছিল।*

আর্য-সভ্যতা

এইবার আর্য-সভ্যতার বিভিন্ন দিকের উপর কিছুটা আলোকপাত করা যাক।

আর্য কারা? কোথায় তাদের উৎপত্তি? কোথা থেকে কেমন করে কোন্ পথ দিয়ে কোথায় তারা গেল? এসব প্রশ্নের আজ পর্যন্ত কোনো সুমীমাংসা হয় নি। আরবদের জন্যে যেমন আরব দেশ, মিসরীয়দের জন্যে মিসর, ব্যাবিলোনিয়ানদের জন্যে ব্যাবিলন, আর্যদের জন্যে তেমন কোনো ভূভাগ বিশেষভাবে চিহ্নিত করা নেই। আর্যজাতির কীর্তিমালার কোনো ধ্বংসাবশেষও আজ পর্যন্ত কোথাও আবিষ্কৃত হয়নি। বহু প্রাচীন জাতির সভ্যতার

* ইহুদীরা বলে হযরত নূহের দুই পুত্র: শেম ও হেম। শেমের পুত্রেরা ইহুদী এবং তারাই প্রকৃত সেমিটিক; আর হেমের পুত্রেরা হেমিটিক অর্থাৎ আরব। কিন্তু বর্তমানে এ মত আর গ্রাহ্য নয়। সেমিটিক ভাষাভাষী সকল নরগোষ্ঠীকেই এখন সেমিটিক বলা হয়।

নিদর্শন বহু দেশে বিদ্যমান, (যেমন ব্যবিলন, মিসর, নিনেভা, হরপ্পা, ময়েনজোদারো, ট্যাক্‌সিলা ইত্যাদি) তেমন আর্য-সভ্যতার নিদর্শন কোন্‌খানে আছে, কেউ জানেনা। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস (এম-এ, বি-এল) মহাশয়ের মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য :

"The Indo-Aryans claim that they are the most ancient in India, but that claim is false. Indian has no ancient monuments or relics like Egypt, Babylonia or Assyria."

তিনি আরও বলেন :

"The ancient monuments, hitherto discovered in India, do not go beyond the Buddhistic era, i,e, the 6th century B.C. which, compared with Babylonian, Assyrian and Egyptian monuments, are but products of yesterday. And yet strange and absurd as it could seem, the Hindus claim to be the most ancient civilised people of the world, more ancient than even the pre-dynastic races of ancient Egypt...Such a claim, based as it is on mere tradition, and probably kept alive by sentimental vanity and not founded on any tangible proofs, is rightly dismissed by historians as unworthy of any credence or serious consideration."

আর্য-ধর্ম

আধুনিক হিন্দুধর্মও আর্যদের দান নয়। এর অধিকাংশ রীতি-পদ্ধতিই দ্রাবিড়দের কাছ থেকে ধার-করা (যেমন ত্রিশূল, শিবলিঙ্গ ইত্যাদি)। Jhon Marshall বলেন :

"There is enough in the fragments we have recovered about the religious articles found on the sites to demonstrate that this religion of the Indus people was the lineal progenitor of Hinduism."

সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় ঐতিহাসিক K. M. Panikkar বলেন :

"One thing is certain, and can no longer be contested ;

Civilisation did not come to India with the Aryans—not only is Indian civlisation pre-Vedic, but the essential features of the Hindu religion, as we know it today, was perhaps present in Mohenjo-Daro...The doctrine of Aryan origin of Hindu civilisation has clearly to be greatly modified."

আর্য-লিপি (?)

মানব-সভ্যতার এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হচ্ছে লিপিজ্ঞান। সেই লিপিও আর্যদের দান নয়। বৈদিক সাহিত্যের কোথাও এমন প্রমাণ নেই যার দ্বারা জানা যায় যে প্রাথমিক আর্যরা লিপিচর্চা করতো। শ্রুতি ও স্মৃতিই ছিল তাদের জ্ঞানচর্চার প্রধান উপকরণ। কাজেই আর্যদের কাছ থেকে ভারতীয়েরা লিপিজ্ঞান শিখে নাই, শিখেছিল সেমিটিকদের কাছ থেকে। বস্তুতঃ লিপি-আবিষ্কার যে সেমিটিক জাতির এক অবিস্মরণীয় কীর্তি, এ কথা সর্ববাদী-সম্মত। Mr. Taylor বলেন:

Among the things in this world which appear to be certain, nothing is more certain than that they (the Semitic people) invented our Alphabet".

এই লিপিজ্ঞান দ্রাবিড়রাই ভারতে এনেছিল। Buhler-এর মতে অশোক-লিপি দক্ষিণ-আরব থেকে নেওয়া হয়েছিল। এ সম্বন্ধে Rawlinson বলেন:

"The Brahmi script, the parent script of India, was borrowed form Semitic sources, probably about the 7th Century B.C."

বস্তুতঃ বৈদিক যুগে যে কোনোই লিপি ছিল না, এবং ভারতীয় লিপি যে দক্ষিণ আরব থেকে গৃহীত হয়েছিল, এ সম্বন্ধে Buhler, Weber, Taylor প্রভৃতি প্রাচ্যলিপি-বিশারদগণ, এমন কি ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও, একমত।

তাহলে একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, আর্য-সভ্যতার দাবী

বহুলাংশেই অসার। চিন্তাশীল ঐতিহাসিকেরা আর্য-থিওরীর অসারতা খুব ভালোভাবেই হৃদয়ঙ্গম করেছেন। তাই অনেকেই এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন। নিম্নের উদ্ধৃতি সমূহ থেকেই বুঝা যাবে এই থিওরীর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া কতো গভীর ও ব্যাপক।

আর্য-থিওরীর অসারতা

J.H. Fleure তাঁর "Dravidian Element in Indian Culture" নামক পুস্তকে বলেছেন:

"The great obstacle to a right appreciation of the Dravidian influence in the evolution of Indian culture is the wide currency and established position of what may be called 'Aryan myth.' Indians cling to the theory that they are Aryan. The word 'Aryan' is legitimate enough, provided the definite meaning is attached to it as a name for the invaders from the North-West who intorduced the Sanskrit language into India. It is illegitimate enough if used to imply the theory popularised by Max Muller that an ancient Aryan race of men, superior to other races, spread form the 'original Aryan Home' somewhere in Europe, displacing the previous occupants and bequething to their descendants the various languages of the Indo-Germanic family. All attempts to harmonise that theory with the facts have broken down hopelessly."

আর্য-থিওরী যে অসার, অবাস্তব এবং সেমিটিক বিদ্বেষ-প্রসূত, নিম্নের উদ্ধৃতি থেকে তা আরও সুস্পষ্ট হবে:

"The antiquity of Hindu culture was formerly much over-estimated. This combining with the assumption (now considered naive) that ancient linguistic and genetic relationships were complimentary produced a notion that ther

was a sort of parent 'Aryan race'. The word thus became a favourite in racistic literature of the period of Gobineau, hence also in the intellectual aparatus of 20th century German anti-Semitism. These racial theories, old and new, are now regarded as historical nonsense."

—(Columbia Encyclopaedia)

এইসব বিবেচনা করেই অনেক পণ্ডিত আর্য-থিওরীকে শুধু একটা আবেগ-প্রবণ কল্পকাহিনী বলেই মনে করেন। Fleure তাই সোজাসুজিই বলে দিয়েছেন :

"In India the Aryan theory rests upon a solid basis of sentiment."

আর্যরা যে খুব শান্ত-শিষ্ট ও সভ্য ছিল, অনেকে তাও বিশ্বাস করেন না। নিম্নের উদ্ধৃতিগুলিই তার প্রমাণ :

"If we may judge form the two cases of the Greeks and the Persians, the Aryans came rather as barbarians, who conquered, but accepted the superior civilisation of their subjects"—Historians' History of the World.

"The Indo-European races are represented to be a pious flock of a highly peace-loving type. This is not only a false but perverted statement of facts......The Aryan comes out of a race that is the adept in the art of befooling mankind and leading them into erroneous ways. And in this kind of work the Aryan is a past master...The Aryans then must be regarded as relatively barbaric invaders, provided by their horses with an immense advantage of rapid and concerted movement".—(Pillai)

পরিশেষে Pillai চরম কথা বলে দিয়েছেন :—

"The term Indo-European is an ignorant title coined by ignorant Europe in an ignorant mood."

আর্য-থিওরীর উৎপত্তি

এইবার আর্য-থিওরীর উৎপত্তির কথা বলা যাক্। তা হলেই এর ভিতরকার অসারতা আরও সুস্পষ্ট হবে।

প্রাচীন কালের ইতিহাসে 'আর্য' নামে কোনো নরগোষ্ঠির উল্লেখ নাই। আর্য-থিওরী অতি আধুনিক কালের সৃষ্টি। এর বয়স বড়জোর দেড়শ বছর। এর আগে আর্য-অনার্য বলে কোনো কথাই ছিল না। এই থিওরী হিন্দুদের সৃষ্টিও নয়। এটা ইউরোপের কারসাজি—বিশেষ করে জার্মানীর। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশের তদানিন্তন চীফ্ জাষ্টিস ও এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের প্রেসিডেণ্ট **Sir William Jones** সোসাইটির এক অধিবেশনে একটি মূল্যবান গবেষণামূলক ভাষণ দান করেন। তাতে তিনি সংস্কৃত পার্শী গ্রীক ল্যাটিন জার্মান ইংরাজী প্রভৃতি কয়েকটি ভাষার কতিপয় শব্দ ও ধাতুরূপের বিশ্লেষণ করে দেখান যে, ঐ সব ভাষার মূলে ঐক্য আছে। এতেই তিনি মনে করেন, ঐসব ভাষা মূলতঃ এক সাধারণ ভাষা থেকে উদ্ভূত; অর্থাৎ আদিতে ঐসব ভাষাভাষী লোকেরা এক-পরিবারভুক্ত ছিল এবং তারা এক সাধারণ ভাষায় কথা বলতো। কালেকালে জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারা নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ায় নানা জাতির সৃষ্টি হয় এবং সেই সঙ্গে তাদের ভাষাও পৃথক ও স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে।

এই নূতন ইংগিত পেয়ে ইউরোপে (বিশেষ করে জার্মানীতে) তুলনা-মূলক ভাষাতত্ত্বের (**Comparative Philology**) সৃষ্টি হয়। **Klaproth, Bopp, Max Muller** প্রমুখ জার্মান পণ্ডিতগণ এই ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত মিসর তত্ত্ববিদ (**Egyptologist**) **Sir Thomas Young** সর্বপ্রথম **'Aryan' 'Indo-European'** কথা দুটি ব্যবহার করেন। সংস্কৃত, পার্শী, গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান, কেল্টিক এবং স্লাভনিক—এই সাতটি ভাষা-গোষ্ঠিকে তখন থেকে "**family of Indo-European language** নামে অভিহিত করা হয় এবং ঐ সব ভাষাভাষী জাতিসমূহকে **Indo-European races** নামে চিহ্নিত করা হয়।

এই সময় থেকেই আর্যজাতি এবং আর্য-সভ্যতার প্রচার আরম্ভ হয়।

অতি প্রাচীন কালে 'আর্য নামে এক সুসভ্য জাতি এশিয়া বা ইউরোপের কোনো একস্থানে বাস করতো—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস-সাগর মন্থন করে ফিরছে এবং গোঁজামিল দিয়ে তাদের থিওরীকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

আর্য-থিওরী যে একটা অভিসন্ধিমূলক রাজনৈতিক চাল, সে কথা এখন ক্রমেই সুস্পষ্ট হচ্ছে। এর মূলে কোনো সত্যানুসন্ধিৎসা নেই। উৎকট সেমিটিক-বিদ্বেষ এবং অন্যান্য দুর্বল জাতিদের উপর প্রভুত্ববিস্তারের অসাধু উদ্দেশ্য থেকেই এই থিওরীর জন্ম। জার্মান জাতির গোঁড়ামি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। জার্মানরা মনে করে জগতের মধ্যে তারাই সর্বাপেক্ষা কুলীন জাতি। তাদের বিশ্বাস তারা হচ্ছে **"herrenvolk" (master race)**—অর্থাৎ সকল জাতির উপর প্রভুত্ব করবার অধিকার একমাত্র তাদের। এই উৎকট আর্যামির ফলেই জগতে দুটি মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে।

অসাধুতার প্রমাণ

একটা অসাধু উদ্দেশ্য থেকেই যে আর্য-থিওরী উদ্ভুত, তার দু-একটা প্রমাণ এখানে দিচ্ছি।

গোড়াতে **Dr. Young** তাঁর প্রবন্ধে ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষাগোষ্ঠির যে তালিকা দিয়েছিলেন, সেই তালিকার সঙ্গে বর্তমান তালিকার মিল নেই। **Young**-এর তালিকায় বাস্ক্, ফিনিগ এবং সেমিটিক ভাষা সমূহও ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষারূপে স্থান পেয়েছিল। **Cambride History of the World** একথা সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন:

> "Examination of the article, however, shows that Dr. Young meant by Indo-European something quite different from its ordinarily accepted signification. For under the term he included not only the languages now known as Indo-European, but also Basque, Finish and Semitic languages."

Young-এর তালিকা থেকে সেমিটিক ভাষাগুলিকে বাদ দেবার হেতু কী?

ভাষার রূপ ও প্রকৃতি জাতি-নির্ণয়ের কোনো নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি নয়। ভাষার ধাতুরূপ বা শব্দগত ঐক্য যদি জাতিগত ঐক্যের প্রমাণ হয়, তবে আরবী ভাষার সঙ্গেও তো ইংরাজী ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষার অতি নিকট-সম্বন্ধ রয়েছে। দৃষ্টান্ত দেখুন:

আরবী	ইংরাজী
আরদ্ (মাটি)	**Earth**
কান্দিল্ (বাতি)	**Candle**
কুৎ (বিড়াল)	**Cat**
কাফুর (কর্পুর)	**Camphor**
সালাৎ (প্রণতি)	**Salute**
কাফন (শববস্ত্র)	**Coffin**

এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। ল্যাটিন ও সংস্কৃতের সঙ্গেও এইরূপ মিলের অভাব নেই। বস্তুতঃ আরবী ভাষাই হলো পৃথিবীর আদিম ভাষা। এই জন্যই একে 'উম্মুল্ আল্সিনা' বলা হয়। কাজেই ভাষার মাধ্যমে মানব-গোষ্ঠির সম্পর্কের ইতিহাস জানতে হলে আরবী ভাষাকে কিছুতেই বাদ দেওয়া চলে না। সেমিটিক ভাষার তুলনায় ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠির বয়স অতি অল্প। এ সম্বন্ধে **Stuart Pigott**-এর উক্তি প্রণিধান যোগ্য:

"To-day we can recognise the Indo-European group of languages as a relatively junior member of the old-world linguistic family, evolving at a time when such languages as Sumerian and those in the Hametic and Semitic group were of respectable antiquity."

বস্তুতঃ সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। **Max Muller** তাই বলেন যে সংস্কৃত কোনো ভাষার 'জননী' নয়, 'বড় বোন' হতে পারে:

"If Sanskrit had been the primitive language of mankind or at least the parent of Greek, Latin and German, we

might understand that it should have led to quite a new classification of these tongues. But Sanskrit does not stand to Greek, Latin, the Tutonic, Celtic and Slavonic languages in the relation of Latin to French, Italics and Sanskrit, as we saw before, could not be called the 'parent' but only the 'elder sister'."

কাজেই ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ভাষার ঐক্য ও সামঞ্জস্যের উপর যে তাঁদের সাধের আর্য-থিওরী দাঁড় করিয়েছেন তা নিতান্তই ক্ষণভঙ্গুর। Pillai ঠিক বলেছেন:

"So reviewing the whole work done by the philological school, we state that their labours have ended in failure. And failure is not their only demerit. They by their bad study have prevented the world from getting at a true knowledge of the Indo-European phenomenon."

আর্য-থিওরীর অন্তরালে

উপরে যতোটুকু বলা হয়েছে, আশা করি তা থেকেই সকলে আর্য-থিওরীর স্বরূপ চিনতে পেরেছেন। এখন দেখা যাক এত তোড়জোড় করে এই থিওরী প্রচার করবার হেতু কী।

পূর্বেই বলেছি, উৎকট সেমিটিক-বিদ্বেষ এবং গভীর রাজনৈতিক দুরভিসন্ধিই আর্য-থিওরীর প্রেরণা ও উৎস-মূল। সকলেই জানেন, খৃষ্টান ও ইহুদীতে অহি-নকুল সম্বন্ধ। ইহুদীরা যিশুখৃষ্টকে পয়গম্বর বলে স্বীকার করেনি, বরং তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করবার চেষ্টা করেছে। কাজেই ইহুদীদের উপর খৃষ্টানদের এবং খৃষ্টানদের উপর ইহুদীদের চিরকাল একটা জাতক্রোধ রয়ে গেছে। ইহুদীদের কোনো প্রকার স্বীকৃতি না দেওয়াই হচ্ছে খৃষ্টানদের প্রধান লক্ষ্য।

ইহুদীদের ন্যায় আরবজাতিও খৃষ্টান জগতের চিরশত্রু। খৃষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদের বিরুদ্ধে একমাত্র ইসলামই প্রকাশ্য প্রতিবাদ জানিয়েছে। এই-

জন্যই সমগ্র খৃষ্টান জগৎ ইসলামকে তাদের পথের মস্তবড় কণ্টক মনে করে। মধ্যযুগে ক্রুসেডের ইতিহাস পড়লেই বুঝা যাবে খৃষ্ট-জগৎ কি ভাবে এক এক সময়ে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। ইসলামী রাষ্ট্রগুলিকে নিশ্চিহ্ন করাই ছিল তাদের পণ। কাজেই ইহুদীদের ন্যায় আরব জাতি তথা মুসলিম-জাহানও খৃষ্টান জাতির চিরশত্রু। বলা বাহুল্য ইহুদী ও আরব—উভয়েই সেমিটিক।

মানব-সভ্যতার ইতিহাস কিন্তু বলছে—জগতে সভ্যতার আলোক জ্বেলেছিল সর্বপ্রথম এই সেমিটিক জাতি। দক্ষিণ আরব (ইয়েমেন) এবং ব্যাবিলনই ছিল সভ্যতার আদিম লীলাভূমি। সভ্যতার অন্যতম প্রধান উপকরণ যে লিপি, তাও অবিসম্বাদিতরূপে সেমিটিকদের আবিষ্কার। ইয়েমেন, ব্যবিলন, মিসর একই সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্র। অন্যান্য ক্ষেত্রেও সেমিটিকদের দান অনস্বীকার্য।

কিন্তু এ কথা মেনে নিলে খৃষ্টান ও অন্যান্য নন-সেমিটিক জাতি সমূহের মাথা চিরদিনের মতো হেঁট হয়ে যায়। চির-শত্রুদের শ্রেষ্ঠত্বই তা হলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। খৃষ্টান-জগৎ তাই উঠে পড়ে লাগলো এমন একটা থিওরী দাঁড় করাতে যার দ্বারা সেমিটিক থিওরী বানচাল হয়ে যায় এবং প্রমাণ করা যায় যে আদিম সভ্যতা সেমিটিকদের দান নয়, অন্য কোনো নন-সেমিটিক জাতির। এই দুরভিসন্ধিই আর্য-থিওরীর উৎস-মূল।

পাঠক স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছেন : উপরোক্ত তথাকথিত আর্য ভাষাগোষ্ঠি থেকে তাই প্রথমেই সেমিটিক ভাষাগুলিকে বাদ দেওয়া হয়েছে, যদিও সেমিটিক ভাষা সমূহ আর্য ভাষাগোষ্ঠি থেকে বহু প্রাচীন ও মর্যাদাসম্পন্ন।

সেমিটিক সভ্যতাকেও এখন অনুরূপ কৌশলে অবজ্ঞার অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। আগে ব্যাবিলনকেই মানব-সভ্যতার আদিম ধাত্রীগৃহ (Cradle of Civilisation) বলা হতো ; কিন্তু ব্যবিলনের সভ্যতাকে এখন আর পূর্ব-মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না। ব্যবিলনের বুকে আর একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। আর্য-থিওরীষ্টদের এ এক অভাবনীয় নূতন টেকনিক।

আর্য-থিওরীর নূতন রূপ

আর্য-থিওরীর নূতন সংস্করণ হচ্ছে সুমেরিয়ান থিওরী। এতদিন সবাইকে একথা স্বীকার করে নিতে হয়েছে যে, সেমিটিকেরাই ছিল ব্যাবিলন সভ্যতার জন্মদাতা আর সেই সভ্যতাই ছিল পৃথিবীর আদিম সভ্যতা। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে এক নূতন থিওরী প্রচার করা হলো। বলা হলো ব্যবিলন সভ্যতা সেমিটিকদের সৃষ্টি, সন্দেহ নেই, কিন্তু সে-সভ্যতাই সর্বপ্রাচীন নয়। সেমিটিকেরা যখন ব্যবিলনে আসে, তার আগে ব্যবিলনের দক্ষিণাংশে 'সুমার' নামক একটি প্রদেশ ছিল; সেই প্রদেশের অধিবাসীরা সেমিটিক ছিল না, ছিল নন-সেমিটিক। তারাও সুসভ্য ছিল। সেমিটিকরা তাদের কাছ থেকে সভ্যতার অনেক কিছু ধার করে। কাজেই বলা যায় সুমেরিয়ান সভ্যতাই ছিল সেমিটিক সভ্যতার অগ্রবর্তী।

এখানেই শেষ নয়। সুমেরিয়ানরা নন-সেমিটিক ছিল বলেই পণ্ডিতেরা ক্ষান্ত হন নি; সুমেরিয়ানরাই যে সেই হারানো আর্য জাতি (lost Aryan tribes) একথাও জোরে শোরে তারা প্রচার করলেন। এমন কি Waddel প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা উল্লাসের আতিশয্যে এ কথাও ঘোষণা করলেন যে, ইংরাজেরা সুমেরিয়ানদেরই বংশধর।

এক ঢিলে দুই পাখী মারা হলো। সেমিটিকদের গর্বও খর্ব করা হলো, সঙ্গে সঙ্গে আর্যদের জন্য একটা আবাস-ভূমিরও ব্যবস্থা হয়ে গেল।

সুমেরিয়ান থিওরীর আবিষ্কারের ইতিহাস আরও চমৎকার। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে British Museum-এ নিনেভার ভূগর্ভ থেকে উত্তোলিত একখানি ইষ্টক-ফলক এসে হাজির হলো। বিখ্যাত Egyptologist Sir Henry Rawlinson সেই ইষ্টক-ফলকে নূতন ধরনের এক রকম লিপিকার্য খোদিত দেখতে পেলেন। পরীক্ষা করে তাঁর মর্মে হলো ইষ্টক-ফলকটি অ্যাসিরিয়ার রাজা অসুর বানিপালের লাইব্রেরীতে সংলগ্ন ছিল। ইষ্টক ফলকে খোদিত লেখাটি তিনি সুমেরীয় লিপি বলে অনুমান করলেন। এই লিপির আকৃতি ও প্রকৃতি সেমিটিক লিপি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এ থেকেই তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে সেমিটিকদের আগমনের পূর্বে দক্ষিণ-

ব্যবিলনে সুমেরিয়ান নামক এক অতিসুসভ্য জাতি বাস করতো। সেমিটিকরা তাদের জয় করে বটে, কিন্তু তাদের কাছ থেকে সভ্যতার অনেক কিছু ধার করে। কাজেই সেমিটিক সভ্যতা আদি ও অকৃত্রিম নয়।

বলা বাহুল্য, এই থিওরীও আর্য-থিওরীর মতোই অলীক ও অসার। এর বিরুদ্ধে কয়েকটি যুক্তি এখানে পেশ করা যেতে পারে।

প্রথম কথা হচ্ছে, যে-ভাষাগত ঐক্য আর্য-থিওরীর প্রধান অবলম্বন বা ভিত্তিমূল, সেই ঐক্যসূত্র এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সুমেরিয়ান ভাষা থেকে যে সংস্কৃত, পার্শী, গ্রীক, ল্যাটিন ইত্যাদি আর্য ভাষা সমূহ উদ্ভুত হয়েছিল তার প্রমাণ কি? কোনো ভাষাতত্ত্ববিদকে আজ পর্যন্ত এমন কথা বলতে শুনিনি। এমন কি যে হীব্রু ভাষাকে ইহুদীরা জগতের আদি ভাষা বলে দাবী করে, তাও প্রথম মানব-ভাষা নয়, কারণ প্রবাদ আছে যে ব্যবিলনে যে ভাষা-বিভ্রাট (Confusion of tongues) হয়, তার ফলেই বারোটি ভাষার জন্ম হয়। হীব্রু ভাষা তাদের মধ্যে অন্যতম:

> "Of the language of Adam we know nothing; but if Hebrew, as we know it, was one of the languages that sprang form the confussion of tongues at Babel, it could not well have been the language of Adam or of the whole earth when the whole earth was still of one speech."
>
> —(Max Muller)

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, সুমেরিয়ান ভাষা কোনো মৌলিক ভাষা কিনা সে সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এ বিষয়ের অন্যতম বিশেষজ্ঞ L. W. King বলেন:

> "...a theory was propounded by M. Halviy to the effect that Sumerian was not a language in the linguistic sense of the term. The contention of Mr. Halivy was that the Sumerian compositions were not written in the language of an earlier race, but represented a cabalistic method of writing, invented and employed by the Baby-

lonian priesthood. In his opinion, the texts were Semitic compositions, though written according to a secret system of code and they could only have been read by a priest who had the key and had studied the jealously guarded formula. On this hypotheses it followed that the Babylonians and Assyrians were never preceded by a non-Semitic race in Babylon and all Babylon civilisation was conseqently to be traced to Semitic origin."

যদি ধরে নেওয়াও যায় যে, সুমেরিয়ানরা একটা স্বতন্ত্র জাতি ছিল, তবে এখানেও সেই একই প্রশ্ন জাগবে : সুমেরিয়ানরা কোথা থেকে এলো ? এ প্রশ্নেরও কোনো জবাব নেই। King তাই বলছেন :

"Of the original home of the Sumerians form which they came to the fertile plains of Southern Babylonia, it is impossible to speak with confidence."

অনেকে সুমেরিয়ানদের অস্তিত্ব স্বীকার করলেও এই মত পোষণ করেন যে, সমগ্র ব্যবিলনের সভ্যতা সেমিটিক ছাড়া অন্য কিছু হওয়া অসম্ভব। Dr. H. F. Helmolt তাঁর History of the World গ্রন্থে বলেন :

"The History of Babylonia itself is Semitic, that of the adjoining nations, so far as they were subject to its influence is also Semitic."

বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ Hall বলেন : ব্যবিলনে সুমেরিয়ানদের আগমনের পূর্বেও সেমিটিক জাতিরাই বাস করতো :—

"There were probably inhabitants in Mesopotamia before the Sumerians arrived and it is hardly probable they can have been of other than Semitic race."

Historians' History of the World সুমেরিয়ানদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ করেন :

"Assyriologists are not fully agreed as to the share which

the non-Semitic race had in the early civilisation. It has even questioned whether these so-called Sumerians really existed at all. In any event, the Semitic Babylonians acquired full control at a very early period."

নৃতত্ত্বের দিক থেকে দেখলেও দেখা যাবে সুমেরিয়ানরা স্বতন্ত্র কোনো জাতি নয়। আরবদের সঙ্গেই ছিল তাদের গঠন-সাদৃশ্য। ঐতিহাসিক Smith বলেন :

"Physical anthropologists seem united in treating the extant skulls of early Sumerians as being closely akin to modern Arab type."

কাজেই, যেদিক দিয়েই দেখি না কেন, আর্য-থিওরীর সমস্ত চেষ্টা যে ব্যর্থ হয়েছে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। **Chokallingam Pillai**-এর ভাষায় বলা যায়: **"The whole attempt be considered to have ended in failure."**

উপসংহার

এতক্ষণ আমরা আর্য-থিওরীর নানাদিক পরীক্ষা করলাম। এই থিওরী যে অন্তঃসারশূন্য এবং গভীর দুরভিসন্ধিমূলক, আশা করি সে কথা প্রমাণিত হয়েছে। মিথ্যা আভিজাত্যবোধ এবং উৎকট জাতি-বিদ্বেষই এর প্রধান প্রেরণা। এই থিওরী মানব-সভ্যতার ইতিহাসকে বিকৃত ও কলুষিত করেছে এবং মানবজাতির সত্যপরিচয়কে সবার চোখের আড়াল করে রেখেছে। এই থিওরী উৎকট জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করেছে, মানুষে মানুষে ভেদবুদ্ধি জাগিয়ে রেখেছে। পাঠান ও মোগল আমলে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত ছিল, কিন্তু জাতিবিদ্বেষ ছিল না। জাতিবিদ্বেষ বৃটিশ আমলের সৃষ্টি। আর এর প্রধান কারণই হচ্ছে আর্য-থিওরী। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের যে অবনতি, তার মূলেও আছে এই থিওরীর প্রভাব। কাজেই এই থিওরী যে মানবকল্যাণ-বিরোধী, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। সমস্ত কল্যাণকামী মানুষের উচিত এই থিওরীর অবসান ঘটানো। প্রতিক্রিয়া

অনেক আগেই শুরু হয়েছে। দ্রাবিড় ও অন্যান্য নন-আর্য জাতিদের মধ্যে পূর্বেই অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। বহুযুগের পুঞ্জীভূত রোষ ও অসন্তোষ গোপনে গোপনে কোথায় যেন ধূমায়িত হয়ে উঠেছে। হয়তো শীঘ্রই আসবে একটা যুগান্তকারী অগ্নি-বিপ্লব আর তার মধ্যে জন্মলাভ করবে আমাদের অনাগত দিনের নূতন ইতিহাস।

লেখক-সংঘ পত্রিকা

১৯৬১

আধুনিক কবিতা

বাংলা কাব্য-সাহিত্যে 'আধুনিক কবিতা' কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি করেছে। একে এখন গ্রহণ করাও কঠিন, বর্জন করাও কঠিন। সহজ পথে এ আসেনি; নানা দ্বন্দ্ব ও জিজ্ঞাসা সাথে নিয়ে এসেছে।

সর্বপ্রথম সমস্যা হচ্ছে এর সংজ্ঞা নিয়ে। 'আধুনিক কবিতা'র অর্থ কী? সাম্প্রতিক কবিতা? তাহলে কোন্‌খান থেকে কোন্‌খান পর্যন্ত এর সীমারেখা? কেউ তা বলে দিতে পারবে না। কারণ 'আধুনিক' কথাটা হলো আপেক্ষিক। কোনো নির্দিষ্ট সময়-রেখা দ্বারা সে চিহ্নিত নয়। আজ যা আধুনিক, কালই তা প্রাচীন; আবার আজ যা প্রাচীন একদিন তাও ছিল আধুনিক। নিরবচ্ছিন্ন একটানা স্রোতে বয়ে চলেছে কালের নদী; এ-নদীতে দুবার কেউ স্নান করতে পারে না। আধুনিক কবিতার দিনক্ষণ তাই পঞ্জিকা দেখে স্থির করা যাবে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, কাব্যের আধুনিকতা 'কালের কথা ততোটা নয় যতোটা ভাবের কথা।' সত্যি তাই। বয়সেই যদি হতো, তবে এই আধুনিকার বয়স হতো এখন একশ বছরেরও ওপর। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশে এর জন্ম এবং খ্যাতনামা ফরাসী কবি বোদলেয়ার এর জন্মদাতা। 'ষোড়শীবালার' মতো একটা স্বপ্নভরা নামের যাদুমন্ত্র দিয়ে সে এখন পর্যন্ত তরুণদের মন জয় করে রেখেছে।

আধুনিক কাব্য ইউরোপের সৃষ্টি। বাংলা দেশে এর ঢেউ এসে পৌঁছয় প্রথম মহাযুদ্ধের পরেপরেই। ১৯৩০ সালের কাছাকাছি সময়ে সুধীন দত্ত বোদলেয়ারের অনুসরণে 'কাব্যের মুক্তি' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করে তৎকালীন কবি-সাহিত্যিকদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেন। সেখান থেকেই বাংলাকাব্যে আধুনিক যুগের সূচনা। যাঁরা ঐ যুগকে এগিয়ে

নিয়ে এসেছেন, তাঁদের পুরোভাগে আছেন সুধীন দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে প্রভৃতি প্রগতিশীল কবিরা। বস্তুতঃ 'কল্লোল' যুগের কবিরাই ছিলেন এই নূতন পথের দিশারী আর পশ্চিম-সাগর থেকেই এসেছিল এই নব-কল্লোল।

আধুনিক কবিতার পরিচয় দিতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু বলেনঃ

"এই আধুনিক কবিতা এমন কোনো পদার্থ নয়—যাকে কোনো একটা চিহ্ন দ্বারা অবিকল ভাবে সনাক্ত করা যায়। একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের কবিতা, প্রতিবাদের কবিতা,—সংশয়ের ক্লান্তির সন্ধানের কবিতা।"

এর চেয়েও স্পষ্টতর পরিচয় দিয়েছেন আবু সাঈদ আইউবঃ

"—কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র ভাবমুক্ত (বা মুক্তি-পিয়াসী) কাব্যকেই আধুনিক কাব্য বলা যায়।"—(আধুনিক কাব্যপরিচয়ঃ দীপ্তি ত্রিপাঠী)

কথাটি ঠিক। তবে এর কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। আধুনিক কবি যে ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্র-বিরোধী, তা নয়; রবীন্দ্রনাথের মানসিকতা ভাব-ধারা ও কাব্য-রীতিরই তাঁরা বিরোধী। এবং এই একই কারণে রবীন্দ্র-নাথ যে-গোষ্ঠির কবি, সেই গোষ্ঠির (পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী) সবাইকেই তাঁরা সচেতন ভাবে অবজ্ঞা করে চলেন।

আধুনিক কবিরা রবীন্দ্র-বিরোধী কেন হলেন, তা বুঝতে হলে আধু-নিক কবিতার জন্ম-কথায় আমাদের ফিরে যেতে হবে।

পূর্বে বলে এসেছি আধুনিক কবিতার জন্মদাতা হচ্ছেন বোদলেয়ার। তখন ইউরোপীয় সাহিত্যে ক্লাসিক-রোমান্টিকে দ্বন্দ্ব চলছে। একঘেঁয়েমি এবং অতিশয়োক্তি দোষে রোমান্টিক কাব্য তার আবেদন হারিয়েছে। এ-কাব্যের অনেকখানিই ছিল মনোময় ও অবাস্তব। খনিজ পদার্থের মতো প্রকৃত কাব্যের (poesia) সংগে অনেক অকাব্যও (non-poesia) মিশে থাকতো। বোদলেয়ার পূর্বসুরিদের এই কাব্যরীতিতে সন্তুষ্ট হলেন না; তিনি চাইলেন অকাব্য থেকে কাব্যের মুক্তি। তিনি বললেনঃ কবিতা হবে এমন বস্তু—যার সবটুকুই হবে কাব্যময়। প্রতিটি পংক্তি হীরার

টুক্‌রার মতো জ্বল্‌জ্বল্‌ করবে, আর প্রত্যেকটি কবিতা হবে এক-একটি মণিহার। বাস্তব জীবনের গভীর সত্যানুভূতি ও বিচিত্র রহস্য-উদ্‌ঘাটনই হবে এ-কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বলা বাহুল্য এই আদর্শকে রূপ দিতে গিয়ে কিছুকিছু আঙ্গিক পরিবর্তনেরও প্রয়োজন দেখা দিল। শব্দের যথার্থ প্রয়োগ ও মিতব্যয়িতা, উপমা অনুপ্রাস ও রূপকের নব প্রয়োগ দ্বারা নবনব চিত্রকল্প সৃষ্টি ইত্যাদি অনেক কিছুই নূতন ভঙ্গী ও রূপসজ্জার প্রয়োজন হলো। এই নূতন ঢংএর প্রথম কাব্যগ্রন্থ হলো বোদলেয়ারের 'ফ্ল্যর দ্যু ম্যল'। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এর প্রথম প্রকাশ এবং সেই থেকেই আরম্ভ হলো কাব্যের নূতন যুগ।

ইংরাজি সাহিত্যে সর্বপ্রথম এই কাব্যরীতির প্রচলন করেন আইরিশ কবি ইয়েট্‌স্‌। তিনি ফরাসী জানতেন না। অনুবাদের সাহায্যে মোটামুটি ভাবে বোদলেয়ারের কাব্য তিনি পাঠ করেন। **Ezra Pound** ও **T. S. Eliot**-ও পরে বোদলেয়ারের অনুসরণে নূতন ভঙ্গীতে কাব্য রচনা করেন। **Ezra Pound** বোদলেয়ারের কয়েকটি পুস্তকের অনুবাদও করেন। হুইট্‌ম্যানও ইংরাজী সাহিত্যে বিশিষ্ট আধুনিক কবিদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে, ইয়েট্‌স, এজরা পাউণ্ড, হুইটম্যান বা এলিয়ট—এঁরা কেউ-ই আসলে ইংরাজ নন। এঁরা সবাই বিদেশী। আশ্চর্য যে, খাস কোনো ইংরেজ কবিই আজ পর্যন্ত আধুনিক কাব্যে খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি। এজরা পাউণ্ড তাই বলেছেন: **We speak a language that was English."** আভিজাত্যপূর্ণ বৃটিশ জাতের ধাতে হয়তো এই প্রগল্‌ভ আধুনিক কাব্য সহ্য হয় না। তাই এই বিড়ম্বনা।

এই হলো আধুনিক কাব্যের গোড়ার কথা।

বোদলেয়ার কী ধরনের কবিতা রচনা করলেন, তার ২-১টা নমুনা সামনে রেখে কথা বললে আমাদের আলোচনা সহজবোধ্য হবে। বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ থেকে এখানে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

মহাপ্রাণ এক বৃদ্ধা দাসীর মৃত্যুতে বোদলেয়ার তাঁর মাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন:

"মহাপ্রাণ সেই দাসী, তুমি যাকে ঈর্ষা করেছিলে
মগ্ন হলো ঘুমে আজ তুচ্ছ তৃণ-পল্লবের তলে।
তবু চলো, কিছু ফুল দিয়ে আসি তাকে একদিন
আহা মৃত, মৃত ওরা, কী বিরাট কষ্টের অধীন।
যবে রিক্ত তরুদল নিশ্বসিত ম্লান অক্টোবরে
মর্মর ফলক ঘিরে খেদময় বায়ু ঘুরে মরে।
তখন ঘুমোই যারা বেঁচে থেকে উষ্ণতায় লীন,
কী কঠিন ভাবে ওরা আমাদের, কী হৃদয়হীন।
ধরো, কোনো সন্ধ্যায় যখন কাঠ অগ্নিকুণ্ডে ফেঁসে
যদি তাকে দেখি শান্ত অস্পষ্ট চেয়ারে আসে বসে,
যদি ডিসেম্বরে, কোনো হিমস্রব নীল যামিনীতে
দেখি, সে কুঁক্‌ড়ে আছে এককোণে ঘরের নিভৃতে,
যদি উঠে আসে মৌন চিরন্তন শয্যাতল ফেলে
তার বুড়ো ছেলেকে আশ্রয় দিতে মাতৃচক্ষু মেলে
তা হলে স্খলিত অশ্রু দেখে তার পল্লবের তলে
সেই পুণ্য আত্মাকে উত্তর দেবো কোন্ কথা বলে?

কী মৌলিক ভাবগম্ভীর করুণ রসসিক্ত কবিতা। বাহুল্য নেই, অতিশয়োক্তি নেই; অস্পষ্টতা নেই, দুর্বোধ্যতা নেই; প্রতিটি শব্দ অপরিহার্য প্রয়োজনে সমুজ্জ্বল।

প্রকৃতি সম্বন্ধে বোদলেয়ারের কতো উন্নত অনুভূতি ছিল, নিম্নের কবিতায় তা সুস্পষ্ট:

"বলো আমাকে, রহস্যময় মানুষ,
কাকে তুমি সবচেয়ে বেশী ভালোবাসো?
তোমার পিতামাতা ভ্রাতা অথবা ভগ্নীকে?
পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নি কিছু নেই আমার।
তোমার বন্ধুরা?
ঐ শব্দের অর্থ আমি কখনো জানিনি।
তোমার দেশ?

জানিনা কোন্ দ্রাঘিমায় তার অবস্থান।
সৌন্দর্য ?
পারতাম বটে তাকে ভালোবাসতে—দেবী তিনি, অমরা।
কাঞ্চন ?
ঘৃণা করি কাঞ্চন—যেমন তোমরা ঘৃণা করো ভগবানকে।
বলো তবে, অদ্ভুত অচেনা মানুষ, কী ভালোবাসো তুমি ?
আমি ভালোবাসি মেঘ...চলিষ্ণু মেঘ...ঐ উচুঁতে...ঐ উচুঁতে...
আমি ভালোবাসি আশ্চর্য মেঘদল।"

—(অচেনা মানুষ)

বোদলেয়ারের প্রেমের কবিতাও বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা-প্রসুত। অনেকগুলিই তার আপন জীবনের প্রতিচ্ছবি। তার 'চুল' কবিতা এখানে উদ্ধৃত করছি:

"অনেক অনেক্ষণ ধরে তোমার চুলের গন্ধ
টেনে নিতে দাও আমার নিশ্বাসের সাথে
আমার সমস্ত মুখ ডুবিয়ে রাখতে দাও তার গভীরতায়
ঝরণার জলে তৃষ্ণার্তের মতো
সুগন্ধি রুমালের মতো তা নাড়তে দাও হাত দিয়ে।—
তোমার চুলে সম্পূর্ণ একটি স্বপ্ন বিজড়িত
সেখানে পালের আর মাস্তুলের ভিড়
তার মধ্যে অনেক বিশাল সমুদ্র, যাদের উপর দিয়ে,
মৌসুম বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যায় মোহময় দেশে,
আমাকে কামড়াতে দাও অনেকক্ষণ ধরে
তোমার ঘনকালো গুচ্ছ গুচ্ছ চুল
স্প্রিংএর মতো বেশামাল বিদ্রোহী তোমার চুল
আমি যখন দাঁত দিয়ে কুটকুট করে কাটি
আমার মনে হয় একটু একটু করে স্মৃতিগুলোকে খাচ্ছি।

বোদলেয়ারের অশ্লীল কবিতাও অনেক আছে। বাস্তব জীবনের সেগুলি নগ্নরূপ—'পাপ থেকে নিংড়ে বের করা সৌন্দর্য'। কতিপয় অশ্লীল কবিতা প্রকাশের জন্য তাঁকে আদালতে অভিযুক্ত করা হয় এবং তাতে তাঁর কিছু অর্থদণ্ড হয়। কিন্তু শ্লীলতার সীমা লংঘন করলেও বা অত্যন্ত যৌনগন্ধী (Sexy) বা পর্ণগ্রাফিক হলেও, সে সব কবিতার মধ্যেও অপূর্ব কাব্য-সৌন্দর্য রয়েছে। গভীর পরিতাপের বিষয়, কবি অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খলভাবে জীবন যাপন করেছিলেন এবং তার ফলে অকালে (মাত্র ৪৬ বৎসর বয়সে) বহু দুঃখকষ্টের মধ্যে তাঁকে প্রাণত্যাগ করতে হয়েছিল।

আধুনিক বাংলা কবিতা

বোদলেয়ারের আলোকে এইবার আমাদের আধুনিক বাংলা কবিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক্

আধুনিক বাংলা কবিতায় যেসব লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে, সেগুলি মোটামুটি এই :

(১) বর্তমান জীবনে ক্লান্তি ও নৈরাশ্য
(২) ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব
(৩) দেহের কামনা ও বাসনার বাস্তব-রূপায়ণ
(৪) মার্ক্সীয় দর্শনের প্রভাব
(৫) আধুনিক বিজ্ঞানের প্রভাব
(৬) মননধর্মিতা
(৭) প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ (যথা প্রেম সুন্দর কল্যাণ ধর্ম ইত্যাদিতে) সংশয় এবং অবিশ্বাস
(৮) পূর্বসুরীদের কাব্যরীতির প্রতি অবজ্ঞা ও তাঁদের পন্থা বর্জন।
(৯) বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি, পুরাণ ও ঐতিহ্যের ব্যবহার।
(১০) উপমা প্রয়োগের নবকৌশল
(১১) ভাব ও চিন্তাধারায় উল্লম্ফন
(১২) অব্যয় পদের বহুল এবং অনাবশ্যক প্রয়োগ
(১৩) দুরূহ শব্দের প্রয়োগ দ্বারা পাণ্ডিত্য প্রদর্শন

(১৪) বাক্‌রীতি এমং কাব্যরীতির সংমিশ্রণ

—(দেখুন ত্রিপাঠীর কাব্য-পরিচয়)

এই সঙ্গে কয়েকটি আধুনিক কবিতা পাঠ করলেই উপরোক্ত মন্তব্য-গুলির সত্যতা প্রমাণিত হবে:

সুধীন দত্ত

"মহাশূন্যের মৌনে পরিস্ফীত
বিবিক্তি আজ বেষ্টনী বিরহিত
অধুনায় নিশ্চিহ্ন অতীত—আগামী
নাস্তিতে নেতি স্বতঃসিদ্ধ প্রমা
অগতির গতি মনোরথ বৃথা লাগামই।"

—(প্রতীক্ষা : দশমী)

"অবশ্য অপ্রতিকার্য অন্তিম কুম্ভক
অনুত্তার্য নাস্তির কিনারা
বৈকালিক ষড়যন্ত্রে তুল্যমূল্য তুঙ্গ ধ্রুবতারা
ও মগ্ন চুক।

—(নৌকাডুবি : দশমী)

"মোদের ক্ষণিক প্রেম স্থান পাবে ক্ষণিকের গানে
স্থান পাবে, হে ক্ষণিকা শ্লথনীবি যৌবন তোমার
বক্ষের যুগল স্বর্গে ক্ষণতরে দিলে অধিকার
আজ আর ফিরবনা শাশ্বতের নিষ্ফল সন্ধানে।"

—(হৈমন্তী : অর্কেস্ট্রা)

জীবনানন্দ দাস

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে উড়ে ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে।
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে

পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে
আবার তাহারে কেন ডেকে আনো? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে
বেদনা জাগাতে ভালোবাসে?

—(মহাপৃথিবী)

"আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি এইখানে
বসে থাকি কামরাঙা লাল মেঘ যেন মৃত মনিয়ার মতো
গঙা-সাগরের ঢেউয়ে ডুবে গেছে, আসিয়াছে শান্ত অনুগত
বাংলার নীল সন্ধ্যা—কেশবতী কন্যা যেন এসেছে আকাশে
আমার চোখের পরে আমার মুখের পরে চুল তার ভাসে।

—(রূপসী বাংলা)

"আমরা মেঘের মতো হঠাৎ চাঁদের বুকে এসে
অনেক গভীর রাতে একবার পৃথিবীর পানে
চেয়ে দেখি, আবার মেঘের মতো চুপে চুপে ভেসে
চলে যাই এক ক্ষীণ বাতাসের দুর্বল আহ্বানে
কোনো দিকে পথ বেয়ে। আমাদের কেউ কি তা জানে!
চলে যাই কোন্ এক রুগ্নহাত আমাদের টানে।
পাখীর মায়ের মতো আমাদের নিতেছে সে ডেকে
আরো-আকাশের দিকে—অন্ধকারে—অন্য কারো আকাশের থেকে।

—(অনেক আকাশ : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

"গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত;
আমাকে কে জাগাতে চাও?
হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল,
হে স্মৃতি, হে হিম-হাওয়া,
আমাকে জাগাতে চাও কেন?
অরব অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চ্ছুলচ্ছুল শব্দে
জেগে উঠবো না আর;

তাকিয়ে দেখবো না নির্জন বিমিশ্র চাঁদ বৈতরণীর থেকে
অর্ধেক ছায়া গুটিয়ে নিয়েছে
কীর্তিনাশার দিকে।
ধানসিঁড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়ে থাকবো
—ধীরে—পউষের রাতে
কোনোদিন জাগবো না জেনে—
কোনোদিন জাগবো না আমি—কোনোদিন আর
—(বনলতা সেন)

বুদ্ধদেব বসু

আকাশে জমেছে মেঘ, পথ নিরিবিলি
সব চুপ; রাত দু'পহর
বাড়িগুলি অন্ধকার—পথের দুধারে
ঘুমায় শহর।
হঠাৎ পথের মোড়ে একটি বাড়ির
নিচের ঘরের জানালায়
দেখিলাম, ম্লান নীল ইলেকট্রীকের
আলো দেখা যায়।
নিলাম তাহার ফাঁকে পলকের তরে
একখানি শাদা হাত দেখে
দুইটি কবাট এসে বুজিল, তখনি
দুই দিক থেকে।
একখানা সাদা হাত, কয়টি আঙুল
আংটির হীরার ঝলক
মণিবন্ধে সরু রুলি, ম্লান-নীল আলো
চোখের পলক।

আমার চিন্তাধারা

আমার দুচোখ ভরে ঘুম নেমে এলো
সকল পৃথিবী অন্ধকার
এই কথা না জেনেই মৃত্যু হবে মোর---
হাতখানি কার।

—(কঙ্কাবতী)

বিষ্ণু দে

"কবে বলো প্রাত্যহিক তোমার শরীর মনে ঘরে
আমার প্রাণের বাষ্প নীড় পাবে তোমার আকাশে
যেখানে হাওয়ায় ভাসে
কখনো একাগ্র ঝঞ্ঝা, কখনো উন্মনা শুকতারা
নিদ্রাহীন আমার আকাশ।

---(অন্বিষ্ট)

"মধ্যবয়সী, তবুও তনু তোমার
আশ্বিন আলো ছড়ায় আমার মনে।
ফেলে দিই ভয় ফেরার পীত বোমার
জীবন ঘনায় তোমার আলিঙ্গনে।
তোমার বাহুতে আমার জীবন স্মৃতি
দ্বৈত-রচন, গত-অনাগত প্রীতি।
উপমা তোমার খুঁজিনিকো আকিতেন
এলেওনেরে তো সহজিয়া ত্রুবাদুর
হেলেনকে চাওয়া উদ্বাহু ফাঁসি জেনে
দেহমনে মনজীবনে ভেদ-আতুর
রোমাঞ্চ-গান করিনি প্রেম তোমার
অলকানন্দা অনন্তগতি তার।

—(সন্দীপের চর)

আরও উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। অমিয় চক্রবর্তী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র—অনেকের কবিতাই উদ্ধারযোগ্য। কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ তা থেকে বিরত রইলাম। আমাদের আলোচনার জন্য উপরের উদ্ধৃতিগুলিই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি।

পূর্ব-পাকিস্তানের আধুনিক কবিতা

এইবার আমরা আধুনিক কবিতার চতুর্থ স্তরে নামছি। পশ্চিম-সাগর থেকে যে 'কল্লোল' ইংলণ্ড হয়ে পশ্চিম বাংলায় এসে লেগেছিল, তার ঢেউ পদ্মা পাড়ি দিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানেও এসে পৌঁছালো। দেখা যাক এখানে সে কোন্ রূপে কোন্ বৈশিষ্ট্যে আত্মপ্রকাশ করলো।

আবুল হোসেন

"আমি কি জানতাম একদিন আমারও এ দশা হবে
রিক্সার কড়াই থেকে কলার খোসায় পা পিছলায়ে
টলোমলো সকাল-বিকেল হয়ে যাবে হাত-সাফাই
রেশন শপের ভীড়ে। আপিসের লাইনে দাঁড়িয়ে
রিফু করা জামার পালিসে ঢেকে হতাশার ছাই
করবো ফেরি যা কিছু সাধের বলে শিখেছি শৈশবে
কিংবা ভুলতে হবে সেই পাঠ যা গলা চিরে ঘামে গলে
মুখস্ত করিনি শুধু পরীক্ষার কাজে লাগবে বলে?
কল্‌কে পাই বর্তে যাই এরণ্ডের মাঝে বৃক্ষ বনে
সিংহের মেকাপে যতো শেয়ালেরা আসর জমায়
আমিও তাদের সঙ্গে উঠি বসি।"

—(সংলাপ)

সৈয়দ আলী আহ্‌সান

"প্রতদিন বারবার নিঃসন্দেহে একথা জেনেছি
জেনেছি সূর্যের সাক্ষ্যে কিছু নেই আশ্বাসের মতো
জীর্ণ হয়ে ঝরে গেছে সব স্বপ্ন, সমস্ত বিশ্বাস---
সমস্ত নিঃশেষ করে একটি সত্যের মধ্যে হঠাৎ জেগেছি
উন্মুখ দেহের প্রাণে মৃত্যু নিয়ে হঠাৎ বেঁচেছি।"

—(অনেক আকাশ)

শামসুর রহমান

"জানিনা রাত্রির কানে কার নাম প্রার্থনার মতো
বলো তুমি ঘন ঘন অন্ধকার নিশ্বাসের স্বরে,
পূবের জানালা খুলে গুণ্‌গুণ্‌ গান গেয়ে শেষ
যখন শয্যায় জ্বলে দেহ, কার মুখ ভেবে
তোমার চোখের হ্রদে নামে সব ঘুমের অপ্সরী
কার স্বপ্ন দেখে, কার তীব্র চুম্বনের প্রতীক্ষায়
তোমার যুগল স্তন স্বর্গ হয় রাত্রির নরকে
শেষ ক্ষমা চেয়ে নেবে পরিচিত পৃথিবীর কাছে
কোন্‌ ক্ষণে, জান্‌বোনা কোনোদিন—কোনোদিন তবু।

—(প্রথম গান : দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে)

"ইচ্ছা আর অনিচ্ছায় জীবন ভোর কাম ঠেলে
হায় রে তুমি কীই বা পেলে।
দিনরাত্রি পুঁথির শত পাহাড় খুঁড়ে দেখলে শেষে
পোড়া কপাল, মুষিক মেলে।
কালের শেষে অকাল সাঁঝ নিমেষে এলো হঠাৎ ভেসে
দেখলে শেষে যৌবনের পরম গতি নিরুদ্দেশে।"

—(ঐ)

আলাউদ্দীন আল-আজাদ

সহসা অবাক লাগে ছিপছিপে নদী আর উবু জনপদ
কাঁপে কার খরথর সজোর ঘোড়ার খুরে বনঝোপগুলি
কান খাড়া স্নেহাতুর হরিণ শিশুর মতো খড়ের বাসায়
কোকিলের বলাবলি, কেন এত গান জমে গলায় গলায়,
হৃদয়ের ঢেউ ছুঁয়ে ? নিশীথ রাতের তারা, তারা ফেটে যায়
কাকের ডিমের মতো পরিমিত বেদনায় দালানের পিঠে
হতবাক হয়ে চাঁদের রূপালি খোসা।"

—(জলরং : মানচিত্র)

আরো দু'চারজন আধুনিক কবির লেখা উদ্ধৃত করতে পারতাম, কিন্তু তাতে লাভ হবে না বিশেষ, কেননা আমার উদ্দেশ্য অন্যরূপ। আমি দেখাতে চেয়েছি পশ্চিম বঙ্গের তুলনায় এখানকার কবিরা কোনো নিজস্ব পথ খুঁজে পেয়েছেন কিনা, অথবা 'সাতটা তারার তিমিরে' তাঁরাও ঘুরে মরছেন।

আধুনিক কবিতার দোষগুণ

আধুনিক কবিতার যে-পরিচয় উপরে দিলাম, তা থেকে এর দোষগুণ অনায়াসেই বুঝা যাবে। প্রথমেই এর দোষের কথা বলি। প্রথম এবং প্রধান দোষ হচ্ছে এর দুর্বোধ্যতা। আধুনিক কবিতা কেউ পড়তে চায় না। তার কারণ অনেকের কাছেই এ দুর্বোধ্য ও আবেদনহীন।

কিন্তু আধুনিক কবিতা এবং তাঁদের সমর্থকেরা এই দুর্বোধ্যতার একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁরা বলেন: এই দুর্বোধ্যতার জন্য লেখক যতো না দায়ী, তার চেয়ে বেশী দায়ী পাঠক। আর এটা অস্বাভাবিকও কিছু নয়, এটা হচ্ছে যুগলক্ষণ। আজকার যুগ গতির যুগ। আজ যুগমানসে কোনো ধৈর্য্য বা স্থৈর্য্যের অবকাশ নেই; চিন্তার গভীরতা নেই; উচ্ছ্বাস নেই, আবেগ নেই, আছে শুধু উদ্বেগ। আধুনিক কবিদের মনও তাই যুগমনের

সঙ্গে একসুরে বাঁধা। কেমন করে তারা তবে যুগপ্রভাবকে অতিক্রম করবে? কবিরা তো যুগেরই প্রতিনিধি। পাঠক যদি যুগের সঙ্গে তাল রাখতে না পারে, তার জন্য দায়ী হবে কে?

মনস্তত্ত্বের দিক দিয়েও আধুনিক কাব্য দুর্বোধ্য হতে বাধ্য। চিন্তার সংলগ্নতা বা সুসংগতি না থাকলেই কাব্য দুরূহ হয়। কিন্তু চিন্তার সংলগ্নতা আজ বিরল। আজ একই বিষয় নিয়ে বেশিক্ষণ চিন্তা করা আর সম্ভব নয়। বাইরের ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের মন এখন চঞ্চল। কবিদেরও অবচেতন মনে ক্ষণে ক্ষণে কতো চিত্রকল্পই না ভেসে ওঠে! ধরুন একজন তরুণ কবি চাকুরি করেন। অফিসের ফাইল ঘাটতে ঘাটতে হঠাৎ তার মন গিয়ে উপস্থিত হলো সিনেমাগৃহে; সেখান থেকে এক রেস্তোরাঁয়, এমন সময় ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং—বড় সাহেবের ফোনের ডাক---মুহূর্তে ভেঙে যায় রঙিন স্বপ্ন। আবার আসে তন্ময়তা। হঠাৎ জানালার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় পথ-চলা এক সুন্দরী মেয়ের মুখ---বাধা পড়ে তার চিন্তায়। আধুনিক কবিতাও ঠিক এইরূপ। ধারাবাহিক কোনো পূর্ণাঙ্গ চিত্র এতে পাওয়া যাবে না। দমকা হাওয়ার মতো হঠাৎ এর আগমন, হঠাৎ এর প্রস্থান। স্বাভাবিকভাবে কবির অবচেতন মনে যেসব ভাব জাগে, তাই সে লিখে যায়। কাব্য এখন তাই ফিল্‌ম্‌-ধর্মী; উল্লম্ফন ও ইংগিতে ভর্তি। শূন্য স্থানগুলি পাঠককে পূরণ করে নিতে হয়।

এযুগের পাঠককে তাই প্রস্তুত হয়ে আসতে হবে। অলস নিষ্ক্রিয় পাঠকের স্থান আর নেই। শুধু যে লেখকই বিনিয়ে বিনিয়ে সব কথার মালা গেঁথে দেবেন, আর অবসর মুহূর্তে পাঠক তা শুয়ে বসে উপভোগ করবেন, তা হবে না। পাঠককেও এখন মেহনত করতে হবে। আবৃত্তির যুগ চলে গেছে। ভাব-প্রকাশের বা ভাব-গ্রহণের দিনও চলে গেছে। এখন কবিতা পড়তে হবে বুদ্ধি ও অনুভূতির আলোকে নীরব নেত্রে। যারা অর্থ খুঁজতে যাবে, তারা এযুগের এক নম্বর বোকা পাঠক।

দুর্বোধ্যতার আর একটি কারণও আছে মানব-জীবনের খানিকটা বাস্তব, খানিকটা স্বপ্ন; খানিকটা চেতন, খানিকটা অবচেতন। দুটো মিলিয়ে তবে আমাদের পূর্ণ-জীবন। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে অবচেতন

মনের রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা চলছে। কাব্য ও আর্টও সেই পরিপ্রেক্ষিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। বাস্তব ও অতি-বাস্তবের মধ্যে যে প্রাচীর ছিল, তা তুলে দিয়ে দুটোকে এক করে দেখার চেষ্টা চল্‌ছে। অন্য কথায় জীবনকে এখন আর স্বতন্ত্রভাবে বাস্তব বা উর্ধ্ব-বাস্তব রূপে দেখা হচ্ছে না, সামগ্রিক রূপে দেখবার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই পূর্ণ রূপকে সুররিয়ালিজম (**Surrealism**) বলে। কথাটা আসলে **Super-realism**—অন্য কথায় রোমাণ্টিসিজম্‌ ও রিয়ালিজমের এ সংমিশ্রণ।

বলা বাহুল্য, আধুনিক কাব্যের এই প্রয়োগ-কৌশলের সঙ্গে সাধারণ পাঠক অপরিচিত, কাজেই এ-কাব্য তাদের কাছে দুর্বোধ্য হতে বাধ্য।

এই সব যুক্তির মধ্যে যে অনেকখানি সত্য আছে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু পাঠকদেরও তো কিছু বক্তব্য আছে। পাঠককে অত বোকা মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। না পড়াশুনা করে যদি আধুনিক পাঠক না-হওয়া যায়, তবে কবিই বা হবে কেন? আধুনিক কাব্যের মূলে যে দর্শন আছে, তথাকথিত আধুনিক কবিদের ক'জন সে সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল? ক্লাসিসিজম্‌, রিয়ালিজম্‌, ইত্যাদি মতবাদ সম্বন্ধে ক'জন কবি সজাগ? মিল না রেখে দু-চারটে কঠিন শব্দ লাগিয়ে এলো-মেলো ভাবে কিছু লিখেই অনেকে মনে করেন তাঁরা আধুনিক কবি বনে গেছেন। তাঁরা ভুলে যান যে আধুনিক কবিতা দুর্বোধ্য হতে পারে, কিন্তু দুর্বোধ্য হলেই আধুনিক কবিতা হয় না। কবিরা ঝাঁকড়া চুল রাখে, তাই বলে ঝাঁকড়া চুল রাখলেই কবি হওয়া যায় না। ইঞ্জিনিয়ারিং বলো, ডাক্তারী বলো, সঙ্গীত বলো—সব ক্ষেত্রেই শিক্ষা ও পারদর্শিতার প্রয়োজন আছে, কিন্তু একমাত্র ক্ষেত্র কি আধুনিক কবিতা যেখানে ট্রেনিং-এর কোনোই দরকার করে না? ছন্দের বালাই নেই, ভাবের বালাই নেই, নীতিধর্মের বালাই নেই, কেউ বুঝলো-না-বুঝলো তার জন্য মাথাব্যথা নেই—লিখলেই কবিতা। পাঠক যদি কিছু না বোঝে, তবে উল্টে আরও চোখ-রাঙানি। চমৎকার।

এইবার দেখা যাক আধুনিক কবিতা যেসব প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিল, তা সে কতোটুকু পালন করেছে:

(১) অকাব্য থেকে কাব্যের মুক্তি আধুনিক কাব্যের একটা বড় লক্ষ্য

ছিল। কিন্তু আজকার কবিতা কি সেই মুক্তি এনেছে? আজকার কবিতা কি সবটুকুই নির্জলা কাব্য? এ যিনি বলতে পারবেন, তিনি পরম দুঃসাহসিক বলতে হবে।

(২) রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কেন? আজকার কাব্যে কি রোমাণ্টিকতা অনুপস্থিত? স্বয়ং বোদলেয়ারও তো রোমাণ্টিকতার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন না। তিনি শুধু এর বাড়াবাড়িকেই খর্ব করেছেন মাত্র। এ সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসু কী বলছেন দেখুন :---

> "আমি বলতে চাচ্ছি যে ক্লাসিক রীতি সত্বেও অথবা সেই জন্যেই বোদলেয়ার পরম রোমাণ্টিক। তাঁর কবিতা রোমান্টিকতার 'কামস্কট্কা' নয়---'কৈলাস'। রোমাণ্টিক ও আধুনিক কবিতার মধ্যস্থলে তিনি অনন্য ভাবে অবস্থিত। তাঁর কাব্যে রোমান্টিকতা যেমন নেই, তেমনি নেই আধুনিক দুর্বোধ্যতা।"
>
> ---(বোদলেয়ারের কবিতা)

এ হলো বোদলেয়ার সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসুর অভিমত। বুদ্ধদেব বসু একজন বিশিষ্ট আধুনিক কবি হওয়া সত্বেও রোমাণ্টিসিজম্ সম্বন্ধে নিজে কী অভিমত পোষণ করেন, তাও দেখুন:---

> "রোমান্টিকতার নিন্দা করা আমার অভিপ্রায় নয়, বরং আমি দুর্মর ভাবে রোমান্টিকতার পক্ষপাতী। রোমাণ্টিক বলতে আমি বুঝি---শুধু একটি ঐতিহাসিক আন্দোলন নয়, মানুষের একটি মৌলিক স্থায়ী অবিচ্ছেদ্য চিত্তবৃত্তি। রোমান্টিকতা বিশ্বসাহিত্যে এক বিরাট ঘটনা যা মানুষের চিন্তার পরতে পরতে এমন ভাবে প্রবেশ করেছে যে আমরা নির্ভয়ে বলতে পারি, সমগ্র আধুনিক সাহিত্যই রোমান্টিক।"

অথচ 'অতি আধুনিক কবিরা' এই মূলমন্ত্র নিয়েই যাত্রা শুরু করেছেন যে রবীন্দ্রনাথ---তথা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত রোমান্টিক কবিদের বিরুদ্ধাচরণ ও অবজ্ঞা করাই হবে তাঁদের কবিকীর্তির প্রধান লক্ষ্য।

রোমাণ্টিকতা কাব্যের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য কোনো বিশেষ যুগে সীমিত নয়। সর্বদেশের সর্ব কালের কবিতাতেই রোমাণ্টিকতা লক্ষ্য করা যায়। কাজেই রোমাণ্টিক কবিতাকে অথবা রোমাণ্টিক কবিদিগকে যাঁরা অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞা করবেন, তাঁরা ভ্রান্ত। বোদলেয়ার তাঁর পূর্বসূরীদের প্রতি কখনও ঐরূপ কোনো বিদ্রোহ বা অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করেননি। বরং তিনি ছিলেন "পূর্বসূরীদের অনুসরণে পরিশ্রমী" এবং তাঁদের প্রতি ব্যবহারে "বিনয়ীতম"। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর শিষ্যবৃন্দ প্রাচীনপন্থী কবিদের প্রতি অবজ্ঞায় মুখর।

কাব্যে বা আর্টে ক্লাসিক, রোমাণ্টিক বা আধুনিক এরূপ কোনো তারতম্য করাও অসঙ্গত। রূপ যা---তা সনাতন। পরিচ্ছদে বা প্রকাশ-ভঙ্গিতে যা-কিছু তারতম্য। সত্যিকার কাব্য ক্লাসিক হলেও সুন্দর, রোমাণ্টিক হলেও সুন্দর, আধুনিক হলেও সুন্দর। কাজেই কোনো কবিতাকে আধুনিক বলে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করার কোনে মানে হয় না। যদি নারীদেহের সৌন্দর্যই আ ুনিক কবিতার প্রধান উপজীব্য হয়ে থাকে, তবে অতীত যুগেও তার অভাব ছিল না। এমন কি তুলনা করলে দেখা যাবে, প্রাচীনেরাই অধিকতর আধুনিক ছিলেন। আমরা অবন্তী সান্যালের 'হাজার বছরের প্রেমের কবিতা' থেকে এখানে দু-একটি কবিতা উদ্ধৃত করছি; তা থেকেই পাঠক আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন।

সংস্কৃত

"তন্বী শ্যামা বিম্বাধরা শিখরিদশনা
ক্ষীণকটি নিম্ননাভি উচচকিত হরিণীনয়না
স্তনভারানম্র তনু শ্রোণীভারে মন্থর চরণা
বিধাতার আদিশিল্প নিরুপমা রমণীরচনা
হেন নারী যদি সেথা থাকে
আমার দ্বিতীয় সত্তা বলি, মেঘ, জানিয়ো তাহাকে।"

মিসরীয়

"তুলনাবিহীন সে যে, সে শুধু একক
রূপময়ী জগতের সকলের চেয়ে।

দেখো, দেখো, সেই নারী দেবীর মতন
সর্বশুভ বৎসরের প্রথম প্রভাতে।
সর্বজয়ী রূপ তার, জ্যোতির্ময় দেহ
কমনীয় আঁখি দুটি যেদিকে তাকায়
কী মধু অধর-ওষ্ঠ বাক্যের উৎসায়,
ভাষা কই রূপ বর্ণনার।
দীর্ঘ গ্রীবা, দ্যুতিময় স্তনবৃন্ত দুটি
চুল তার অ-কৃত্রিম বৈদুর্যের ভার ;
বাহু দু'টি স্বর্ণেরও অধিক,
পদ্মের কলিকা যেন অঙ্গুলির যথার্থ উপমা
ক্ষীণ-মধ্য, নিবিড় নিতম্ব
পদযুগে রূপ উছলায়।''

আরবী

''ও-মেয়ে নির্ভয়
ও-মেয়ে হাওয়াকে তার আলিঙ্গন হানে।
ও-মেয়ে হাওয়াকে দেয় গজদন্তধবল বুকের
সেই স্তন, যা কেউ ছোঁয়নি কোনোদিন।
ও-মেয়ে হাওয়ার হাতে তুলে দেয় দীর্ঘ, সুগঠিত
মূর্তিখানি, তুলে দেয় শ্রান্ত, গুরুভার
পৃথুল নিতম্বখানি তার।''

এইরূপ অনেক কবিতাই আছে যা নিত্যকালের রস-সম্পদ। এইসব কবিতার সঙ্গে আধুনিক কবিতার কোনো পার্থক্য আছে কি ? এরা চিরদিন বেঁচে থাকবে। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন : 'কাব্য বাঁচে তার বয়সের গুণে নয়—রসের গুণে।' রসের নিত্যতা অনস্বীকার্য।

(৩) অকাব্য থেকে কাব্যকে পৃথক করার ধারণাটাও উদ্ভট। সত্যিকার কাব্যে বাহুল্য ও শব্দবিন্যাসের দৌর্বল্য বর্জনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এ নিয়ে তো বাড়াবাড়ি করা চলে না। কতোটুকু ছাঁটাই করতে হবে না হবে

শিল্পীই তা ভালো জানে। শিল্পীর পরীক্ষাও এইখানে। **"An artist is known by what he rejects."** কাজেই নিয়ম করে কোনো কিছু বর্জন করা যাবে না। ওটা শিল্পীর ব্যক্তিগত মেজাজ ও শিল্পবোধের উপর ছেড়ে দিতে হবে। এ ব্যাপারে সবাই যে একমত হবে তাও নয়। অপর পক্ষেরও কিছু বক্তব্য আছে। প্রতিটি কবিতার প্রতিটি পংক্তি এবং প্রতিটি শব্দ মার্জিত ও পরিমিত হবে---এ নিয়ম অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম। প্রকৃতিতে এত কাটছাঁট নেই, মাপাজোঁকা নেই। সহজ বিন্যাসেই সৃষ্টি এত সুন্দর। কেউ আগাছা বর্জিত কেয়ারী-করা ফুলের বাগান সাজাতে চান সাজান, কিন্তু মনে রাখতে হবে বনফুলও সুন্দর। কোন্ অনাদিকাল থেকে বেচারী চাঁদের বুকে কলঙ্কের ছাপ পড়ে আছে। কিন্তু বিশ্বশিল্পী কোনোদিন সেই কলঙ্ক থেকে চাঁদটাকে মুক্ত করলো না। তাতে ক্ষতিই বা কী হয়েছে? ওই কলঙ্কী চাঁদই চির-সুন্দরের প্রতীক। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর কাজই হচ্ছে এই। বাছাই করা সেরা সেরা উপাদান সে চায় না। তাতে তার বাহাদুরি নেই। সামান্যকে সে অসামান্য করে, অসুন্দরকে সুন্দর করে। তার মোহন তুলির যাদুস্পর্শে কুৎসিত ক্লেদও অনিন্দ্যসুন্দর নারীমূর্তিকে রূপান্তরিত হয়। আবার অসামান্য রূপের লাবণ্যে অঙ্গবিশেষের দোষত্রুটি ঢাকা পড়ে যায়। সুন্দরীর মুখের একটি কালো তিলের জন্য কবি সমরখন্দ ও বুখারাকে লুটিয়ে দিতে চায়। কাব্যও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। একটা সুন্দর নতুন আইডিয়া গোটা কবিতাটিকেই তরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। মেছো-হাটায় মেছুনী যখন ভাগা দিয়ে চুনোমাছ বিক্রি করে তখন প্রতি ভাগে ২।৪টা বড় মাছ থাকলেই যথেষ্ট। নিতে হলে সবটাই নিতে হয়, বেছে নেওয়া যায় না। কাজেই কাব্যে অতটা ছুঁৎমার্গ থাকা আমি অনুচিত বলে মনে করি। পরিপূর্ণ বিশুদ্ধতা (perfectionism) যখন সৃষ্টির কোথাও নেই, তখন কাব্যে তা আশা করা অন্যায়।

(৪) আধুনিক কবিরা যে কাব্যের জহুরী, তারই বা প্রমাণ কি? অকাব্য থেকে কাব্যের মুক্তি চাইবার অধিকার আধুনিক কবিদেরকেই বা কে দিল? তাদের বিচারই যে ঠিক, তাই বা কে বললো? এটাও তো একটা আপেক্ষিক ব্যাপার। তাছাড়া অকাব্য থেকে যদি কাব্যের মুক্তি দাবী

করার অধিকার এবং রোমান্টিক কবিদের বিরুদ্ধে বিরোধিতা করার স্পর্দ্ধা আধুনিক কবিরা দেখান, তবে অকবিদের থেকে কবিদের মুক্তিও আজ অপর পক্ষ দাবী করবে।

(৫) শব্দ ও ভাবের মিতব্যয়িতা অনেক সময় বাঞ্ছনীয়, কিন্তু অনেক সময় নিন্দনীয়। অমিতব্যয়িতা যেমন দোষের, কার্পণ্যও তাই। এর অবশ্যম্ভাবী ফল ভাব ও চিন্তার উল্লম্ফন, এবং তার ফলে দুর্বোধ্যতা, অস্পষ্টতা এবং অসংলগ্নতা। এটা অবশ্যই সত্য, কবিরা অনেক সময় সংযম হারিয়ে ফেলে; উচ্ছ্বাস ও আবেগ তাদের মনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সেখানে মিতব্যয়িতার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই মিতব্যয়িতা কার্পণ্যে পরিণত হলেই বিপদ। মিতব্যয়ী কবিদের হাতে কাব্য কিরূপ-ভাবে বিড়ম্বিত হতে পারে, তার বড় প্রমাণ সুধীন দত্ত। অত্যধিক সাধনার ফলে তাঁর কাব্যে বহু অনুপম শিল্পসুন্দর পংক্তি দৃষ্ট হয় সন্দেহ নাই; যেমন "অখণ্ড নির্বাণ-ভরা রমণীর তড়িৎ-চুম্বন", "অন্তরের অন্ধকারে অনঙ্গের লঘু পদধ্বনি", "শিপ্রার অপর তটে নেমে আসে সুদীর্ঘ রজনী"—ইত্যাদি। কিন্তু এই কবির হাত দিয়েই তো আবার বেরিয়েছে: "সে মৎসর অহংকার চিহ্নহীন অক্ষম ধিক্কারে", "লুপ্ত হলো আঁধারবিন্দু বিশ্ব হতে খিল খসালো নাস্তি পুনর্বার", "রহস্যের অনচ্ছ অভিধা" "অবশ্য অপ্রতিকার্য অন্তিম কুম্ভক। অনুতার্য নাস্তির কিনারা"—ইত্যাদি অজস্র দুর্ভেদ্য ভাব ও ভাষা।

(৬) আধুনিক কবিরা পাঠকের অযোগ্যতার দোষারোপ করেন। তাঁরা নিশ্চয়ই মনে করেন, আধুনিক কবিতা এমন চীজ যা বুঝা কঠিন, কিন্তু লেখা সহজ। এ এক চরম মূঢ়তা। আধুনিক কাব্য-রচনা অত সহজ নয়। ছন্দ ও সুরবোধ না থাকলে আধুনিক কবিতা লেখা যায় না। **Ezra Pound** সঙ্গীতের সঙ্গে কাব্যের তুলনা দিয়ে বলেছেন:

"Do not imagine that the art of poetry is any simpler than the art of music, or that you can please the expert before you have spent at least as much effort on the art of verse as the average piano teacher spends on the art of music."

বস্তুত ছন্দ বর্জন করলেই আধুনিক কবিতা হয়না। মুক্ত ছন্দও আরেক প্রকারের ছন্দ। সেখানেও সঙ্গীত বিদ্যমান। কাজেই অসুর কবিদের পক্ষে মুক্তছন্দের কবিতা লিখতে যাওয়া অধিকতর বিপজ্জনক।

(৭) আধুনিক কবিরা চিরাচরিত নীতধর্মকে আঘাত করবেন, এটাই বা কেমন কথা ? আধুনিকতার নামে সত্য প্রেম নীতি ও ধর্ম কবিদের হাতে বিপন্ন হবে,---এ এক অভিশপ্ত বিভ্রান্ত যুগের লক্ষণ। সুখের বিষয়, এ নীতিকে কেউ সুবিধাজনকভাবে কাজে লাগাতে পারছেন না, কেননা এটা একটা নিছক স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাপার। সুধীন দত্ত ও জীবনানন্দ দাশ সংশয়বাদী হতে পারেন, কিন্তু নাস্তিক নন। বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে---এদের বিরুদ্ধেও নাস্তিকতার অভিযোগ আনা চলে না। নিজ ধর্ম ও ঐতিহ্যের প্রতি এঁদের গভীর শ্রদ্ধাবোধ আছে এবং তা তাঁদের কাব্যে সঞ্চারিত। সুধীন দত্ত স্পষ্টই বলেছেন "ব্যক্তিগত মনীষায় জাতীয় মানস ফুটিয়ে তোলাই কবি-জীবনের পরম সার্থকতা।" 'দশমী' 'কস্মৈ দেবায়' 'মহাশ্বেতা' 'উর্বশীকান্ত' 'ফণিমনসার বন' 'ধরণী উমার মতো',---ইত্যাদি বহু দৃষ্টান্তে হিন্দু-মন ও মানস প্রতিফলিত হয়েছে। জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা' তো হিন্দু-সংস্কৃতির স্নিগ্ধরসে অভিসিক্ত। 'বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে---', 'যেইখানে এলোচলে রামপ্রসাদের সেই শ্যামা আজো আসে', 'বল্লাল সেনের ঘোড়া', 'এ নদী কি কালীদহ নয়?'---এরূপ অসংখ্য পংতি উদ্ধৃত করা যায়, যাতে তাঁর ধর্মীয় ভাব অনুলিপ্ত। বিষ্ণু দে-র কবিতাও হিন্দু পুরাণ ও ঐতিহ্যের রেফারেন্সে ভরপুর। 'উপমায় খুঁজেছি সান্ত্বনা। ওঁ উষা বা অশ্বস্য মেধ্যশ্ব শিবঃ', 'এক হোক এককের বহু বহু বহুধার এক, সোহকাময়ত দ্বিতীয়ো মে আত্মা জায়েতেতি'---অনুবাদ করতে বসেও তিনি সংস্কৃত উদ্ধৃতির আশ্রয় নিয়েছেন 'কিমিতি ত্বামহ সুন্নামি কন্যাকে' ইত্যাদিই তার প্রমাণ। এটা অবশ্য এলিয়টেরই অনুসরণ। বুদ্ধদেব বসুও আপন ঐতিহ্যে দৃঢ় বিশ্বাসী। তাঁর বহু কবিতায় এর প্রমাণ আছে।

এটা কোনো দোষের কথা নয়। বরং আধুনিক কাব্য পূর্বাপেক্ষা অধিক ঐতিহ্যবাহী, যদিও তার প্রয়োগ-কৌশল স্বতন্ত্র। অনিকেত ভাব

(rootlessness) আজকার কবিতার বৈশিষ্ট্য হলেও নীতি হিসাবে গ্রহণীয় নয়। আধুনিক কবিদের প্রধান গুরু টি, এস্, এলিয়টের কাব্য তো পুরাদর ঐতিহ্যভিত্তিক। ঐতিহ্যে ফিরে আসবার জন্যই তিনি কবি-দেরকে আহ্বান জানিয়েছেন। আধুনিক কবি হয়েও তিনি পুরাদস্তুর রোমান ক্যাথলিক। কাব্য ও ধর্মের সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি বলেছেন:

"Literary criticism should be completed by criticism from a definite ethical and theological standpoint"

অর্থাৎ কাব্যকে শেষবারের-বার নীতি ও ধর্মের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে হবে। এর দ্বারা বুঝা যায় এলিয়ট কাব্যের চেয়ে বৃহত্তর মর্যাদা দিয়েছেন ধর্ম ও নীতিকে। বর্তমান যুগের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ আধুনিক কবির স্বরূপ ও প্রকৃতি এই। অথচ তাঁর ভক্তবৃন্দ আজ ধর্ম ও নীতিকে আঘাত করাকেই আধুনিক কাব্যের অন্যতম নীতি বলে মেনে নিচ্ছেন।

পূর্ব-পাকিস্তানের আধুনিক কবিতা

আধুনিক কবিতার দোষগুণ মোটামুটি ভাবে দেখালাম। এইবার পূর্ব-পাকিস্তানের আধুনিক কবিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক:—

উপরে আধুনিক কবিতার যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এবং যে সব বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণের উল্লেখ করা হয়েছে, তা দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে পূর্ব-পাকিস্তানে সত্যিকার আধুনিক কবিতা এখনও সৃষ্টি হয় নি। আবুল হোসেন, শামসুর রহমান, আলাউদ্দিন আল-আজাদ প্রভৃতি কবিরা অনেক ভালো কবিতা লিখেছেন বটে, কিন্তু সেগুলি সত্যিকার আধুনিক কবিতা হচ্ছে কিনা সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। দু-একজন ছাড়া অনেকেই বর্তমানে পশ্চিম-বঙ্গের সুধীন দত্ত, জীবনানন্দ ও বিষ্ণু দে-র "surface imitation" বা খোসার অনুকরণ করছেন। তাতে কিছু কিছু যান্ত্রিক (mechanical) কবিতা উৎপন্ন হচ্ছে মাত্র। খোসার অনুকরণ এইজন্য বলছি যে, পশ্চিম বঙ্গের সমস্ত আধুনিক কবিই নিজেদের জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে কাব্যে রূপ দিতে প্রয়াস পাচ্ছেন, কিন্তু আমাদের কবিরা

সেইখানে হীনমন্যতায় ম্রিয়মান। তাঁদের ভাষা প্রকাশভঙ্গি উপমা অনুপ্রাস অনেক কিছুই (না বলে)--- ধার করা। এমন হলে তাঁদের ভবিষ্যৎ কোথায়? একটা কিছু নূতন পথ তাঁদের খুঁজে বার করতেই হবে। কিছুটা নূতন দান তাঁদের দিতেই হবে---যা পশ্চিম বঙ্গের থেকে ভাবে ভঙ্গিমায় টাইপে হবে স্বতন্ত্র। এখানে এজরা পাউণ্ডের একটি মূল্যবান কথা মনে পড়ে:

"The scientist does not expect to be acclaimed as a great scientist until he has discovered something. He begins by learning what has been discovered already. He goes from that point onward. He does not bank on being a charming fellow personally. He does not expect his friends to applaud the results of his freshman class work. Freshmen in poetry are unfortunately not confined to a definite and recognisable class room. They are 'all over the shop'. Is it any wonder the public is indifferent to poetry?"

অতি সত্য কথা। কোনো নূতন আবিষ্কার না-করা পর্যন্ত কোনো কবিরই আধুনিক বলে দাবী করার কোনো অধিকার থাকবে না। প্রচলিত বস্তুর অনুকরণের মধ্যে আধুনিকতা নেই, নূতন আবিষ্কারের মধ্যে আছে।

কাব্যের এই বিড়ম্বনা শুধু বাংলা-সাহিত্যেরই নয়, অন্য দেশের সাহিত্যেও ঘটে থাকে। কবি-সাহিত্যিকদের শ্রেণী বিভাগ করতে গিয়ে এজরা পাউণ্ড এক শ্রেণীর লেখকদের কথা বলেছেন, তাঁরা হচ্ছেন "Gongoras'—whose wave of fashion flows over writing for a few centuries or a few decades, and then subsides, leaving things as they were."

আধুনিক কবিদের প্রতি তাই আমার অনুরোধ: আধুনিকতার নামে তাঁরা যেন বাড়াবাড়ি না করেন। শাশ্বত সুন্দর ও ধ্রুবের সাধনাই হবে আমাদের লক্ষ্য। নূতন আঙ্গিকে যাঁরা সেই চিরন্তনকে রূপ দিতে সক্ষম তাঁরা দিন; সে তো আনন্দেরই কথা; কাব্য ও সাহিত্য তাতে সমৃদ্ধই হবে। কিন্তু এই নিয়ে বিভেদ সৃষ্টি যেন না হয়। ক্লাসিক

কবিও কবি, রোমাণ্টিক কবিও কবি, আধুনিক কবিও কবি ; শুধু আঙ্গিকে পার্থক্য মাত্র। আঙ্গিক নিয়ে তাই দল পাকিয়ে কোনো লাভ নেই ; আঙ্গিক দিয়ে প্রকৃত কাব্যের বিচার হয় না, হয় সৃষ্টির সার্থকতা দিয়ে। সেই নিত্যবস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখা আমাদের উচিত। আমার মনে হয়, আধুনিক কবিতায় ভালো কবি (good poet) হওয়া যায়, কিন্তু মহাকবি (great poet) হতে হলে ক্লাসিক ও রোমাণ্টিক—এই দুই গুণেই গুণান্বিত হতে হবে। ক্রোচে ঠিকই বলেছেন:

"A great poet is both classic and romantic"

লেখক-সংঘ পত্রিকা
১৯৬২

সমালোচনার সমালোচনা

Ezra Pound এক জায়গায় বলেছেন: "Pay no attention to the criticism of men who have never themselves written a notable work." অর্থাৎ সেই সব লোকের সমালোচনায় কান দিও না যারা নিজেরা কোনো উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ লেখে নাই।

কথাটা খুবই সত্য। এর তাৎপর্য এই যে, সমালোচনা একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ; কোনো অপরিপক্ক লোকের দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়।

আশ্চর্যের বিষয় এই দায়িত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম আজকাল কিন্তু এই সব লোকের দ্বারাই নিষ্পন্ন হচ্ছে---এজরা পাউণ্ড যাদের কথা শুনতে নিষেধ করেছেন। এখন বরং বলা যায় যে, " "Critics are the men who have failed in art and in literature." " অর্থাৎ যাদের কোনো দান নেই, কবি বা লেখক হতে যারা পারেন নি—তারাই সমালোচক সেজে সাহিত্যের বাজারে দালালি করেন। তারা জানেন, এই পন্থাই নিরাপদ, কেননা এতে কোনো পুঁজির দরকার হয় না।

সাহিত্যে সমালোচনার কোনো প্রয়োজন আছে কিনা, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সমালোচনায় ভালোও হয় মন্দও হয়। বুদ্ধিদীপ্ত উন্নত সমালোচনা (learned criticism) সাহিত্যের প্রগতির পক্ষে অনুকূল। সাহিত্যক্ষেত্রে স্বভাবতই অনেক আগাছা জন্মে; মাঝে মাঝে সেগুলি সাফ করে দিতে হয়। সে কাজ সমালোচকের। T. S. Eliot ঠিকই বলেছেন:

> "From time to time it is desirable that some critic shall appear to review the past of our literature and set the poets and the poems in a new order."

কিন্তু এই সমালোচনাই যদি ব্যক্তিগত রুচি, পূর্বধারণা, ঈর্ষা অথবা দলগত নীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, তবে তাতে প্রভূত অকল্যাণই হয়ে থাকে। এরূপ নজির ইতিহাসে বহু আছে। সর্বপ্রথমেই ইংরাজ কবি কীট্‌সের কথা

মনে পড়ে। **Quarterly Review** পত্রিকায় এক অর্বাচীন সমালোচক কবির ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর কটাক্ষ করে লিখলেন:

> **"Go back to the shop, Mr. John, stick to plaster, pills, ointments etc."**

অনেকে মনে করেন, এই রূঢ় সমালোচনাই কীট্‌সের অকাল মৃত্যুর কারণ। অথচ আজ দেখা যায় কীট্‌স্‌ জগতের শ্রেষ্ঠতম কবিদের অন্যতম।

সমালোচকদের হাতে শেক্‌স্‌পীয়ার শেলী বায়রণ গ্যেটে এঁরাও কম লাঞ্ছিত হননি। সমালোচকদের কারো কারো মনে এমন ধারণা জন্মেছিল যে তারাই যেন কবিদের জন্মদাতা; তাঁরা কবিদের উঠাতেও পারেন, বসাতেও পারেন। এই শ্রেণীর মাত্রাজ্ঞানহীন সমালোচকদের লক্ষ্য করেই গ্যেটে বলেছিলেন:

> **"Kill the dog—he is a reviewer."**

শেক্‌সপীয়ারকে তাঁর সমকালীন সমালোচকেরা কবি বলে আদৌ স্বীকৃতি দেননি। তিন শ' বছর পর তবে তাঁর সে-স্বীকৃতি মিলেছিল। ওমর খৈয়ামকে প্রায় ৮০০ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। **Fitzgerald**-এর অনুবাদ প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত (১৮৫৯) ওমর খৈয়াম অজ্ঞাতই ছিলেন। পক্ষান্তরে এমনও দেখা যায় যে, অনেক কবি জীবদ্দশায় তৎকালীন সমালোচক বা সমঝদারদের বুদ্ধিজ্ঞানে উচ্চমর্যাদা ও সম্মান লাভ করেছিলেন। কিন্তু কালের প্রহারে পরে তাঁরা সে মর্যাদা হারিয়েছেন। **Pope, Dryden, Tennyson** প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ ও ইকবালকেও প্রথম জীবনে যথেষ্ট বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়েছে।

এইসব কারণে সমালোচনা সম্বন্ধে লেখকদের ধারণা খুব প্রীতিপ্রদ নয়। মনে হয়, সাহিত্যক্ষেত্রে সমালোচনা ভালোর চেয়ে মন্দই করেছে বেশি। অনেকে তাই সমালোচনার উপরে খুব বিরূপ। তাঁরা বলেন: বই সম্বন্ধে এত বই কেন লেখা হবে। আর পাঠকেরাই বা কেন অপরের সমালোচনা শুনে বা পড়ে কোনো বই সম্বন্ধে নিজেদের মত গঠন করবেন? পরের মুখে কেন তাঁরা ঝাল খাবেন? কোনো বইয়ের ভালোমন্দ জানতে

হলে মূল বইটা পড়লেই তো হয়। একজন আমেরিকান প্রফেসর ঠিক এই কথাই বলেছিলেন। তাঁর এক প্রিয় ছাত্র তাঁকে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন: "Timon of Athens সম্বন্ধে কার বই পড়বো, স্যার?" প্রফেসর উত্তর দিলেন: "The best book you can read on Timon of Athens is—Timon of Athens." সত্যি তো! সমালোচনার প্রতি অত্যধিক অনুরাগ নিজের চিন্তা, অনুভূতি ও রসোপলব্ধির শক্তিকে খর্ব করে, জিজ্ঞাসা ও কৌতূহলকে নিবৃত্ত করে; জ্ঞানের সীমানাকে সংকীর্ণ করে। লেখককে পদে পদে বাধা দেওয়ায় বা শাসন করায় তাঁর সৃষ্টি-প্রতিভাও আড়ষ্ট হয়ে আসে।

তবে সমালোচনার একটা ভালো দিকও আছে। সমালোচকের শ্রেষ্ঠ কাজ হবে লেখক ও পাঠকের মধ্যে মনের মিতালি ঘটিয়ে দেওয়া। সমালোচককে তাই ঘটকের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। অথবা তার তুলনাটা দোভাষীর (interpreter) সঙ্গে হলেও মন্দ হয় না। লেখকের লেখায় যে কথা অব্যক্ত বা অস্পষ্ট থাকে সমালোচক তা পরিস্ফুট করে পাঠকের মনের দুয়ারে পৌঁছে দেবেন।

সুষ্ঠু সমালোচনা সাহিত্যের মান ও আদর্শকে উন্নত করতে পারে, রুচির সংস্কার সাধন করতে পারে এবং বিভ্রান্তির দিনে সত্য ও সুন্দর পথের নির্দেশ দিয়ে মানব-কল্যাণে সহায়তা করতে পারে।

কাজেই, সমালোচনা দ্বারা যে আদৌ কোনো কাজ হয় না, তা নয়। তবে একথা মনে রাখতে হবে, সমালোচক যেন লেখককে আড়াল করে না দাঁড়ান বা না ভাবেন যে, লেখকের চেয়ে সমালোচকই বড়। এ সম্বন্ধে অসিত কুমার মুখোপাধ্যায় যা বলেছেন, তা গ্রহণযোগ্য:—

> "সমালোচকের স্থান শিল্পীর নীচে—ওপরে নয়। এ কথা অবশ্য সত্য যে, সৃষ্টিশীল শিল্প-প্রতিভার চেয়ে শিল্প-বিচারের প্রতিভা উনার্থক। কে না জানে 'সেকেণ্ড হ্যাণ্ড' জিনিসের দাম নতুনের চেয়ে অনেক কম? সৃষ্টিকর্মের ব্যাখ্যাও যদি সমালোচকদের প্রধান কর্তব্য হয়, তা হলে সমালোচনা যে সাহিত্যকর্মের খিদমতগারের ভূমিকা গ্রহণ করবে, তা বাধ্য হয়েই মেনে নিতে হয়।" (সমালোচনার কথা)

অবশ্য সৃষ্টিধর্মী সমালোচনা (Creative criticism) স্বাধীন সৃষ্টির মর্যাদাও লাভ করতে পারে; কিন্তু তা হলেও তাকে বড় জোর বলা যায় দ্বিতীয় সৃষ্টি (Second creation—)—মৌলিক সৃষ্টি নয়। দ্রষ্টা কখনও স্রষ্টাকে অতিক্রম করতে পারে না। "Creative genius leads the way, criticism follows"—(Hudson)। এইটেই চিরাচরিত নিয়ম।

সমালোচনার প্রকার-ভেদ

সমালোচনা কিরূপ হওয়া উচিত, তা নিয়ে মতভেদ আছে। ফলে সমালোচনা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। মোটামুটি আমরা সমালোচনাকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি: (১) Subjective criticism (ব্যক্তিপন্থী সমালোচনা) এবং (২) Objective criticism (বস্তুপন্থী সমালোচনা)। অন্য প্রকার শ্রেণীভেদও আছে যথা—(১) Judicial criticism, (২) Inductive criticism, (৩) Comparative criticism এবং (৪) Historic criticism. সমালোচকদের ভিতরেও অনুরূপ শ্রেণীভেদ দেখা যায়। কেউ বা ভাববাদী, কেউ বা বস্তুবাদী, কেউ বা সৌন্দর্যবাদী, কেউবা জীবনবাদী—ইত্যাদি।

আমাদের সাহিত্যে ব্যক্তিপন্থী (Subjective) বিচারপন্থী (Judicial) সমালোচনাই সমধিক প্রচলিত। এই সমালোচনায় সমালোচক তাঁর পূর্বসঞ্চিত ধ্যান-ধারণা, রুচি ও আদর্শ দ্বারা গ্রন্থের ভালোমন্দ বিচার করেন। লেখকের কোথায় কোনটুকু ভালো হয়েছে, কোনটুকু মন্দ হয়েছে, কোথায় কোনটুকু করা উচিত ছিল, কোথায় কোনটুকু করা উচিত হয়নি, অথবা কোথায় কি কি অভাব ঘটেছে, ইত্যাদি ধরনে সমালোচক তাঁর রায় (verdict) দিয়ে যান। সমালোচক এখানে ঠিক বিচারকের কাজ করেন। এই ধরণের সমালোচনায় লেখক অপেক্ষা সমালোচকই বেশী করে আত্মপ্রকট হন। লেখককে আড়াল করে সমালোচকই সামনে এসে দাঁড়ান। Moulton তাই ঠিকই বলেছেন: *"Judicial criticism is a revelation of the critic much more than of the literature."* এমনি করে লেখকের চিন্তা রুচি ও সৃজনী-

শক্তিকে সমালোচক পেছন থেকে কণ্ট্রোল করেন এবং শুধু লেখকের উপর নয়, সমাজের উপরেও তাঁর আপন মতটি চাপিয়ে দেন।

বলা বাহুল্য এই Judicial criticism-ই সবচেয়ে সহজ ও নিরাপদ, আবার এইটেই সবচেয়ে বেশি মারাত্মক। এই সমালোচনায় সত্যিকারের সাহিত্য-মূল্য তো বুঝা যায়ই না, পক্ষান্তরে বহু অকল্যাণের পথ এতে খুলে যায়। ব্যক্তিগত রুচি বা বিশেষ 'দৃষ্টিকোণ' থেকে সমালোচক হয়তো কোনো গ্রন্থকারকে একদম কচু-কাটা করে ছাড়েন, না হয়তো উচ্ছ্বসিত আবেগে এমন প্রশংসা করেন যে, লেখকের তাতে মাথা বিগড়ে যায়। তরুণ লেখকদের পক্ষে এ দুটোই খারাপ। অত্যধিক স্তুতিবাদের ফলে বহু প্রতিভাবান লেখকই অকালপক্কতা দোষে দুষ্ট হয়, ফলে বড়-কিছুই দান করা তাদের পক্ষে আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। সাধনা করে স্বাভাবিকভাবে যে-প্রতিভা সার্থক হতে পারতো, সমালোচকের অত্যধিক আদরে বা অনাদরে তা আর সম্ভব হয় না।

বাংলা সাহিত্যে এই অভিশাপ এখনও বিদ্যমান। যাদের দান এখনো নিঃশেষিত হয় নি অথবা প্রতিশ্রুতি নিয়ে সবেমাত্র যারা সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে, কোনো কোনো আনাড়ী সমালোচক তাদের দানের উপরও চূড়ান্ত রায় দিয়ে বসেন। কেউ কেউ বা কবি না গদ্যধর্মী কাব্য-বিচারে হস্তক্ষেপ করেন। কার উপর কার প্রভাব পড়েছে, কে কার ভাবাশিষ্য, এইসব নিম্নস্তরের আলোচনাই তাঁদের প্রধান অবলম্বন। তাঁরা ভুলে যান যে, সাহিত্য-বিচারে এ সব কথার বিশেষ কোনোই মূল্য নেই। ছোটখাটো (Minor) কবিদের তো কথাই নেই, যারা সুকবি (Good poets) এবং যারা মহাকবি (Great poets)—সবাই অল্প বিস্তর তাদের পূর্বসূরী বা সমকালীন সতীর্থদের কাছে ঋণী। এতে কোনো দোষ নেই। শেক্‌স্‌পীয়ার, মিলটন, দান্তে, গ্যেটে—প্রত্যেকেই তাঁদের গ্রন্থের উপাদান অপরস্থান থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। মিলটনকে তো "Greatest plagiarist" বলা হয়। বাংলা সাহিত্যে মাইকেল একাধিক ইউরোপীয় কবিদের কাছে ঋণী; রবীন্দ্রনাথ বিহারীলাল ও হাফিজের কাছে ঋণী; নজরুল ইসলাম *রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও সত্যেন্দ্রনাথের কাছে ঋণী; পক্ষান্তরে মোহিতলাল,*

জীবনানন্দ দাশ এবং আরও কেউ কেউ নজরুল প্রভাবে আক্রান্ত। আবার সুধীন দত্ত, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে প্রভৃতি আধুনিক কবিরা সকলেই বোদলেয়ার, মালার্মে, টি. এস্. এলিয়ট এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য কবিদের ভাবশিষ্য। বিশ্লেষণ করলে এমনও দেখা যায়, বিভিন্ন কবি একই সূত্র থেকে একই উপাদান সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু সৃষ্টিতে গিয়ে তারতম্য ঘটেছে। কাজেই কোন্ উপাদান কোথা থেক এলো, সে কথা খুব বড় নয়; বড় কথা হলো কার সৃষ্টি কতোখানি সার্থক হলো। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়: "বিশ্লেষণে হীরকে-অঙ্গারে প্রভেদ নেই, সৃষ্টির ইন্দ্রজালে আছে।"

বিচারপন্থী সমালোচকরা এসব কথা না ভেবেই যার যেরূপ অভিরুচি, মত প্রকাশ করে দেন। ফলে কারো মতের সঙ্গে কারো মত মিলে না। ক যদি বলে একরূপ, খ বলে তার বিপরীত, আবার হয়তো সম্পূর্ণ নতুন আর এক কথা বলে গ। তার ফলে বই স ন্ধে এত বই লিখতে হয়। শুধু তাই নয়। বই-সম্বন্ধে-বই স ন্ধেও অনেক বই আছে বই কি! আরও বিড়ম্বনা দেখা দেয় তখন যখন একই সমালোচক আগে এক কথা বলেন, পরে আরেক কথা বলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় টি. এস্. এলিয়টের কথা। কাব্যের আদর্শ সম্বন্ধে আগে তিনি যে-মত ব্যক্ত করেছিলেন, অধুনা সে মত বর্জন করেছেন। এতে তাঁর ভক্তবৃন্দের অবস্থাটা কিরূপ বিশ্রী হয়ে উঠেছে, দীপ্তি ত্রিপাঠির মুখেই তা শুনুন:

> "যে-এলিয়ট তাঁদের দিশারী ছিলেন, তিনি ইতিপূর্বেই বদলাতে শুরু করেছিলেন। ১৯৩০-এ লিখিত 'Ash Wednesday' এবং ১৯৩৬-এ লিখিত 'Four Quartets'-এর মধ্যে দেখা গেল এলিয়টের ধ্যান-ধারণার বহুল বিবর্তন ঘটেছে। তিনি সংশয়ের সমুদ্র থেকে বিশ্বাসের দৃঢ়ভূমিতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁর নৈরাশ্য ও দুর্বলতা চলে গেছে। তিনি দেখলেন উপলব্ধির মুহূর্তের মধ্যেই সমস্ত কালের গতি স্তম্ভিত। এরই মধ্যে সমস্ত বিপরীত সংগতি লাভ করছে।"
>
> —(আধুনিক বাংলা কাব্য-পরিচয়)

কাব্যে যেমন, সমালোচনাতেও ঠিক তেমন। নানা জনের নানা মত। কে বিচার করবে? কার বিচারকে আমরা অভ্রান্ত বলে মেনে নেবো?

কোনো দুই ব্যক্তিই তো এক বই পড়ে না। "No two persons ever read the same book." একজন যা পছন্দ করে, আরেক জন তো তা পছন্দ করে না। কার কথা তবে বিশ্বাস করবো?

"Ten men love what I hate.
Shun what I follow, slight what I receive;
Ten, who in ears and eyes
Match me, we all surmise
They this thing and I that; whom shall
my soul believe?"

তা হলে পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে: Judicial criticism এর কোনো সত্যমূল্যই নেই। এক জনের মত আরেক জনের দ্বারা খণ্ডিত হয়ে যায়, কেউ টিকতে পারে না, একজন আরেকজনের গলা কেটে দেয়।

এই সব দেখে শুনে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি বলেছেন:

"Criticism, as a whole, has proved a mere selfcancelling business and has accomplished little or nothing towards any final establishment of literary values."

বস্তুপন্থী সমালোচনা

বিচারপন্থী সমালোচনায় লেখকের চেয়ে সমালোচকই বেশি করে আত্ম-প্রকট হন দেখে এ পন্থা অনেকে বর্জন করতে পরামর্শ দেন। তাঁদের মতে সমালোচককে হতে হবে ব্যক্তিনিরপেক্ষ বা বস্তুনির্ভর। সমালোচক তাঁর ব্যক্তিগত রুচির কথা না বলে, বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করবেন এবং তার ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা (interpretaion) দেবেন। লেখার মধ্যে যেখানে যে সৌন্দর্য আছে, তাই তিনি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরবেন। লেখার সাথে তার থাকবে সমানুভূতি—সহানুভূতিও। Burton বলেন: "The critic should be on the poet's side." লেখকের ত্রুটির দিক নজর না দিয়ে বরং তিনি তাঁর ভালো দিকটাই দেখাবেন। Hudson'ও ঠিক এই কথাই বলেন: "The true critic ought to seek rather excellencies than imperfections."

যুক্তিপন্থী সমালোচনা

কেউ কেউ সমালোচনাকে অন্য ভাবে দেখতে চান। তারা বলেন, বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিতর্ক দ্বারা বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্যকে বিশেষ থেকে নির্বিশেষে বা সাধারণ সত্যে নিয়ে যাওয়াই হবে বিদগ্ধ সমালোচকের কাজ। ইংরাজিতে একে Inductive criticism বলে। এই সমালোচনায় মনের সংকীর্ণতা দূর হয়, জ্ঞানের সীমানা সমপ্রসারিত হয়। কিন্তু এ সমালোচনা সহজ নয়। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অগাধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা না থাকলে কেউ এ পথে সার্থকতা অর্জন করতে পারবে না। এই সমালোচনায় কিছুটা মৌলিক সৃষ্টির অবসর আছে। এইখানে সমালোচনা খানিকটা স্বাধীন সৃষ্টির মর্যাদা পেতে পারে। কিন্তু আগেই বলেছি, হাজার ভালো হলেও সে সৃষ্টি হবে 'Second Creation' অর্থাৎ দ্বিতীয় সৃষ্টি।

কিন্তু এ সমালোচনা খুব কার্যকরী হয় না, সার্থকও হয় না। তার কারণ পূর্ব-সংস্কার, ব্যক্তিগত রুচি ও ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণ বর্জন করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

দোভাষীর কাজ

সমালোচককে অনেকে বলেন দোভাষীর (Interpreter) কাজ করতে। তিনি হবেন নির্বিকার ভাষ্যকার। লেখক যা বলতে চেয়েছেন, তিনি তাই বিশ্বস্তভাবে সকলকে বুঝিয়ে দেবেন। "To inspire the uninspired"—অর্থাৎ যারা সল্প-অনুপ্রাণিত তাদেরকে তিনি প্রেরণা দেবেন। একাজও কঠিন। লেখক যতোটা উঁচুতে উঠেছেন বা যতোটা গভীরে গিয়েছেন, সমালোচককে ঠিক ততোটা বা তার কাছাকাছি বিন্দুতে গিয়ে দাঁড়াতে হবে, তবেই লেখক সম্বন্ধে তিনি কিছু বলবার অধিকারী হবেন। খণ্ড খণ্ড রূপে গ্রন্থপাঠ নয়, সামগ্রিক রূপে গ্রন্থকারকে পাঠ না করে কারো সম্বন্ধে কিছু বলা অন্যায়। সমালোচক দেখবেন "the 'work'—not the 'works' of the author." এই তুলনায় আমাদের সমালোচক ও সমালোচনা কতো নিম্নস্তরের! সেই উদারতা—সেই

catholicty of mind কই? দেভাষীর কাজ করত গেলেও সমালোচক তাতে আপন মনের রং মিশিয়ে দেন, নয়তো কিছুটা বলেন, কিছুটা বলেন না।

সনাতনপন্থী সমালোচনা

সনাতনপন্থীরা কতকটা ঐতিহাসিক ধারাকে বজায় রাখতে চান। প্রাচীন যুগ থেকে ভাষা, ভাব, ছন্দ, রস, আঙ্গিক সম্বন্ধে বৈয়াকরণিকেরা যে নিয়মকানুন বেঁধে দিয়েছেন, এঁরা সেই অনুযায়ী লেখককে বিচার করেন। একটা বিধিবদ্ধ নিয়মের নিক্তিতে লেখকের দোষগুণ ওজন করা যায় বলে এঁদের পন্থা কিছুটা বৈজ্ঞানিক বলা যেতে পারে। আধুনিক যুগের সঙ্গে এ পদ্ধতি খাপ খায় না বলেই সমাজে এর কোনো আদর নেই।

এখানেই শেষ নয়। সমালোচনা আরও কয়েক প্রকারের আছে, যেমন Comparative Criticism, Historic Criticism ইত্যাদি। এর উপর আবার বহু নূতন নূতন মতবাদ এসে সমালোচনার ঘাড়ে চেপেছে। যেমন ভাববাদ, নীতিবাদ, প্রকাশবাদ, দাদাবাদ (Dadaism) জীবনবাদ, অতিবাস্তববাদ (Surrealism) ইত্যাদি। ভাগের উপরে ভাগ, তার উপরে ভাগ। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায়, যেমন কবিতায়, তেমনি সমালোচনায় এক নৈরাজ্যের সূচনা হয়েছে। এটা একটা 'no-man's land,' এখানে যার খুশি যা, তাই সে করতে পারে।

দৃষ্টিকোণের পার্থক্য

সমালোচনার বহু বিচিত্র রূপের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম। এখন কথা হচ্ছে: এই সব পদ্ধতির মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ? কোনটি আমাদের গ্রহণযোগ্য? বলা কঠিন। প্রত্যেকেরই দোষগুণ আছে। যে-Judicial criticism-এর এত নিন্দা করা হলো, বহু দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ঐটেই কিন্তু সর্বজনগ্রাহ্য প্রক্রিয়া। নৈর্ব্যক্তিক হতে চাইলেও হওয়া যায় না। আমাদের রক্তে আছে যুগসঞ্চিত ধ্যানধারণা ও আদর্শের ছাপ। তা থেকে কেমন করে আমরা সম্পূর্ণ মুক্ত হবো? কাজেই সমালোচনার শেষ মাপকাঠি দাঁড়ায় ঐ

ভালোমন্দের বিচারে। এই কারণে মতবিরোধও হয়ে ওঠে অনিবার্য। সাধারণের কথা তো দূরে থাকুক, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সমালোচকদের মধ্যেও কারো মতের সঙ্গে কারো মতের মিল নেই। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি:—

শেকস্‌পীয়ার একজন বিশ্বকবি। সেইরূপ টলষ্টয়ও বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম চিন্তাশীল মনীষী। টলষ্টয় শেকস্‌পীয়ার সম্বন্ধে কিরূপ মত পোষণ করতেন, দেখুন—

"I remeber the astonishment I felt when I first read Shakespeare. I had expected to receive a great aesthetic pleasure, but on reading one after another the works regarded as his best, King Lear, Romeo Juliet, Hamlet and Macbeth, not only did I not experience pleasure, but I felt inseparable repulsion and tedium and a doubt whether I lacked sense, since I considered works insignificant and simply bad, which are regarded as the summit of perfection by the whole educated world."

মেপাসাঁ সম্বন্ধে টলষ্টয়ের মন্তব্য:

"Maupassant posseses talent ... He was also master of a beautiful style. He was also master of that condition of true artistic production without which a work of art does not produce its effect viz. sincerity. But unfortunately lacking the first and perhaps the chief condition of worthy artistic production—a correct moral relation to what he described, that is to say, a knowledge of the difference between good and evil—he loved and described things that should not have been loved and described."

বোদলেয়ার ও ভেরলেন সম্বন্ধেও টলষ্টয় অনুরূপ ধারণা পোষণ করতেন:

"...in their least bad productions one sees more of Baudlaire or Verlaine than of what they were describing. But these two indifferent versifiers form a school and leads hundreds of followers after them. ...

There is only one explanation of this fact : it is that the art of the society in which these versifiers lived is not a serious, important matter of life, but a mere amusement."

T. S. Eliot এ-যুগের অন্যতম প্রধান কবি ও সমালোচক। Milton সম্বন্ধে তিনি কী বলেন দেখুন :

"Mition writes English like a dead language ... ... His language is, if one may use the term withont disparagement, **artificial** and conventional...

Milton has done damage to the English language from which it has not wholly recovered."

এইরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যায়।

কার মত তা হলে আমরা গ্রহণ করবো? মিলটন বা শেকস্‌পীয়ার জগদ্বিখ্যাত কবি; পক্ষান্তরে টলষ্টয় ও টি. এস. এলিয়ট'ও বিশ্ববরেণ্য। তাঁদের মতই বা কি করে আমরা অবজ্ঞা করি?

সমালোচনায় আপেক্ষিকতা

অবস্থা যখন এইরূপ, কারও মতের সঙ্গে যখন কারও মত মেলেনা, তখন একটি মাত্র পথেই আমাদের মুক্তি আছে। সেটি হচ্ছে আইন্‌-ষ্টাইনের 'Law of Relativity.' ঘোষণা করে দেওয়া হোক যে "There is no standard criticism, all criticism are relative". অর্থাৎ সমালোচনার কোনো ধ্রুব আদর্শ নেই, সব সমালোচনাই আপেক্ষিক।

এই নীতি মেনে চললে কারও কিছুই ক্ষোভের কারণ থাকবে না! সমালোচকও খেয়াল মাফিক যা-খুশি বলতে পারবেন, লেখক ও পাঠকও সেগুলিকে ব্যক্তিগত খামখেয়ালির মূল্যে গ্রহণ করবেন। কোনো পুস্তক সমালোচনা করতে গেলে সমালোচক আগেই বলে নেবেন, 'প্রিয় পাঠক পাঠিকা! অমুকের অমুক বইকে উপলক্ষ করে আমার নিজের পরিচয় খানিকটা দিচ্ছি শুনুন।' আনাতোল ফ্রান্স ঠিক এমনই একটা উক্তি করেছিলেন :

"a lecturer on literature, if he were really honest, instead of using the time-honoured exordium 'Gentlemen, I am going to speak to you to-day about Pascal, or Racine or Shakespeare should rather begin his discourse with the words—"Gentlemen, I am going to speak to you to-day about myself in relatation to Pascal or Racine or Shakespeare."

অতি চমৎকার! সমালোচকদের এর থেকে পাঠগ্রহণ করা উচিত। তাঁদের কোনো কথাই যখন সত্য হয় না, আজ যাকে তাঁরা 'যুগস্রষ্টা' বলছেন, দু'দিন পরে সে যখন 'যুগসৃষ্টিতে' নেমে আসছে, আবার আজ যাকে তাঁরা অবজ্ঞার অন্ধকারে ফেলে রাখছেন কালই সে যখন উজ্জ্বল মহিমায় প্রকাশ পাচ্ছে, তখন তাদের সতর্ক হওয়া উচিত। তাঁদের মনে রাখা উচিত:

> "Again and again history has proved that the best interests of literature have been subserved by open defiance of the critics—'this will never do.'

লেখকদেরও একটা কথা মনে রাখতে হবে। সমালোচকদের নিন্দাবাদে তাঁরা যেন নিরুৎসাহ না হন, আবার তাঁদের স্তুতিবাদে আত্মহারাও যেন না হন। সমালোচকদের কোনো কথারই যখন স্থায়ী মূল্য নেই এবং সৃষ্টিধর্মী কোনো শিল্প বা সাহিত্য যখন সমালোচকদের মুখাপেক্ষী নয় তখন তাঁদের কোনো কথায় কান না দিয়ে আপন সৃষ্টির প্রতি মনোযোগী হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। মহাকালই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বিচারক। সেই নিত্যকালের হাতে সাহিত্যকে তুলে দেওয়াই হবে লেখকদের পক্ষে সবচেয়ে সঙ্গত ও নিরাপদ।

লেখক-সংঘ পত্রিকা

১৯৬২

সমাপ্ত